সুখ - দুঃখের পাখিরা

আশরফ চৌধুরী

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ ॥ ভাদ্র, ১৩৬৫

প্রকাশ
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন,
কলকাতা-৭০০০১২

যাঁর জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক-বর্তিকা
আমার জীবনের যাত্রাপথ সমুজ্জ্বল করেছে
আমার সেই জ্ঞানতপস্বী শ্রদ্ধাস্পদ পিতা
মৌলভী মহম্মদ আলির করকমলে—

এ-উপাখ্যান যেখানে শেষ, আমার কাহিনী সেখান থেকেই শুরু। উপন্যাসের পরিবেশ-চিত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে গ্রাম-বাঙলার পটভূমি, চরিত্র-চিত্রণ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি কোথাও কোনও বাস্তব চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসের কোনও চরিত্র বা ঘটনার সাদৃশ্য চোখে পড়ে, তবে তা নিতান্তই কাকতালীয় ব্যাপার।

গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রে বন্ধুবর শ্রী সমর ভট্টাচার্য, কবিবন্ধু শ্রী শচীন সরকার এবং অগ্রজপ্রতিম শ্রী শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রী ভাস্কর মুখোপাধ্যায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আশরফ চৌধুরী

আশরফ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত

কৃষণ চন্দরের

নয়া ইস্তেহার (গল্প-সঙ্কলন)

স্বপ্নমিছিল (উপন্যাস)

তুফান (উপন্যাস)

উত্তরদায় (উপন্যাস ও গল্প-সঙ্কলন)

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

বহুরঙ্গী মধুপুরী (গল্প-সঙ্কলন)

সুখ-দুঃখের পাখিরা

"The fields were fruitful, and starving men moved on the roads. The granaries were full and the children of the poor grew up rachitic, and the pustules of pallagra swelled on their side. The great companies did not know that the line between hunger and anger is a thin line ."

John Steinbeck

প্রথম অধ্যায়

এ দু'মাস বড় কঠিন। ভাদ্র-আশ্বিন। এ দু'মাসের দিনগুলো বড় নিষ্ঠুর। প্রতিটি দিন যাওয়ার আগে বুঝিয়ে দিয়ে যায়, বেঁচে থাকা কিরকম বিড়ম্বনা। শ্রাবণ মাস শেষ হতে না-হতেই ক্ষেতের কাজ ফুরিয়ে যায়। তারপর এক-আধটু নিড়ানির কাজ। তবু গরজের বালাই। নামমাত্র মজুরি। ক্ষেত-মজুরের ঘরে জন্ম নেওয়ার পাপ-স্খলন শুরু হয় তারপর থেকেই। কোনো বাঁধা-ধরা কাজ থাকে না। হাতের কাছে যখন যা পাওয়া যায়, তাই করতে হয়।

সিতাবের বড় সুবিধে —শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। দু'মণ আড়াই মণের পাট্টা অক্লেশে নিজেই তুলতে পারে, একটুও বিশ্রাম না নিয়ে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে দু'মাইল আড়াই মাইল রাস্তা। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দু'জনের কাজ একাই করতে পারে। তাই গাঁয়ে তার চাহিদা বেশি। মুনিষের দরকার হলে তারই ডাক পড়ে সবার আগে। কিন্তু মুশকিল আছে, খাতিরটা বেশি হলেও মজুরিটা বাড়ে না। তবু সিতাব কাজ করে হাসিমুখে। আসলে সিতাবের মুখটাই হাসিহাসি।

সেই সিতাবেরও এখন গাঁয়ে কাজ নেই। দু'একদিন নিড়ানির কাজের জন্যে কেউ কেউ ডাকে, কিন্তু তার যা মজুরি, তাতে এক সের চাল পাওয়া যায় না। এদিকে সংসারে তিনটি প্রাণী। তিনটি প্রাণীর পেট নয়, যেন এক-একটা জ্বালা। অতএব সিতাবকে এখন অন্য উপায় দেখতে হয়।

ভোরবেলা পান্তা খেয়ে বেরিয়ে গেছে সিতাব। সন্ধ্যে হয়ে এলো। অথচ তার ফেরার নাম নেই। কাজ নেই, তাই ফুল্লরা গরুটাকে ছোট ছোট করে বিচালি কেটে দিচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে খিদেয়। সারাদিন কিছু রান্না হয়নি। গতকাল কোনো কাজ পায়নি সিতাব। আগের দিনের যা-কিছু সম্বল, তাই গতরাত্রে রান্না হয়েছিল। আজ বলতে গেলে নিরম্বু উপবাস। যাওয়ার সময় সিতাব বলে গিয়েছিল, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে। কিন্তু এখন সন্ধ্যে। সিতাবের মা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। বিছানার পাশে লম্ফ জ্বলছে টিমটিম করে। লম্ফর ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে দাওয়ায়।

ফুল্লরা ছোট ছোট করে কাটা বিচালিগুলো গরুর নাদায় তুলে দিলো। গরুটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গেলো আদর করে। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া গরুটা ওসব বোঝে না। শিঙ বাগিয়ে ঢুসিয়ে দিতে এলো তাকে। ফুল্লরা একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে

পট্‌পট্‌ করে দু'ঘা বসিয়ে দিলো গরুটার মুখে। গজ গজ করে বলল, 'লক্ষ্মীছাড়া—নিমুখারাম!'

কঞ্চি ফেলে দিয়ে দাওয়ায় এসে পা ঝুলিয়ে বসল ফুল্লরা। খুঁটিতে হেলান দিয়ে। গরুটার কথা ভাবছিল। গত বছর কিনেছে সিতাব। এতটুকু বাছুর। দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেলো। আগে নাকি এই রকমই একটা গরু ছিল সিতাবের। ফুল্লরাকে বিয়ে করার সময় বিক্রি করতে হয়েছিল। তাই নিয়ে এখনও সে আপসোস করে। দুধের মতো সাদা ছিল তার গায়ের রঙ। শিঙ দু'টো ছিল আশ্চর্য সুন্দর। ফুল্লরার মতোই তার চোখ দু'টো ছিল কাজলের মতো কালো। সে-গরু ফুল্লরা নিজের চোখে দেখেনি। তার আশ্চর্য দেহের বর্ণনা সিতাবের মুখে সে অজস্রবার শুনেছে। শুনে শুনে ফুল্লরারই মুখস্ত হয়ে গেছে যেন।

সিতাবের বড় প্রিয় ছিল সেই গরু। কিন্তু প্রিয় কিছুর চেয়েও অধিকতর প্রিয় কিছুর দেখা পাওয়া যায় কখনো কখনো। ফুল্লরাকে দেখেছিল সিতাব। তার মধ্যে সে কি দেখেছিল, সে-ই জানে। জেদী তো কম নয়! একদিন সোজা গিয়ে ফুল্লরার বাবাকে বলল, ফুল্লরাকে বিয়ে করতে চায় সে। ফুল্লরার বাবা দীনবন্ধু তাকে খাতির করে বসতে দিলো। চা তৈরি করতে বলল ফুল্লরাকে। ফুল্লরা যখন এক বাটি চা এনে তার সামনে রাখল, তখন দীনবন্ধু তার সঙ্গে কথা বলছে বিষয়ের। ফুল্লরার মা বসে ছিল পাশে। পুরুষ মানুষের কথায় হুঁ-হাঁ দেওয়ার এখতিয়ার নেই তার।

ফুল্লরার হাতের তৈরি চায়ে চুমুক দিলো সিতাব।

সেই তখন, সিতাবকে দেখেছিল ফুল্লরা। কত আর বয়েস, তখনও গোঁফ-দাড়ি গজায়নি ভালো করে। অথচ লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই। কিরকম যেন বোকা-বোকা, গোঁয়ার-গোবিন্দ। নিজের বিয়ের কথা নিজেই বলতে এসেছে, তা-ও আবার স্বয়ং মেয়ের বাপের কাছে। লাজুক-লাজুক চোখে তাকে চেয়ে দেখছিল ফুল্লরা।

দীনবন্ধু বিষয়ী লোক। কত ধানে কত চাল, তা সে জানে। সিতাবকে চিনতেও ভুল করেনি সে। সুযোগ বুঝে নগদ দেড়শো টাকা হাঁকল বিয়ের খরচ-পত্তরের জন্যে। অজুহাতেরও অভাব নেই। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে। চারদিকে ধার-দেনা। এ-বছর বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার। সিতাব যদি একটু এগিয়ে আসে, তবে ভালোয় ভালোয় কাজ সারা হয়ে যায়। নইলে দু'এক বছর সবুর করো বাছা।

কিন্তু সিতাব সবুর করার পাত্তর নয়। আপাতত একশো টাকা নগদ দিতে রাজি হলো। বাকিটা বিয়ের পর।

পরদিনই সে তার আদরের গরুটাকে বিক্রি করে দিলো। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দীনবন্ধুর হাতে গুঁজে দিলো একশো টাকা। বলল, 'বিয়ের পরে বাকি টাকা দিবো। তারপর ফুল্লরাকে নি যাবো।'

ফুল্লরা গালে হাত দিয়ে ভেবেছিল, মা-গো মা, কি তেজ ! কালে-কস্মিনে এমন বিয়ে সে দেখেনি ।

ক'দিন পরেই বিয়ে হলো তাদের ।

বিয়ের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সারা হলে দীনবন্ধু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সিতাবের দৃঢ় পণ, বাকি টাকা না মিটিয়ে সে ফুল্লরাকে নিয়ে যাবে না। কলির ভীষ্মদেব আর কি !···

এমন সময় উঠোনের দরজায় লাথি পড়ল সিতাবের। পাড়া কাঁপিয়ে হাঁক দিলো, 'আমি এস্যাছি। কপাট খুল ফুলি। জলদি।'

রাজ্যের মহা সুসংবাদ ! সিতাব এসেছে। শুধু চিৎকার নয়, সেই সঙ্গে কপাটে একটা জোর লাথি মারা চাই তার। ফুল্লরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলল।

দরজা খুলতেই সিতাব। হাতে চাল-ডালের পুঁটলি। বাঁ হাতে একটা ছোট খড়ের আঁটি। উঠোনে পা দিতে না দিতেই বলে উঠল, 'বাপ রে বাপ। কপাট খুলার নাম নাই। ঘরের মধ্যে এমন কি কাজ করা হছিল পাটরানীর ?'

ফুল্লরা বুঝতে পারল, সিতাবের মন বেশ খুশি-খুশি। জবাব শোনার অবকাশ নেই তার। ফুল্লরা বলল, 'এই তুমার তাড়াতাড়ি আসা ?'

'আরে, আজ যে কার মুখ দেখে যেল্‌ছিল্যাম !'

দাওয়ায় খড়ের আঁটি আর পুঁটলি নামিয়ে রেখেই এক কাণ্ড করে বসল সিতাব। ধাঁ করে ফুল্লরাকে দু'হাতে ধরে ওপরে তুলে দু'পাক ঘুরে নিলো। তখনও তার কণ্ঠে উল্লাস, 'আমার ফুলুরানী গো, আমার ফুলুরানী ! আজ আমার ফুলুরানীর মুখ দেখে যেল্‌ছিল্যাম।'

শূন্যে পাক খেতে খেতে চিৎকার করে উঠল ফুল্লরা 'আঃ ছাড়ো ছাড়ো। কি হছে ?'

অবশেষে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। নাকে কিরকম ঝাঁজালো গন্ধ। সিতাবের সারা শরীর ধুলো-ধুলো। ধুলো লেগেছে ফুল্লরার কাপড়ে, হাতে-মুখে। বলল, 'ছি-ছি ! কি মেখে এস্যাছো ইসব ? ইস্ কি বই (গন্ধ) ! সারা গা ময় হঞে গেলো আমার। তা বাবুর এত খুশি কিসের ?'

'দ্যাখ ক্যানে কি এন্যাছি !'

'এন্যাছো বেশ কর্যাছো। তা তুমার গায়ে কি ইসব ?'

'সেমেট্ গো সেমেট্। সেমেট্ লয়, চন্দন। ভালো করে গায়ে মেখে লে।' সিতাব ফের দুষ্টুমি করে তার গলায় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিলো।

ফুল্লরা ধমক দিলো, 'এই, উরকম করিও না বুলছি। দেখি কি এন্যাছো। খড়ের আঁটিতে কি ?'

প্রথমেই খড়ের আঁটিটা খুলে ফেলল ফুল্লরা। ইলিশ। প্রায় আধ সেরটাক। আনন্দে বলে উঠল সে, 'বাঃ, কত বড় ইলিশ গো ! কুথা পেল্যা ?'

'পোখরে।'

'যাও, তুমার শুধু ফ্যাজল্যামি। কত দাম?'

'দু' টাকা।'

'দু' টা-কা!' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে সে সিতাবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সিতাব কি রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে! দু'টাকা দিয়ে একটা আস্ত ইলিশ! বলল, 'অত দাম দিঞে মাছ নি এল্যা তুমি? কুথা পেল্যা টাকা? তরি-তরকারি চাল-ডালও তো এন্যাছো দেখছি।'

'আরে শুন শুন।' বিষয়টাকে হালকা করতে চাইল সিতাব। দাওয়ার এক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল সে। বলল, 'আজ বাজারে যেঞে না, শুনল্যাম হরবংশের বাড়িতে রাজমিস্তিরি খাটছে, লোক দরকার। উখ্যানে যেতেই দেখি টেরাক-ভর্তি সেমেন্ট। হরবংশ বুললে, বস্তা-গুলিন গুদামে ভরে দে! বস্তা পিছু দু'আনা।'

'মুটে দু'আনা!' ফুল্লরার গলায় হতাশার সুর।

'কম হলো কিসে শুনি! শুধু টেরাক থেকে নামিয়ে গুদামে ভরে দিয়্যা। আমার কাছে উসব তো সেমেন্টের বস্তা লয়, তুল্যার বস্তা। পট্‌পট্ করে এক্‌লাই পঞ্চাশ বস্তা সাবাড় করে দিল্যাম।'

'কত হলো?'

'পঞ্চাশ দু'গুন্যা একশো। সওয়া ছ' টাকা।'

এতক্ষণে ফুল্লরা আশ্বস্ত হলো। বলল, 'তা তুমি ঝপ্ করে চান সেরে এসো। আমি ভাত চড়িয়ে দেই। তারপর মাছ বেছে ফেলব। বেশি দেরি হবে না। খালি মাছ-ভাত।'

'মা কুথা? শুঞে পড়্যাছে?'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। আজ সারাদিন প্যাটে কিছু পড়েনি।'

'তোরও তো?'

'আমার কথা ছাড়ো। মা বুঢ়্যা মানুষ।'

সিতাব উঠে ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকল, 'মাগো —মা—'

ঘুম-ভাঙা গলায় সিতাবের মা সাড়া দিলো, 'কে? সিতু এলি?'

'হ্যাঁ মা, দ্যাখো কি এন্যাছি!'

'কি এন্যাছিস?'

'ইলিশ।'

'ইলিশ! সস্তা পেলি বুধহয়! বৌ-কে বোল্ রাঁধতে।'

'তুমি উঠব্যা না?'

'একটুকুন পরে যেছি।'

সিতাব গামছা টেনে নিয়ে চান করতে গেলো।

এমনি হয় মাঝে মাঝে। সময় বড় নিষ্ঠুর। সেই নিষ্ঠুর সময়ের কাছ থেকে সিতাবের মতো লোকেরা শক্ত হাতে কখনো কখনো এক-আধটু আনন্দ ছিনিয়ে নেয়। বড় আমেজে বড় আয়েশে তারিয়ে তারিয়ে তা উপভোগ করে। দুঃখ-কষ্ট-দুশ্চিন্তা পেছনে পড়ে থাকে উপেক্ষার ঝুড়িতে।

সারাদিন উপবাসের যন্ত্রণা ভুলে যায় সবাই। থালায় থালায় গরম ভাত ঢেলে দেয় ফুল্লরা। বাটিতে বাটিতে গরম মাছ। থালা থেকে বাটি থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে। ধূপ-ধুনোর মতো কিরকম একটা বিচিত্র গন্ধে ঘর ভরে যায়। থালায় থালায় বাটিতে বাটিতে যেন দেবতার নৈবেদ্য। সত্যিকার দেবতার পূজো হচ্ছে যেন।

তিনজনেই খেতে বসে ওরা। একসঙ্গে।

সিতাব বলল, 'মাছটা একেবারে টাটকা, লয় মা?'

মা বলল, 'গঙ্গার ইলিশ। তোর বাপ একবার এত বড় এক টাটকা ইলিশ এন্যাছিল, বুঝলি সিতু। তুই তখুন ছোট, দুধের দাঁত উঠ্যাছে কেবল।'

'বাবা খুব ইলিশ ভালোবাসত, লয় মা?'

ফুল্লরা বলল, 'আমার মা আবার ইলিশের বই লিতে পারত না।'

সিতাব বলল, 'মিছ্যা কথা। তোর বাবা যা হাড়-কিরপণ, কখুনো ইলিশই চোখে দ্যাখেনি।'

মা ধমক দিলো, 'ছিঃ সিতু, শ্বশুরের নামে উকথা বুলতে নাই।'

ফুল্লরা বলল, 'হাঁদারাম হলে আর কি বুলবে! গুরুজন বুলে জ্ঞান আছে?'

সিতাব বলল, 'জামাইয়ের কাছ থেকে দেড়শো টাকা লিয়্যাছে বাটপাড়ি করে। তাকে গুরুজন বোলে বুঝি?'

'বাটপাড়ি করে লয়, তুমি পায়ে সেধে দিঞে এস্যাছো। এই ফুলির লেগে —।' হঠাৎ গলায় ভাত আটকে যায় ফুল্লরার। খক খক করে কাসতে শুরু করে। তার বাপের বাড়ির কথা উঠলেই যখন-তখন সেই দেড়শো টাকার খোঁটা দেয় সিতাব। ফুল্লরা সব সইতে পারে, মা-বাপের নামে খোঁটা সইতে পারে না। রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। আর সিতাব তখন দারুণ মজা পেয়ে হাসতে থাকে।

গেলাস তুলে ঢকঢক করে খানিকটা জল খায় ফুল্লরা।

সিতাব ঠাট্টা করে বলে, 'ঘোষ ডাক্তোরের হেমাপতি আনতে হবে নাকি?'

ফুল্লরা আর কথা না বলে ভাত খেতে শুরু করে।

সিতাব বলে, 'মা-কে আরেকখান মাছ দে ফুলি। বেশ হৈল্ছে খেতে।'

রান্নার প্রশংসা শুনলে ফুল্লরা খুশি হয়। শাশুড়ীর থালায় মাছ দিতে দিতে বলে, 'সরষে-বাটা হলে আরো ভালো হতো।'

আপোসের সুরে সিতাব বলে, 'আচ্ছা, সস্তা পেলে নি আসব আরেকদিন।'

রাতের অন্ধকারে লম্ফর মিটমিটে আলোয় তিনটি প্রসন্ন মুখ, কে ভাবতে পারে, সারাদিন উপবাসে শুকনো মুখে কাটিয়েছে তারা ? এমনি করে দুর্ভাগ্য প্রতিদিন পরাজিত হয়, প্রতিদিন জীবন নতুন করে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের বরণডালা সাজায়।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সহজে তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিতাব বলে, 'এবার তোর একখান শাড়ি কিনব ফুলি।'

ফুল্লরা সিতাবের কাছে আর একটু সরে আসে। বলে, 'তাহলে মা-র লেগেও আনিও একখান।'

'আনব। হরবংশ বুলছিল ওর ধানভাঙা কলে কাজ কৈর্‌তে। মাসে মাসে মাহিন্যা। বাঁধা কাজ।'

'কত দিবে ?'

'খুব কম বুলছে শালা। মাসে চল্লিশ।'

'ওতে তুমার পুষাবে না।'

'আমিও কথা দিইনি। যদি ষাট টাকায় উঠে —'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে দু'জনেই। ভাবতে থাকে। তারপর এক সময় ফুল্লরা বলে, 'আজ বড্ড গরম।'

'ভাদর মাস। গরম পৈড়বে না! আমি চান কর্‍্যাছি বুলে অত গরম লাগে না।'

ফুল্লরা গায়ের শাড়ি একটু ঢিলে করে দেয়। তারপর পরম আদরে সিতাবের মাথার চুলে বিলি কাটতে থাকে। হঠাৎ লম্ফটা নিভিয়ে দিয়ে ফুল্লরাকে কাছে টেনে নেয় সিতাব। এসময় ফুল্লরার বড় সুখ।

দুই

কিন্তু সময়ের কথা মনে রাখা দরকার আগে। মাস দু'টো ভাদ্র-আশ্বিন। ভাদ্র মাস কেটে গেলেও আশ্বিন মাস। সময়ের দিক থেকে কম নিষ্ঠুর নয়। কয়েক-দিন হরবংশের সিমেণ্ট বয়েছে সিতাব। মন্দ রোজগার করেনি। ফুরনের কাজে তার রোজগার ভালো হয়। তার সুবিধে —শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দু'জনের কাজ সে একাই সারতে পারে। কিন্তু এসময় ফুরনের কাজ কোথায় ? দিন-মজুরির কাজ পাওয়াই দায়। গাঁয়ে এখন মোটেই কাজ নেই। কয়েকদিন বাজারে গিয়ে গিয়ে ফিরে এলো সিতাব। নতুন বাড়ি তৈরি করছে যারা, তাদের কাজ বন্ধ। সিমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। সিতাব অবাক হয়। হরবংশের গুদামে হাজার হাজার বস্তা সিমেণ্ট। আর সিমেণ্টের অভাবে এদের কাজ বন্ধ! বুঝতে পারে না সিতাব। একজন বাড়িওয়ালাকে সে-কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে সে! ধমক দিয়ে বলেছিল, 'তুমি এসবের কি

বোঝো হে ছোকরা? আমার কি নোট ছাপার কল আছে? ব্ল্যাক-মার্কেটে দু'গুণ তিনগুণ দাম দিয়ে সিমেণ্ট কিনে বাড়ি তৈরি করব!'

ওসব বুঝবার দরকারও নেই সিতাবের। তার কাজ দরকার। কাজ না হলে মা-কে উপোস করতে হয়, ফুল্লরাকে উপোস করতে হয়। সে নিজেও খিদে সহ্য করতে পারে না। খিদে বড় যন্ত্রণা দেয়।

সিমেণ্ট বয়ে যে ক'টাকা রোজগার করেছিল, শেষ হয়ে গেছে। বাজে খরচ সে কিছুই করেনি। বাড়তি খরচ বলতে ফুল্লরার একখানা শাড়ি, মায়ের একখানা সাদা ধুতি। তা-ও অল্প দামের। গতকালই উপোসে থাকার কথা। কিন্তু ফুল্লরার হিসেবের জন্যেই উপোস থাকতে হয়নি। চাল থেকে খুদ কেটে কেটে রেখেছিল, তারই জাউ রেঁধেছিল সে। আজ সকালে না খেয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়েছে সিতাব।

রান্না নেই, তাই কাজও নেই। কিন্তু কিছু করা দরকার। চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে না। সকালবেলা ঘাট থেকে থালা-বাসনগুলো ধুয়ে এনেছে ফুল্লরা। কাচার দরকার নেই, তবু বিনা ক্ষারে কাপড়গুলো কাচল। তারপর গোবর দিয়ে উঠোন নিকোতে বসল। তা-সত্ত্বেও দিন কাটে না। সবে মাত্র সুয্যি মাথার ওপর। সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি। সিতাব যদি কাজ পেয়ে থাকে, ফিরবে সেই তখন। কাল ভালো করে খাওয়া জোটেনি, তাই সিতাবের মা বড় কাতর হয়ে পড়েছে। জল খাওয়ার বেলা হতেই কাপড়ে মুখ ঢেকে দাওয়াতে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে পড়েছে। মুখ ঢেকে শুয়ে থাকলে খিদে কম পায় বুঝি!

দুপুরবেলা উঠে বসল সিতাবের মা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে। ফিরল অনেকক্ষণ পর। তখন ফুল্লরার উঠোন নিকোনো হয়ে গেছে। গরুকে বিচালি কেটে দিচ্ছে ছোট ছোট করে। বিচালিও প্রায় শেষ। দু'তিন বিঘে তো ভাগের জমি। বিচালি আর কত হবে! এরপর গরুটার জন্যে আবার এক দুশ্চিন্তা।

সিতাবের মা-র হাতে একটা তালপাতার টুকি। তাতে আধ সেরটাক চাল। বলল, 'চাল ক'টা চড়িয়ে দে বৌ। আধলার মা-র কাছ থেকে নি এল্যাম। নিজেরই দুখ গাইছে কত। কাল নাকি ওর নিজেরই হাঁড়ি চৈড়্বে না। কত বুলে-টুলে তবে এই দু'পুয়া দিলে। কালই দিঞে দিতে হবে।'

ফুল্লরা এসে টুকিটা হাতে নিলো। বলল, 'কাল কোত্থেকে দিব্যা?'

'উ-কথা পরে ভাবব। দেখি, সিতু আসুক।'

সন্ধ্যে হতেই সিতাবের মা শুয়ে পড়ল ঘরের ভেতর। বলল, 'বৌ, আমাকে আর উঠাস না। বুধহয় জ্বর এলো। শরীরটা খুব খারাপ কৈর্ছে। সিতু এলে খেঞে-দেঞে শুঞে পড়িস।'

ভাতের হাঁড়ি তখন উনুন থেকে নেমেছে। রান্না হচ্ছে বন-বাদাড়ের শাক

পাতা। সিতাবের মা নিজেই তুলে এনে দিয়েছে। কোথা থেকে কার গাছের দু'টো ঝিঙে এনেছে। তারই ঘ্যাঁট রান্না করছে ফুল্লরা।

শাশুড়ীর কথা সে বুঝল। অত বোকা মেয়ে নয় সে। আধ সের চালের ভাত খায় সিতাব একা। মা তাতে আর ভাগ বসাতে চায় না। জ্বর-টর কিচ্ছু না, শুধু ফুল্লরার মন-বোঝানো।

'তুমি খাবা না?'

'না বাছা। রেতে খেলে জ্বর বাড়বে।'

সিতাবের ফিরতে বেশ দেরি হলো। উসকো-খুসকো চেহারা। মুখখানা দু'দিনেই শুকিয়ে আমসি। এসেই দাওয়ায় বসে পড়ল ধপ করে। বলল, 'না ফুলি, আজও কিছু হলো না।'

ফুল্লরার যেন কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, কোনো কষ্ট নেই তার। তেমনি গলায় শুধাল, 'তা আসতে এতো দেরি কৈর্‌ল্যা ক্যানে?'

'কাজ-টাজ কুথাও পেল্যাম না। দুপুরবেলা ফিরছি, রাস্তায় বেণুর সাথে দেখা। বুললে, কাল থেকে হালদারদের বাড়ির কাজ শুরু হবে। তাই আবার ফিরে গেলাম উখ্যানে খোঁজ লিতে।'

ফুল্লরা বাধা দিয়ে বলল, 'থাক, পরে শুনব। হাত-মুখ ধুঞে এসো। আগে চাট্টি খেঞে লাও।'

সিতাব অবাক হয়ে ফুল্লরার মুখের দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'চাল পেলি কুথা?'

'উ-কথা পরে শুনিও। তুমি যাও আগে।'

সিতাব খেতে বসে। শুধায়, 'মা খেয়্যাছে?'

'না, মা-র জ্বর।'

'কখুন থেকে?'

'সাঁজের একটুকুন আগে থেকে।'

'তুই?'

'আমি কি আখুনো খাইনি? তুমার লেগে বসে বসে খাবার আগলাবো সারাদিন?'

'বেশ কর্‌য়্যাছিস।' সিতাব আশ্বস্ত হয়। খেতে খেতে বলে, 'সারাদিন শালা ঠাঠালাম বসে বসে। হালদার বুললে, সেমেটের লেগে লোক যেল্‌ছে, যদি পায় কাজ হবে। সেই লোকের আশায় বসে থাকি। শালা এলো আবেলায়। বুললে, তিন-চারদিন দেরি হবে সেমেট্ পেতে।'

'তাহলে কালও কাজ হবে না?' অবুঝের মতো জিজ্ঞেস করে ফুল্লরা।

সিতাব ঝাঁজালো গলায় জবাব দেয়, 'কি করে কাজ হবে শুনি? সেমেট্ না পেলে কাজ হবে কি মাটি দিঞে?'

ফুল্লরা চুপ করে যায়।

দু'দিন উপোসের পর আধ সের চালের ভাত সবগুলিই খেলো সিতাব। চেটেপুটে সব তরকারিটুকু শেষ করল। বলল, 'ভারি চমৎকার হৈল্‌ছে রে! আরেকদিন রাঁধিস তো এমনি করে।'

হেঁসেল সামলে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেলো ফুল্লরা। খালি পেটে জল পড়তেই গা-টা কিরকম গুলিয়ে উঠল। মাথাটা ঘুরে উঠল যেন একটু।

যখন সে শুতে গেলো, তখন ক্লান্ত অবসন্ন সিতাব ঘুমিয়ে পড়েছে। ফুল্লরা বিছানার একপাশে শুয়ে পড়ল। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো আলোটা।

আলো চোখে ভীষণ লাগে। আলো সব সময় ভালো লাগে না।

তিন

এখন আর কাজ খুঁজে লাভ নেই। ভূ-ভারতে কোথাও কাজ নেই। এখনও কাজ খুঁজে বেড়ালে শেষে না খেয়ে মরতে হবে সবাইকে। সিতাব জাল নিয়ে বেরোলো। গাঁয়ের প্রায় অধিকাংশ লোকেরই দু'একখানা জাল থাকে। খেপলা জাল। ওরা বলে 'খ্যা-জাল'। নিজেরাই বোনে। গ্রীষ্মকালে পুকুর-ডোবা যখন শুকিয়ে যায়, তলায় এক-আধটু জল পড়ে থাকে, তখন দল বেঁধে মাছ ধরে তারা। কিন্তু এসময় ভরা পুকুরে মাছ পাওয়া যায় না। দল গজিয়ে জঙ্গল হয়ে থাকে পুকুরগুলো। জাল ফেলার মতো ফাঁকা জায়গা বড় কম। তবু একবার চেষ্টা করে দেখবে সিতাব।

সকালে উঠে সিতাবের মা বড় বিমর্ষ। আজ নিয়ে তিন দিন। ফুল্লরার মুখের দিকে চেয়ে মন আরো খারাপ হয়ে যায়। কাঁচা বয়েস। খিদে বেশি। অথচ তিন দিন থেকে ও বেচারাও না খেয়ে আছে। মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে, সিতাবের সঙ্গে কাল সে নিজে খায়নি। ফুল্লরাকে বলল, 'বৌ, খুরাটা (খোরা) দে তো। সামের কাছে থুঞে ক'টা টাকা পাই কি-না দেখি।'

ফুল্লরা কাঁসার বড় খোরাটা ঘর থেকে এনে শাশুড়ীর কাছে নামিয়ে রাখল। খোরাটা নিয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। শরীরটা বড় দুর্বল। মাথা ঝিমঝিম করছে।

রাস্তায় বেরিয়ে আঁচলের কাপড়ে খোরাটা ঢাকল সে। ভেবেছিল, মুচিপাড়া দিয়ে বেরিয়ে যাবে, যাতে কারোর চোখে না পড়ে, কিন্তু নিমতলায় সুমাদিস বসে। গায়ে একটা কাপড় জড়ানো। খক্ খক্ করে কাসছে। কথা না বলে পারল না সিতাবের মা। জিজ্ঞেস করল, 'কি হৈল্‌ছে গো?'

মুখ তুলে তাকাল সুমাদিস। মুখ-ভর্তি খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি। দু'টো গর্তের মধ্যে দু'টো চোখ। চোয়ালের হাড়ের ওপর চামড়া আছে কি-না বোঝা

যায় না। তার নিজের চেহারাও কি ওই রকম হয়েছে? নিজের গালে হাত দিয়ে দেখল সিতাবের মা।

ফ্যাসফেসে গলায় সুমাদিস বলল, 'জ্বরে ভুগছি সিতুর মা। আখুন ম'লেই বাঁচি। উটা কি নি যেছো? খুরা? সামের কাছে বুঝি?'

সিতাবের মা-র মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। বলল, 'হ্যাঁ, সিতুর কাজ হয়নি দু'দিন।'

সময়টা একটু কমিয়ে বলল সে। যেন কাজ না হওয়াটা মস্ত অপরাধের।

সুমাদিস বলল, 'সামের কাছে নি যেছো? শালা হারামীর বাচ্চা। ওতে কি টাকা দিবে?'

'ক্যানে?'

'আমার পিতলের ঘড়াটা দেখ্যাছো তো? রাধুর মা জল আনতে যেল্‌ছে কতদিন। কত বড় ঘড়া! তা, শালা ছোটলোক, কিছুতেই ছ'টাকার বেশি দিলে না। এদিকে আবার টাকায় এক আনা করে সুদ।'

'ওদেরই আখুন সংসার।'

সিতাবের মা ভাবতে ভাবতে এগোয়। সুমাদিসের বড় কষ্ট। ছেলে নেই ওর। তিনটিই মেয়ে। দুর্গা, রাধা, গৌরী। দুর্গার বিয়ে হয়ে গেছে। দু'টোর বোঝা এখনও ঘাড়ে। সংসারে চারটি লোক। রোজগার-পাতি নেই একেবারে। অঞ্চলপ্রধান দয়া-পরবশ 'ডাইডোলে' ওর নাম লিখে দিয়েছে। হপ্তায় এক সের চাল পায়। তাতে কি হয়! এক সের চালে একদিনও চলে না। না-খেয়ে না-খেয়ে বেচারার ওই হাল দাঁড়িয়েছে।

সিতাবের মা এগিয়ে যায়।

সামের তেজারতি কারবার এখন জমজমাট। ঘরে লোক ধরে না। ঘটি-বাটি সোনা-দানা যে যা পারে নিয়ে আসে। ক'টা টাকা চাই। ক'টা টাকার দরকার। সামের মেজাজ চড়ে থাকে সব সময়। এসব যেন তার পছন্দ নয়। নেহাত দায়ে পড়ে এসব করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বলে, টাকা নেই, টাকা ফুরিয়ে গেছে। লোকেরা কাকুতি মিনতি করে। শুধু পায়ে ধরতে বাকি থাকে। তখন সাম বলে, 'আচ্ছা, কাল বিক্যালের দিকে একবার আসিস। সকালে রামপুরহাট যেঞে দেখব, তোদের লেগে কিছু টাকা-কড়ি যোগাড় কৈবুতে পারি কি-না। যদি আনতে পারি, পাবি।'

লোকে দু'হাত তুলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, সাম যেন কাল টাকা পায়।

এভাবেই কেটে যায় বছরের পর বছর। কারবার বন্ধ হয় না। টাকা ফুরিয়ে যায়, আবার টাকা আসে। তবু 'টাকা ফুরিয়ে গেছে' শুনলেই উৎকণ্ঠিত হয় সবাই।

সিতাবের মা দেখে, ঘরে লোক গিজগিজ করছে। গাঁয়ের লোক, পাশের গাঁয়ের লোক। প্রায় সবাই চেনা। অতগুলো লোকের সামনে যেতে লজ্জা করে। জিনিস বন্ধক দিতে আসা এই তার প্রথম নয়। প্রতি বছরই সময়ে-অসময়ে আসতে হয়। প্রতিবারই সঙ্কোচে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সবার চোখের আড়ালে কাজ সেরে চলে যেতে চায়, কিন্তু কখনোই সফল হয় না। জেনে ফেলে সবাই। সবাই যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে আসে এখানে।

সোজাসুজি সামের কারবারের ঘরে না গিয়ে অন্দরমহলের দিকে পা বাড়ায় সে। যদি সম্ভব হয়, সামের বৌকে জিনিসটা দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে নেবে। ভেতরে যেতেই আসন পেতে দিলো সামের বৌ। জিজ্ঞেস করল, 'কুন দিকে গো মাসি?'

সিতাবের মা বলল, 'আবার কুন দিকে? আমাদের কি আর যাবার জায়গা আছে মা? জিনিসটা থুঞে ক'টা টাকা দে বৌ।'

'আমি উসব বুঝি না মাসি। টাকা লিব্যা তো উখ্যানে যাও। যেঞে বোলো।'

'ঘরে তো লোক আঁটে না বৌ। আমার খুব নজ্জা কোচ্ছে।'

'সময়টা যে বেজায় খারাপ মাসি। সবারই এক হাল। কারবারে তো বেশি টাকা নাই। অত টাকা দিবে কোত্থেকে? অথচ না দিলে লয়। গাঁ-র মানুষ যাবে কুথা বোলো! তাই 'ব্যাঙ্‌' থেকে ধারে টাকা নি আসছে। আমাদেরই কত ধার-দেনা হঞে গেলো ইসব কৈর্‌তে।'

'তা সাম বেঁচে-বত্তে থাক মা। পরের ভালো কৈর্‌লে ভগবান ভালো কৈর্‌বে।'

'আমি তো মানা কচ্ছিল্যাম বাপু। কি দরকার রাজ্যের ধার-দেনা বাড়িয়ে! তা তুমার ছেলে বোলে কি, না দিলে এরা অসময়ে যাবে কুথা? অথচ ভ্যাখো, 'ব্যাঙ'-এর ধার ঠিক সময়ে শোধ না কৈর্‌লে জমি-জায়গা বাড়ি-ঘর সব লিলাম করে লিবে। কি বিপদের কথা বোলো তো!'

সিতাবের মা গালে হাতে দিয়ে অবাক হয়ে ভাবে।

এমন সময় সামের বৌ ছেলেকে ডেকে বলল, 'তোর বাবাকে ডাক তো একটুকুন।'

একটু পরেই সাম এলো। বেশ বিরক্ত। বলল, 'আবার কি? ডাকো ক্যানে? রাজ্যের ঝামেলা উদিকে।'

'বৌ বলল, মাসি এস্যাছে ক'টা টাকা লিবে।'

সাম বলল, 'তা উদিকে যেলেই তো হতো মাসি।'

সিতাবের মা বলল, 'একগাদা লোক আছে বাবা, তাই যাইনি।'

'কি এন্যাছো?'

সিতাবের মা খোরাটা মেঝেয় রাখল। বলল, 'ক'টা টাকা দাও বাবা, দিন চলে না।'

সাম খোরাটা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'ইসব জিনিসে টাকা দিয়্যা খুব মোশকিল মাসি। আখুন দিনকাল খারাপ। এবার থেকে আমরা শুধু সোনা-চাঁদির জিনিস থুবো ভাবছি।'

সিতাবের মা ক্ষীণ অনুযোগ করল, 'আমরা উসব কুথা পাবো বাবা?'

'কিন্তু এতে তুমি আর ক'টাকা পাবা?'

'যা হয়, দাও।'

'গোটা তিনেক টাকা দিতে পারি। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই ছাড়িয়ে লিতে হবে বাপু। নইলে জিনিস ফেরত পাবা না। ইসব জিনিস থুয়ার বড্ড ঝামেলা।'

'কিছু বেশি হয় না বাবা?'

'না মাসি। এতে তিন টাকার বেশি দিতে পারব না। এদিকে এসো।'

সিতাবের মা উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে বেঞ্চে বসে আছে ছকু মোড়ল। সিতাবের মা অবাক। ছকু মোড়লেরও টাকার দরকার? ছকু মোড়লও জিনিস বন্ধক রাখে?

ঘরের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে তিনটি টাকা দিলো সাম।

সিতাবের মা এসে সামের বৌকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ গো বৌ, ছকু মোড়লও টাকা লেয় না-কি?'

বৌ বলল, 'উ তো আমাদের মোটা খদ্দের মাসি। পৈর্তেক বছর টাকা লেয়।'

'হায় মা, আমরা মনে করি শুধু আমাদেরই জ্বালা!'

'মোড়ল তো জ্বালায় পড়ে আসে না মাসি। কারবার করার লেগে টাকা নি যায়। জমির ওপর টাকা বসায়।'

সিতাবের মা বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সুদের ওপর টাকা নিয়ে যায় ছকু মোড়ল। তারপর সেই টাকায় নামমাত্র দামে জমি কেনে সে। দু'চার বিঘে যাদের জমি, খিদের জ্বালায় অর্ধেক দামে তারা জমি বিক্রি করে মোড়লের কাছে। জমি বন্ধক রেখেও টাকা দেয় কাউকে কাউকে। বিঘে প্রতি একশো দেড়শো টাকা। দু'বছর কিংবা তিন বছর মেয়াদ। সময়ের মধ্যে জমি ছাড়াতে না পারলে জমি আর ফেরত পায় না চাষীরা। জমির মালিকের অজান্তেই সে-জমি রেজেস্ট্রি হয়ে যায় ছকু মোড়লের নামে। সিতাবের বাবার দু'বিঘে জমিও এভাবেই ছকু মোড়ল গ্রাস করেছিল।

এমনি করে গ্রামের সব জমি একদিন ছকু মোড়লের হাতে চলে যাবে। তারপর একদিন সবাই সিতাব হয়ে যাবে। কাজের জন্যে ছুটে বেড়াবে এ-গাঁ থেকে সে-গাঁ। কোথাও কাজ না পেয়ে বুড়িয়ে যাবে অকালে। সুমাদিসের মতো নিমতলায় বসে বসে ধুঁকবে। বলবে, 'জ্বরে ভুগছি সিতুর মা। আখুন ম'লেই বাঁচি।'

চার

সিতাব ফিরল দুপুর গড়িয়ে। হাতে ভেজা জাল। গুনগুন করে গান গাইছে। একটাই গান শিখেছে জীবনে—'মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর, আমি

তুমারি —আমি তুমারি —।' একটা গানই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গায়। কেউ শোনে না, হয়তো নিজেও শোনে না। তবু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে, মনে ফূর্তি এলে গলা থেকে আপনা-আপনি গান বেরোয়। গুনগুন করতে করতে উঠোনে এসে ভেজা জাল মেলে দিতে লাগল সে।

ফুল্লরা দাওয়ায় বসে বসে খেজুর পাতা দিয়ে মাদুর বুনছিল। টুকটুক করে চেয়ে চেয়ে দেখল সিতাবকে। মাছ নেই, হয়তো মোটেই পায়নি। তবু মেজাজটা এমন খুশি-খুশি কেন? মাঝে মাঝে এই রকম আপনভোলা লোকটাকে দেখে অবাক হয় ফুল্লরা। জিজ্ঞেস করল, 'শিকার তো জুটেনি দেখছি, তা বাবুর এতো খুশি ক্যানে?'

'উঁ' বলে হঠাৎ চমকে উঠল সিতাব। এতক্ষণ যেন তার ধারণা ছিল, ভূ-ভারতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। বলল, 'না, মাছ দিঞে দিল্যাম।'

'দান করে দিল্যা?'

'না রে না। পয়সা নি দিয়্যাছি। আমার ফুলুরানীকে হিসাব দিতে হবে না?'

জাল মেলে দিয়ে দাওয়ায় উঠল সিতাব। পরনের গামছার খুঁট থেকে পয়সা বার করল সে। এক টাকার একখানা নোট আর কিছু রেজগি। বলল, 'এ-সময় কি শালা খ্যা-জালে মাছ উঠে। দুপুর পজ্যন্ত খ্যা দিঞে পুণে তিন পুয়া মাছ। দু'টাকা দর। আধ সেরের দাম ধর এক টাকা, আর পুণে এক পুয়ার দাম কত হয়?' জিজ্ঞাসু চোখে ফুল্লরার দিকে চেয়ে রইল সে।

ফুল্লরা মুখে মুখে হিসেব শুরু করল। অনেক চেষ্টা করে বলল, 'এক পুয়ার দাম ধরো আট আনা। তাহলে কিছু কম হবে। সাত আনা।'

সিতাব বলল, 'খুব হিস্যাব বুঝিস! সাত আনা লয়, ছ'আনা হয়। এই লে—'

খুচরোগুলো ফুল্লরার পাশে মেঝেয় রাখল। হাত দিয়ে মোটামুটি গুনে দেখে নিলো ফুল্লরা।

আসলে সিতাব পেয়েছিল পুরো দেড় টাকা। চায়ের দোকানে সে মজা করে দু'টো আলুর চপ আর এক কাপ চা খেয়েছে দু'আনায়।

বলতে গেলে দিনটা তার ভালোই গেছে।

জালে মাছ উঠছিল না আদৌ, তাই একটার পর একটা পুকুরে জাল ফেলতে ফেলতে সে রেল লাইন পেরিয়ে চলে গিয়েছিল প্রায় শিবপুরের কাছাকছি। ফেরার সময় স্টেশনের ভেতর দিয়ে ফিরে আসছিল। স্টেশনের কাছেই লাইনের ধারে বড় বড় খাল রয়েছে। দল-টল গজায় না। ওখানে একবার চেষ্টা করে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তার। ভয়ও করছিল একটু একটু। রেলের বাবুরা হয়তো বকবেন। তবু সে গিয়ে জাল ফেলল।

যা ভেবেছিল, তাই। নীল রঙের জামা-প্যাণ্ট পরা একটা লোক লাইন থেকে ওকে ডাকল। বলল, 'এই শুনো, বাবু তুমাকে ডাকছে। এদিকে এসো।'

সিতাব একবার ভাবল, একটা লম্বা দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তার সঙ্গে পেরে ওঠে, লোকটার সে-সাধ্যি নেই। হয়তো ডেকে পুলিসের হাতে দিয়ে দেবে। কিন্তু কি মনে করে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না। ততক্ষণে লোকটা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সিতাব জিজ্ঞেস করল, 'কুন বাবু ডাকছে?'

লোকটা বলল, 'টিকিট বাবু। ইসব রেলের জায়গা, বুঝ্যাছো! এখ্যানে মাছ ধরা বারণ।'

'আমি জানত্যাম না। চলে যেছি।'

'না না, তুমি বাবুকে দেখা করে যাও।'

সিতাব ভেজা জাল নিয়ে স্টেশনে গেলো। প্লাটফর্মে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। পরনে ধুতি-জামা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে, মাছ পেয়েছিস?'

সিতাব বলল, 'চাট্টি পেয়্যাছি বাবু।'

'দেখি, খোল তো।'

সিতাব বসে কোঁচড় খুলে দেখাল। বাবু বললেন, 'মাছগুলো আমায় দিয়ে যা। কত দাম নিবি?'

'হ্যান যা হয়।'

বাবু বললেন, 'ও হারুন, একে সঙ্গে করে নিয়ে যা তো। ওই দোকানটায় মাছগুলো ওজন করে নিস। নিয়ে কোয়ার্টারে দিয়ে দিস্।'

হারুন ওরফে সেই নীল রঙের প্যাণ্ট-জামা পরা লোকটা সঙ্গে করে নিয়ে গেলো সিতাবকে। দোকানের দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করল। তিন পো-র কিছু কম। তারপর মাছগুলো আবার কোঁচড়ে নিয়ে কোয়ার্টারে গেলো।

কোয়ার্টারের বারান্দায় গোটা তিনেক ফরসা ফরসা ছেলেমেয়ে। কি সব আজব খেলা খেলছে। চেঁচামেচি করছে। হারুন জিজ্ঞেস করল, 'বুধি, মা কুথা?'

বড় মেয়েটার নাম বুধি। বয়সটা প্রায় ফুল্লরার কাছাকাছি। পরনে ফ্রক। কি সুন্দর দেখতে মেয়েটা! ফুল্লরাকে ফ্রক পরিয়ে দিলে কেমন লাগে দেখতে?

বুধি চেঁচিয়ে মা-কে ডাকল, 'মা, এদিকে এসো। হারুনদা ডাকে।'

যেন একটি বাঁশি সুর হয়ে বেজে উঠল মেয়েটির কণ্ঠস্বরে।

ভেতর থেকে সাড়া এলো, 'যাই।'

বুধি এগিয়ে এলো সিতাবের কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'মাছ এনেছ বুঝি?'

সিতাব নাকে কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল।

মেয়েটা ফের জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাড়ি কোথায় গো?'

সিতাব আঙুল দিয়ে দেখাল, 'ওই যে —ওই গাঁ-খান সাদিনপুর।'

বুধি এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই একটা অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি নিয়ে এলো।

মাছগুলো ঢেলে দিলো সিতাব।

আনন্দে কলরোল করে উঠল ছেলেমেয়েগুলো। বাচ্চা ছেলেটা এসে একটা চিংড়ির শুঁড় ধরে তুলল। বলল, 'এটা আমি খাবো ভাই।'

তারপর সেখানেই ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু হলো। বুধির মা এসেও উঁকি মেরে দেখলেন মাছগুলো। বেশ খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'তুমি রোজ মাছ ধরো?'

সিতাব বলল, 'না। মাঝে-মধ্যে ধরি। যখুন কাজ-টাজ হয় না, তখুন।'

'মাছ পেলেই আমাদের দিয়ে যেও বাছা। দেখছ তো ছেলেমেয়েদের কাণ্ড। কাছে না আছে হাট-বাজার, না আছে কিছু। ছেলেমেয়েরা চোখে একটু মাছ দেখতে পায় না। সপ্তায় একদিন হারুনকে রামপুরহাট পাঠাই বাজার করতে। সেদিন যা-হোক কিছু নিয়ে আসে। এই বুধি, মাছগুলো ভেতরে নিয়ে যা।'

বুধি চলে গেলো। বুধির মা বলল, 'মাছ পেলেই নিয়ে এসো, কেমন?'

সিতাব মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

'তুমি কাদের?'

'কুনাইদের।'

'কি নাম তুমার?'

'সিতাব মণ্ডল।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমাদেরই স্বজাতি তাহলে। কোন গাঁয়ের তুমি?'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলেন বুধির মা। কথা বলার একটা মানুষ পেয়ে যেন ছাড়তে ইচ্ছে করে না তাঁর। ইতিমধ্যে বুধি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। ডাগর ডাগর চোখে চেয়ে দেখছে সিতাবকে।

সত্যিই, এখানে মানুষ বাস করে কি করে, সিতাব নিজেও ভেবে অবাক হয়। হাট-বাজার দূরে থাক, কারোর দু'একখানা বাড়ি পর্যন্ত নেই। মাঠের মধ্যে স্টেশন সাদিনপুর। ওই নামে যে গ্রামখানা রয়েছে, তা-ও এখান থেকে আধ মাইল দূরে। স্টেশনের কাছাকাছি দু'তিনটে রেলওয়ে কোয়ার্টার। এই একটি ছাড়া সেগুলো প্রায় সবই খালি। আর কোনো ফ্যামিলি নেই। একটা কোয়ার্টারে শুধু শিউপ্রসাদ থাকে। একা। স্টেশনের কেবিনম্যান সে।

বুধির মা বললেন, 'আমার হয়েছে জ্বালা। বাবুর বদলির চাকরি। সঙ্গে সঙ্গে এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাকেও ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে হয় দেশে দেশে। তা এমন জায়গায় আর কখনও পড়িনি বাবা। ছেলেমেয়েগুলো হাঁপিয়ে উঠেছে। খেলাধুলোর একটা সঙ্গী পর্যন্ত নেই।'

কথাগুলোর আন্তরিকতায় সিতাবের মনে হয়, এরা যেন তার কতদিনের জানাশোনা।

বুধির মা জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের গাঁয়ে লাউয়ের গাছ নেই বাবা? দু'টো লাউয়ের ডগা এনে দিও না আমায়। দাম যা লাগে দেবো। আমাদের দেশে ওসব কত। এখানে পয়সা দিয়ে জিনিস পাওয়া যায় না।'

বুধির মা-র সঙ্গে কথা বলে বড় ভালো লেগেছিল সিতাবের। ফেরার সময় স্টেশনের চায়ের দোকানে চা খেয়েছিল, চপ খেয়েছিল। আজকের মতো দিনে দু'আনা পয়সা খরচ করতে ভালো লাগে।

সারাদিন যেন একখানা গান গুনগুন করল সিতাবের মনে। সারাদিন যেন একটা সুখের ছবি সে দু'চোখে দেখল।

জ্বালা-যন্ত্রণায় এমন একখানি ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া যেন সে বহুদিন পায়নি। গ্রীষ্মের দুপুরে সতীদীঘির শীতল জলে এইমাত্র ডুব দিয়ে এলো যেন সে।

পাঁচ

ছকু মোড়ল ধান দিচ্ছে। দেখতে দেখতে খবরটা গাঁ-ময় রটে গেলো। ঘরের চালের ওপর থেকেই খবর পেলো সিতাব। বিচালি শেষ হয়ে গেছে। মানুষের পেটকে বোঝানো যায়, কিন্তু গরুর পেটকে বোঝানো যায় না। তাই চালের খড় নামিয়ে নামিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে এখন। একদিন কিছু বেশি করে নামিয়ে দেয় সিতাব। তাই দু' তিন দিন খাওয়ানো হয়। আজ খড় শেষ হতেই চালে উঠেছে। চাল থেকে পুরনো খড় টেনে টেনে নিচে ফেলে দিচ্ছে সে। চাল থেকে দেখতে পেলো —শিবু, তারিণী বস্তা নিয়ে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছে। ওপর থেকেই সে জিজ্ঞেস করল, 'কুথা যেছো শিবুকাকা?'

শিবুর ফুরসৎ নেই। দৌড়তে দৌড়তেই জবাব দিলো —'ছকু মোড়ল ধান দিছে।'

গাঁয়ের মানুষের কাছে এমন সুখবর আর কি আছে? ছকু মোড়ল কখন ধান দেবে, কেউ তা জানে না। কিন্তু বছরে একবার সে তার ভর্তি মরাইগুলো খুলে দেয়। দু'হাতে ধান বিলোয়। গাঁয়ের প্রায় কেউ-ই বাদ যায় না। কম-বেশি সবাইকেই দেয়। তবে যারা ধান-কাটা ধান-রোয়ার সময় তার মুনিষ খাটে, তাদের প্রতি তার বিশেষ বদান্যতা। কিছু বেশি জোটে তাদের ভাগ্যে। অন্যেরা তিন-চার মণ চাইলে পায় দু'মণ, দু'মণ চাইলে পায় দেড় মণ। এখন দাম দিতে হয় না। নতুন ধান উঠলে শোধ দিতে হয়। ধারের দেড়া। তবু এই অসময়ে, মানুষ যখন না খেয়ে মরছে, অকাতরে কে এমন সাহায্য করে?

শিবুর কথা কানে যেতেই, মই বেয়ে চাল থেকে নেমে আসার তর সয় না

সিতাবের। সরাসরি চাল থেকেই লাফ দেয়। লাফ দিয়েই হাঁকে, 'ফুলি, বস্তা দে।'

তারপর সিতাবের সে-এক কাণ্ড। বস্তার খোঁজে রান্নাঘর থেকে গোয়ালঘর ছোটাছুটি। সিতাবের মা এবং ফুল্লরাও খুঁজতে খুঁজতে প্রাণান্ত। ঠিক কাজের সময়েই হাতের কাছে দরকারী জিনিসটি পাওয়া যায় না।

সিতাব গজগজ করে, 'দরকারের জিনিসটা চাইলে কিছুতেই পাওয়া যাবে না।'

সিতাবের মা বলে, 'আমি যে-জিনিসটা যেখানে থুবো—'

কথা শেষ না হতেই ফুল্লরা বস্তা টেনে বার করল কোথেকে। ধুলোয় ভর্তি। সেই ধুলো-ভর্তি বস্তা সিতাব ছোঁ মেরে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ছকু মোড়লের খামারে এসে দেখল, সেখানে লোক ধরে না। সারা গাঁয়ের লোক এসে জড়ো হয়েছে। সিতাবই বোধ হয় এসেছে সকলের শেষে। একটা মরাই খোলা হয়েছে, কয়েকজন ধামায় ধামায় ধান নামিয়ে উঠোনে ঢালছে। আরও দু'টি ভর্তি মরাই অপেক্ষা করছে পাশেই। ছকু মোড়ল একপাশে বসে হুঁকো টানছে।

বেশ একটু পরে সুমাদিস এলো প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। সঙ্গে তার মেয়ে রাধা। হাতে বস্তা। সুমাদিসকে আর চেনা যায় না। সোজা ছকু মোড়লের কাছে গিয়ে বসে পড়ল সে। রাধা দাঁড়াল একপাশে একটু তফাতে।

রাধার বয়েস তেরো-চোদ্দ। সুমাদিসের মেজ মেয়ে। মাথায় বড় হলেও রোগা। এতগুলি পুরুষ মানুষের মধ্যে বড় সঙ্কোচ বোধ করছে সে।

ছকু মোড়ল জিজ্ঞেস করল, 'জ্বর কেমন আছে সুমাদিস ?'

এক কালের বাল্যবন্ধু। অবস্থার ফেরে ছকু এখন ওপরের লোক। সমীহ করে কথা বলতে হয়। কিন্তু কথা বলতে গিয়েই কাসি উঠল। অনেকক্ষণ কেসে কিছুক্ষণ দম নিলো সে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতেই সংক্ষেপে বলল, 'ভালো। আজ সকাল থেকেই জ্বরটা আসেনি।'

ছকু মোড়ল শুধাল, 'কত লিব্যা ?'

'দু'মণ দাও মোড়ল। বড় অভাব।'

'তুমি আর ধান শোধ কৈর্‌তে পারব্যা না সুমাদিস। এস্যাছো যখুন, খালি হাতে ঘুর‍্যাবো না। বোলি কি, দশ সের নি যাও। তুমার অবস্থা খারাপ। তুমাকে আর বেশি দিতে হবে না। সময়ে ওই দশ সেরই দিও।'

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। কথাটা শুনে সিতাবের ভীষণ খারাপ লাগল। মানুষের মুখের ওপর এ রকম বলতে হয়! কিন্তু ছকু মোড়ল হিসেবী লোক। সুমাদিস যদি মারা যায়, দশ সের ধানই লোকসান হবে তার। বেশি নয়। ও-ধানটা লোকসানের খাতাতেই লিখে রাখবে সে। না মরলেও সুমাদিস আর কোনোদিন শক্ত-সমর্থ হয়ে রোজগারপাতি করতে পারবে না। ধান শোধ করবে কি করে ?

সুমাদিস কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'কিছু বেশি দাও মোড়ল। না খেয়ে মারা যাবো।'

এমন সময় গঙ্গাচরণ এলেন লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করে। গঙ্গাচরণ ঘোষ। বুড়ো হয়েছেন। কিন্তু শরীরটা এখনও বেশ মজবুত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। গাঁয়ের ডাক্তার বলতে তিনিই। এক কালে তাঁদের অবস্থা ভালোই ছিল। গাঁয়ের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন ধনী। মান্য করত সবাই। তিন ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের অবস্থা এখন পড়তির দিকে। অবশ্য আর দু'ভাইয়ের অবস্থা এখনও মোটামুটি সচ্ছল। কিন্তু তিনি প্রায় নিঃস্ব। পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতে দিতে প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলেছেন। সর্বশেষ মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন গতবার। তখনও দু'বিঘে জমি বিক্রি করতে হয়েছে। প্রায় সবটাই কিনেছে ছকু মোড়ল। বর্তমানে বিঘে পাঁচেকে ঠেকেছে। সংসার চলে না। ডাক্তারি করেন। কিন্তু ওষুধের পয়সাটাও দেয় না অনেকে। এক সময় দারুণ ভক্তি-শ্রদ্ধা করত সবাই। তাই এখনও চক্ষুলজ্জা। কাউকে মুখের ওপর 'না' বলতে পারেন না। হৃত-সম্মানটুকু বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

গঙ্গাচরণকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে ছকু মোড়ল। হুঁকোটা তাড়াতাড়ি পাশে রেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আসেন খুড়ো, আসেন।'

গঙ্গাচরণ হেসে বলেন, 'তোমার খুব সৌভাগ্য ছকু। সারা গাঁয়ের মানুষের পায়ের ধুলো পড়েছে তোমার ঘরে।'

'আজ্ঞে ঠিকই বুল্যাছেন খুড়ো। ওরে সিধু, একটা মুড়া (মোড়া) দে না বাবা।'

'থাক থাক।' গঙ্গাচরণ কাছে আসতেই তাঁর চোখ পড়ে সুমাদিসের ওপর। জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন আছ হে সুমাদিস? ওষুধে কিছু ফল হচ্ছে?'

সুমাদিস জবাব দেয়, 'আজ্ঞে, আজ সকাল থেকেই জ্বর নাই। কিন্তু বড্ড কাসি। গতরেও বল পেছি না খুড়ো।'

'শুধু ওষুধে কি সারে হে? আসল ওষুধ হচ্ছে পথ্য। খালি পেটে শুধু ওষুধ খেলে কি ফল হবে বলো? একটু দুধ খাওয়ার চেষ্টা করো। কারোর বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তেও যোগাড় করো একটু। নইলে মরবে যে।'

'রোজ রোজ কে দিবে বোলেন? রোজ রোজ চাইতেও নজ্জা করে।'

গঙ্গাচরণ আর ও-প্রসঙ্গ টানলেন না। ছকু মোড়লকে বললেন, 'ছকু বাবা, তোমার কাছে যে দরকারে এলাম!'

ছকু মোড়ল বলল, 'আপনি আবার কষ্ট করে এলেন ক্যানে খুড়ো? ডেকে পাঠালেই হতো।'

ছকু মোড়ল মনে মনে হিসেব করছিল, গঙ্গাচরণের এখনও পাঁচ বিঘে জমি রয়েছে।

গঙ্গাচরণ বললেন, 'তা হয় না হে। ভগবান যখন যাকে যে-আসনে রাখেন, তখন তাকে তার সম্মান দিতে হয়। তোমার ওষুধের দরকার হলে তুমি আমার কাছে যাবে। আমার দরকার তোমার সাহায্যের, আমাকে তোমার কাছে আসতে হবে না ?'

'আপনি যান খুড়ো। আমি আমার লোক দিঞে পাঠিয়ে দিবো। কত দরকার শুধু বুলে যান।'

'বেশি না, বেশি না। মণ তিনেক দিও। ওতেই হবে। কার্তিকের নয়ই দশই নতুন ধান পেয়ে যাবো, কি বলো ? আগাডী ধান দিয়েছি বিঘে খানেক। মন্দ হয়নি। আজই সকালে দেখে এলাম, জিব বার করেছে।'

এরপর সবাই ধানের গল্পে মেতে ওঠে। এবার ধান হয়েছে ভালো। ঝড়-বৃষ্টি না হলে ফলন ভালো হবে।

গঙ্গাচরণ চলে গেলেন লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে। তারপর দাঁড়ি-পাল্লায় ধান ওজন শুরু হলো। যে লোকটা ধান ওজন করছে, ধান-ওজনের সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় উচ্চ, মধ্যম ও খাদে বিচিত্র সুর আনাগোনা করছে, 'রামে রাম —রামে রাম —দুই, দুইয়ে দুই —দুইয়ে দুই —দুইয়ে দুই —তিন, তিনে তিন—'

সিতাব একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ছকু মোড়ল ডাকল ওকে বড আদর করে, 'ও সিতু, এদিকে আয় বাবা। এদিকে আয়।'

সিতাব কাছে এসে দাঁড়াল।

ছকু মোড়ল জিজ্ঞেস করল, 'কত লিবি ?'

সিতাব ভয়ে ভয়ে বলল, 'দু'মণ দাও মোড়ল।'

'বেশ বেশ। তাই নি যা। বেশি দরকার হলেও নি লে। সময়ে মুনিষ টুনিষ দিস, বুঝলি ?'

সুমাদিস চেয়ে চেয়ে দেখছিল সিতাবকে। সবাই চায় ওকে। সিতাবের বড় সুবিধে —শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। শরীর থেকে পয়সা হয়। পরের শরীর নিংড়ে পয়সা করে নিতে জানে ছকু মোড়লেরা।

ছয়

আজ গাঁয়ের লোকজনের আনন্দ। অন্নচিন্তা নেই, ছকু মোড়লের কাছ থেকে ধান পেয়েছে প্রায় সবাই। হাড়ি পাড়ায় গানের আসর বসেছে। আলকাপের গান। তবলা-হারমোনিয়ম-করতালের বাজনায় রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে ঢেউ উঠেছে। আম নিম অশথ গাছে বাঁশঝাড়ে জোনাকিরা ভীষণ চঞ্চল। সন্ধ্যা হতেই যে-পাড়া শান্ত নিথর হয়ে আসে, সেখানে নারী-পুরুষের কলরব।

নিজেদেরই দল। যখন ক্ষেত-খামারের কাজ থাকে না, প্রচণ্ড অবকাশ, তখন

মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার পর তারা তবলা-হারমোনিয়ম-করতাল নিয়ে বসে। মাঝে মাঝে অন্যান্য গাঁয়েও বায়না নিয়ে যায় তারা। হাড়িদের একটা ছেলে শীতল এবং লেটদের একটা ছেলে জগতকারু 'ছোকরা' সাজে। মাথায় মেয়েদের মতো বড় বড় চুল। পরনে শাড়ি সায়া ব্লাউজ। কানে নাকে রোল্ড-গোল্ডের গয়না। মুখে স্নো-পাউডারের প্রচণ্ড প্রলেপ দিয়ে কালো রঙকে ফরসা করার প্রাণান্ত প্রয়াস। যখন তারা আসরে নামে, তখন ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বড়রাও চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করে। অপূর্ব ভঙ্গি করে শ্রোতাদের দিকে নারী-সুলভ কটাক্ষ হেনে তারা গাইতে থাকে—

কালা আমার বাঁশি বাজায়
বসে কদম-ডালে।

চারদিকে বহুলোকের সমাগম। মেয়েদের ভিড়ও কম নয়। কিন্তু এতটুকু শব্দ হয় না কোথাও। কোনো মেয়ের কোলে বাচ্চা ছেলে কেঁদে উঠলে তাকে আঁচল দিয়ে ঢাকে। তাতেও চুপ না করলে সে-মেয়েকে উঠে যেতে হয়। এখানে গোলমাল বারণ। কেউ নিষেধ করে না, তবু অলিখিত আইন।

ছলাকলায় জগতকারু বেশি। নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে মাথার কাপড় ফেলে দেয়। বেণীর ওপর টকটকে লাল ফিতের ফুল দেখায়। বুকের আঁচল খসিয়ে সুডৌল বুক দেখায়। কাঁচুলিতে ঢাকা থাকে দু'টুকরো রবারের বল। পুরুষেরা শিউরে ওঠে। মেয়েরা বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায়। জগতকারু তখন রাজহংসীর মতো গ্রীবা দুলিয়ে দুলিয়ে গাইতে থাকে—

বনের পশু পোষ মানে সই,
মনের মানুষ পোষ মানে কই!

একসঙ্গে দু'টো কলি গায় না। প্রথম কলি গাওয়ার পর পায়ের নূপুর বাজিয়ে খানিকটা নাচে। ঝুম্-ঝুম্-ঝুমুর-ঝুম্। নানা রকম ছলাকলা দেখায়। শ্রোতারা দ্বিতীয় কলি শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় কলি গায় সে।

শীতল-জগতকারু তখন তাদের পরিচিত কেউ না। প্রতিদিন ক্ষেতে-খামারে যাদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে, একসঙ্গে হা-ডু-ডু খেলে, গরু চরায় মাঠে, সেই শীতল-জগতকারু তখন অন্য জগতের মানুষ। এখানে তাদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে অনেকেই লালায়িত। একজনের গান শেষ হলে সে এসে আসরের মধ্যে যার গা-ঘেঁষে বসে, সে-ই ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। ট্যাঁক থেকে বিঁড়ি বার করে বিঁড়ি খাওয়ায়।

সিতাবও কম উৎসাহী নয়। সে দোহারের দলে বসে। যতক্ষণ গান চলে, ততক্ষণ বসে থাকে। কিন্তু তার গলার স্বর খুব মিঠে নয়। সে গান ধরলেই বেসুরো বাজতে থাকে। কারোর সঙ্গে মেলে না। আজন্ম দোহারগিরি করে

এলেও একটা গানের কলিও তার মনে থাকে না, তাই ঠিক তাল রাখতে পারে না সে। তবু কার সাধ্য তাকে দোহারের দল থেকে দূরে রাখে ?

কিন্তু আজ আসর তেমন জমল না। সকাল থেকেই জোর হাওয়া বইছে। সন্ধ্যে থেকে হাওয়ার বেগটা ক্রমশ বেশি। বারবার লণ্ঠন নিভে যায়। শেষে এমন অবস্থা, লণ্ঠন জ্বালানোই দুষ্কর। তাতে বারবার গানের আমেজ নষ্ট হয়। গান বন্ধ হলেই পাঁচ রকম আলোচনা। শেষে আসর ভেঙে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। হঠাৎ অন্ধকারে কে জগতকারুকে জড়িয়ে ধরল। ওদিকে কে একজন শীতলকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে মাটিতে ফেলেছে। তাই নিয়ে মেয়েদের মতো গালাগালি শুরু করেছে ওরা, 'তোদের মাগ্ নাই ঘরে, হারামীরা ? যা না, তোদের মাগের কাছে যা। পরের বৌ-বিটির গায়ে হাত দিছিস !'

মেয়েরা তাই শুনে খিলখিল করে হাসতে হাসতে দুপ্‌দাপ্ করে ছুটে পালায়।

তখন ফুল্লরার কথা মনে পড়ে সিতাবের। অন্ধকারে সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে বাড়ি ফেরে সে। সাপকে বড় ভয় তার। দরজার কাছে এসেই কপাটে লাথি মারে। চিৎকার করে ডাকে, 'ফুলি, কপাট খুল্।'

ফুল্লরা শুয়ে পড়েছিল। খাটুনিটা কম যায়নি আজ। ধানগুলোকে ভাপিয়ে জলে ভেজাতে হয়েছে। কাল সকালে উঠে সিদ্ধ করে শুকোতে হবে। দু'মণ ধানের চালেই এ ক'টা দিন চলে যাবে।

বিছানা থেকে উঠে আসতে একটু দেরি হয়েছে, কপাটে ফের লাথি —'ফুলি —ও ফুলি—'

প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে কপাট খুলল ফুল্লরা। বলল, 'মদ-টদ খেঞে এস্যাছো না-কি ?'

সিতাব উঠোনে পা দিয়ে বলল, 'না গো ফুলুরানী, না। মুখে বই-টই পেছো না-কি গ্যাখো ক্যানে !'

বলেই সিতাব ফুল্লরার মুখে সজোরে চুমু খেলো। ব্যস্ত হয়ে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেলো একটু। বলল, 'তুমার কি হুঁশ নাই একটুকুন ? মা নাই ঘরে ?'

সিতাব ঘরের দিকে পা বাড়াল। ফুল্লরা দরজা বন্ধ করল।

ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়ল সিতাব।

একটু পরেই ফুল্লরা এলো। সিতাব জিজ্ঞেস করল, 'তুই গান শুনতে যাসনি ?'

ফুল্লরা বলল, 'কি করে যাবো ? ধানগুলিনের একটা বিহিত করতে হবে না ?'

'না যেঞে ভালো কর‍্যাছিস। যা হাওয়া দিছে। আলো টিকে না। আসরই জমল না আজ।'

'শেতল-জগতকারু দু'জনেই ছিল ?'

'হ। শেত্‌লাকে নি যা কাণ্ড !'

'কি কাণ্ড ?'

'সে তোর শুনে কাজ নাই।'

ফুল্লরা আদুরে গলায় সিতাবের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বোলো না কি হৈল্ছে ?'

সিতাব কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খানিকটা হেসে নিলো। তারপর বলল, 'আলোটা যেই নিভে যেল্ছে, অমনি কে জাপটে ধর‍্যাছে ওকে।'

'ও মা, শেত্লা তো ব্যাটাছেল্যা !'

'তা কে জানে না ?'

'তাহলে ? উরকম কৈর্‌লে ক্যানে ? তুমি লয় তো আবার ? ফুলি মনে করে—'

'ধ্যেৎ ! গালে এক চড় দিবো।'

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'বিশ্বেস নাই বাপু তুমাকে। ঘরে যা করো—'

'কি করি ?'

'সারাদিন ছোঁকছোঁক করো শুধু। আমি বুঝি না ?'

'করিই তো। একশো বার কৈর্‌বো। লগদ দেড়শো টাকা গুনে দিয়্যাছি। আমার বিয়ে-করা বৌ, যা-খুশি কৈর্‌বো।'

এ সময় ফুল্লরা রাগ করে না। বলে, 'টাকা দিঞে তুমার খুব দেমাক, লয় ?'

'দেমাকই তো। কে এমন পারে শুনি ?'

'আ-হা-হা-হা, এমন আর কেউ পারে না !'

'পারেই না তো। আমার চোখে ধর‍্যাছে, লগদ টাকা গুনে দিঞে ঘাড়ে করে তুলে এন্যাছি।' বলেই ফুল্লরাকে দু'হাতে জড়িয়ে কোলের কাছে টেনে আনে সিতাব। ফুল্লরার ঠোঁটে নিজের তপ্ত ঠোঁট দু'টো গুঁজে দেয়। ফুল্লরাও নিজের দুই ঠোঁটের মধ্যে সিতাবের ঠোঁট দুটোকে আবাহন জানায়। পিচ্ছিল হয়ে ওঠে ভালোবাসার গ্রন্থিগুলো।

এক সময় ফুল্লরার বুক অনাবৃত হয়। অনন্ত সৌন্দর্যের কাছে সিতাব আত্ম-সমর্পণ করে। দু'হাত বাড়িয়ে সিতাবকে জড়িয়ে ধরে ফুল্লরা। অমনি বুকের ডানপাশে আচমকা খোঁচা খেয়ে চমকে ওঠে সিতাব। জিজ্ঞেস করে, 'কিসে লাগল ফুলি ?'

ফুল্লরা বলে, 'কুথা ?'

খোঁজ করতে গিয়েই দেখা গেলো, ফুল্লরার বাঁ-বাহুতে লাল সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলি। এতক্ষণ খেয়াল করেনি সিতাব। জিজ্ঞেস করল, 'কি উটা ?'

ফুল্লরা সলজ্জ হাসি হেসে বলল, 'কিছু লয়।'

'বোল্ না, শুনি।'

'তুমার শুনে কাজ নাই।'

'কাজ নাই ক্যানে ? বোল্, না বুললে ভালো হবে না বুলছি।'

ফুল্লরা জানে, যতক্ষণ সিতাবের কাছে মাদুলি-রহস্য ভেদ না হবে, ততক্ষণ সে

কিছুতেই ছাড়বে না। ভীষণ গোঁয়ারগোবিন্দ তো। অথচ সে-কথা বলতেও লজ্জায় মরে যাচ্ছিল ফুল্লরা। বছর তিনেক হলো তাদের বিয়ে হয়েছে, এখনও ফুল্লরার কোনো সন্তান-সম্ভাবনা দেখা না দেওয়ায় সিতাবের মা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সে কালু মুচির বৌকে আসতে বলেছিল। ওরা দাইয়ের কাজ করে, আবার টোটকা চিকিৎসাও করে থাকে। আজই সন্ধ্যেবেলা কালু মুচির বৌ এসে ফুল্লরার হাতে মাদুলি বেঁধে দিয়ে গেছে।

সব শুনে সিতাব অনেকক্ষণ স্থির অপলক চোখে ফুল্লরার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ফুল্লরা নাড়া দিলো সিতাবকে, 'এই, কি হলো? এসো।'

আজ এই প্রথম সিতাবকে ডাকল ফুল্লরা।

তারপর, সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, ফুল্লরার উর্বর ভূমির কাছাকাছি সিতাবের ভয়ঙ্কর শরীর যখন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই—

কড়-কড়-কড়াৎ—

আকাশটা যেন হঠাৎ ভেঙে পড়ল মাথার ওপর।

'মা-গো!' বলে আচমকা সিতাবকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ফুল্লরা।

সিতাবও কম ভয় পায়নি। সে-ও চমকে উঠেছিল। তার ভয়ঙ্কর শরীর নিমেষে নরম কাদার তালের মতো ফুল্লরার দেহের সঙ্গে মিশে গেলো। ভীত-সন্ত্রস্ত দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়ে রইল বিছানায়। নির্জীব।

কড-কড-কড়াৎ—

আবার মেঘ ডাকল। আবার।

বাইরে তখন ভীষণ দুর্যোগ।

সাত

বাইরে তখন প্রলয় কাণ্ড। চারদিকের অবস্থাটা দেখার জন্যে সিতাব উঠে গিয়ে দরজা খুলল। অমনি দমকা হাওয়ায় আলো নিভে গেলো। ঝড় শুরু হয়েছে। ক্রুদ্ধ বুনো মোষের মতো ফোঁস ফোঁস করছে। সিতাব তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে গেলো। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড বেগ, দরজা বন্ধ করা দুঃসাধ্য। প্রাণপণ শক্তিতে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগাল সে।

সিতাব ফুল্লরা দু'জনেই উদ্বিগ্ন। আধখানা চালে খড় নেই। খড়গুলো এ ক'দিনে গরুর পেটে গেছে। মাথার ওপর যেটুকু আচ্ছাদন এখনও বাকি আছে, সেটুকুও টেকে কি-না সন্দেহ। যেন এক প্রচণ্ড শক্তি চার দেওয়ালের ওপর থেকে গোটা চালটাকেই উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দেওয়ালগুলোর সঙ্গে ঝড়ের এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। চালটাকে নিয়ে দু'পক্ষেরই জোর টানাটানি। তাতে দেওয়াল থেকে চালটা আলগা হয়ে গেলো না ঠিকই, কিন্তু চালের ওপরের

খড়গুলো উড়ে যেতে শুরু করল। দেখতে দেখতে মাথার ওপর ফাঁকা হয়ে গেলো।

সিতাব বলল, 'আখুনো জল পৈড়্‌তে লাগেনি। জল পৈড়্‌লে খড়গুলিন্ উড়ত না।'

ফুল্লরা বলল, 'জল হলে ঘরের ভিতর বসে বসে ভিজতে হবে।'

'মাঠের ধানের সব্বোনাশ। সব ধান পড়ে যাবে। কাত্তিক কলমায় আখুনো চাল গিলেনি।'

'গাজোল (বাদল) লাগলে মোশকিল। ধানগুলিন শুক্যানো যাবে না।'

বৃষ্টি নামতে দেরি হলো না। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। সিতাব আবার উঠে গিয়ে দরজা খুলল। চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা !'

পাশের ঘর থেকে সিতাবের মা সাড়া দিলো, 'জল পৈড়্‌ছে উ-ঘরে ?'

'হ্যাঁ। চাল উড়ে যেল্‌ছে। তুমার ঘরে ?'

'এখ্যানে চলে আয় তুরা।'

সিতাব ফুল্লরা দু'জনে বিছানা গুটিয়ে পাশের ঘরে গেলো। ঘরের এক কোণে চালের ওপর কিছু খড অবশিষ্ট আছে। অন্তত সেখানে বসে বৃষ্টি থেকে গা বাঁচানো যাবে। ও-ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে এলো ফুল্লরা। জলে খানিকটা ভিজল সে। কিন্তু তার কাপড় বদলানোর আগ্রহ নেই।

ঘরের কোণে গুটিসুটি হয়ে বসে রইল তিনজনে।

হাওয়ার বেগ কমে আসতেই বর্ষণ শুরু হলো মুষলধারে।

কারোর মুখেই কোনো কথা নেই। তিনজনেই যেন বোবা।

এতক্ষণে ফুল্লরা হাতের মাদুলিটার দিকে তাকাল। আজ তার অনেক প্রত্যাশা ছিল।

সিতাবের মা বলল, 'শনিতে সাত, মঙ্গলে আট। আজ মঙ্গলবারে গাজোল শুরু হলো, দেখিস, সামনের মঙ্গলবারের আগে ছাডবে না।'

ফুল্লরা আবার মাদুলিটার দিকে তাকাল। এ রকম বৃষ্টি চলতে থাকলে সিতাবকে নিভৃতে পাওয়া যাবে না। এখনও সাতদিন।

হিসেবে কারোর ভুল হয়নি। সামান্য হেরফের মাত্র। বাদলা আটদিন ছিল না, ছিল পাঁচদিন। এই পাঁচদিন ফুল্লরার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়নি সিতাবকে কাছে পাওয়ার। অন্নচিন্তা এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে অন্য ভাবনা-চিন্তা আর মাথায় আসেনি। ভাবনা কি শুধু নিজেদের জন্যে ? গরুটার কথাও ভাবতে হয়েছে। সিতাব ভিজতে ভিজতে দু'দিন পুকুর থেকে দল কেটে এনে দিয়েছে। কিন্তু নিজেদের খাদ্য-সংগ্রহের জন্যে মানুষের কাছে ধরনা দিতে হয়েছিল।

বৃষ্টিতে মাথাল (টোকা) মাথায় দিয়ে নিবারণ বাঁড়ুজ্যের কাছে গিয়েছিল সিতাব। তার বাবার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল নিবারণের। সেই সুবাদে সে

এখনও মাঝে-মধ্যে সাহায্য করে। সিতাবের মা নিজেই পরামর্শ দিয়েছিল তার কাছে যাওয়ার জন্যে। এই অসময়ে সাহায্য করার লোক আর কোথায়?

সিতাব গিয়ে বলেছিল, 'মা বুললে, দশটা টাকা দাও জ্যাঠা। ছকু মোড়লের ধান লিয়্যাছি, গাজোল ছাড়লেই চাল বিচে দিএ্যে দিবো।'

নিবারণ নিতান্তই ভালোমানুষের মতো বলেছিল, 'হাতে এক পয়সাও নাই বাবা। এমন অসময়ে গাজোল লাগল, চাট্টি ধান বিচ্যারও সময় পেল্যাম না। মুনিষের ওপর ক'টা টাকা চেয়্যাছিল হারু, তাই শুধু আছে। বিষ্টি-বাদলার দিন, হয়তো কখন এসে চাইবে।'

'আমাকে দশটা টাকা দাও জ্যাঠা। আমিই না-হয় সময়ে মুনিষ দিবো।'

'কিন্তু তুই তো বাবা আমাকে পরথম দিকে মুনিষ দিবি না। এর-ওর খাটবি। সবার শেষ হলে আমাকে দিবি। দরকারের সময় তখন মুনিষ পাই কুথা বোল্?'

এখন যে-কোনো শর্তই মুখ বুজে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখন যে গলায় বঁড়শি। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই তো থাকে সাম, ছকু মোড়ল, নিবারণ বাঁড়ুজ্যেরা। এবং সময় তাদের হাতে কিছু কিছু সুযোগ তুলে দেয়। কারোর কারোর প্রতি সময় বড সদয়।

শুধু সময়ের অভিশাপ নিয়ে জন্ম নেয় সিতাবেরা। জীবন তাদের কাছে লডাইয়ের মাঠ। বিনা লড়াইয়ে এগোনো সম্ভব নয়, পিছোনোও সম্ভব নয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই।

সিতাব বলল, 'না জ্যাঠা, তুমার দরকারের সময়েই মুনিষ দিবো তুমাকে।'

নিবারণ বলল, 'তা দিতে পারিস তো ভালো। পাঁচবার চাইলে পাবি। এক মাঘে জাড় পালায় না। তবে, ওই হারুর সাথে যা কথা হৈল্ছে, তাই হবে বুঝলি। দেড টাকা করে।'

কোনো উপায় নেই। ধান কাটা ধান রোয়ার সময় মুনিষের মজুরি বাডে। দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা। ওই ক'টা দিনই শুধু ক্ষেতমজুরেরা একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে পায়। অথচ তারও উপায় নেই। সে-সময়ে যে মজুরিই থাক না কেন, সিতাবকে দেড় টাকা মজুরিতে খাটতে হবে।

নিবারণ দশটি টাকা বার করে দেয় ওকে। তাই নিয়ে কপালে ছোঁয়ায় সিতাব। লক্ষ্মী সদয়।

সময়ের হিসেবে মাত্র পাঁচদিন। কিন্তু পাঁচ দিনেই অনেক বাঁশ শুয়ে পড়েছে মাটিতে, অনেক গাছের ডাল ভেঙেছে, অনেক গাছ শেকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে।

শনিবার বিকেলের দিকে যখন হঠাৎ একটু রোদ দেখা দিলো, গাঁয়ের মানুষগুলো জীবনের তপ্ত স্পর্শ অনুভব করল। কিন্তু একটু পরেই পাড়ায় কাদের বাড়ি

থেকে যেন ছেলেমেয়েদের আর্তনাদ শোনা গেলো। সিতাবের মা বলল, 'কাঁদনটা সুমাদিসের ঘরে মনে হছে না বৌ ?'

ফুল্লরা বলল, 'আমারও তাই মনে হছে।'

'বেচারা গেলো তাহলে।'

একটু পরেই সিতাব ফিরে এসে বলল, 'মা, সুমাদিস কাকা মারা গেলো।'

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করল, 'কি হৈল্‌ছিল গো ?'

'কি আবার হবেঁ? ক'দিন থেকে খায়নি, তার ঠিক নাই। তার ওপর গাজোল। বিছান থেকে উঠতেই পারছিল না আর। কখন মৈল্‌ছে, তাই কেউ জানে না। রাধি ডাকতে যেঞে দ্যাখে, রা নাই।'

সিতাবের মা বলল, 'আহ্‌-হা-হা, লোকটা বড় ভালো ছিল রে। সেদিন দেখা হলো নিমতলায়। বুললে, সিতুর মা, আখুন ম'লেই বাঁচি। মেয়ে দু'ট্যার খুব কষ্ট হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিতাবের মা আবার বলল, 'তুরা তো ওকে এই রকম দেখলি, এক সময় উ ইয়া পালোয়ান ছিল। পৈর্তেক বছর কুস্তি লৈড়্‌তে যেত দশরাতে। একবার তো সবাইকে হারিয়ে গামছা আর নারকোল এন্যাছিল।'

সিতাব বলল, 'সেদিন ছকু মোড়লের কাছে ধান চাইতে যেল্‌ছিল। ছকু মোড়ল দশ সেরের বেশি কিছুতেই দিলে না। বুললে, তুমি আর ধান শোধ কৈর্‌তে পারব্যা না সুমাদিস।'

'ওরা বুঝতে পারে রে। কুথাও কিছু ম'লে সিদ্‌নিরা (শকুনেরা) যেমন ট্যার পায়, তেমনি ওরা ট্যার পায়। ওদের মাথায় যক ভর করে থাকে। যক ভর না কৈর্‌লে টাকা-পয়সা হয় না।'

সিতাবের মা সুমাদিসকে শেষ দেখা দেখতে গেলো। সুমাদিসের বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলো, গঙ্গাচরণ লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে সুমাদিসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। সঙ্গে সুমাদিসের ভাই গোপাল। গঙ্গাচরণকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে একপাশে সরে দাঁড়াল সিতাবের মা।

গঙ্গাচরণ হাঁটতে হাঁটতে বলছেন, 'ওষুধে কি হবে, বলো গোপাল ? আসল ওষুধ হচ্ছে পথ্য। আর পথ্যের মধ্যে সেরা পথ্য হচ্ছে দুধ। দুধে আছে সমস্ত রকমের শক্তি। আমি ওকে বললাম, সুমাদিস, শুধু ওষুধে কিছু হবে না, একটু করে দুধ খাও। চেয়ে-চিন্তেও খাও একটু। তা হতভাগা বললে, রোজ রোজ কে দেবে বলেন ? রোজ রোজ চাইতেও লজ্জা করে।'

গঙ্গাচরণ বলে চলেছেন, 'অন্য কিছু তো খেতে বলতে পারিনে। ভাতই জোটে না এক বেলা। কি করে বলি, মাছের ঝোল খাও, মুরগির ঝোল খাও। দুধের মতো সেরা খাদ্য, আগে গাঁ-ঘরে তার দামই ছিল না। যাদের গরু থাকত,

তাদের বাড়ি কেউ একটু দুধ চাইলে বাটি ভরে দিয়ে দিত। সেই দুধ, গাঁয়ে বাস করে তা-ও দু'ফোঁটা খেতে পেলে না হতভাগা।'

গোপাল কথা শুনছিল গঙ্গাচরণের। নীরবে অনুসরণ করছে তাঁকে। গঙ্গাচরণ লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে এগিয়ে চলেছেন।

সিতাবের মা সুমাদিসের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

আট

শ্মশান থেকে ফিরতে ওদের বেশ বেলা হলো।

এদের পক্ষে গঙ্গায় দেওয়া দুঃসাধ্য। যারা একটু সম্পন্ন, তারা তারাপীঠে নিয়ে যায়, এখান থেকে আট-দশ মাইল রাস্তা। অধিকাংশ লোক তা-ও পারে না, রামপুরহাটের শানঘাটায় দাহকার্য সম্পন্ন করে। সুমাদিসের মতো লোককে তারাপীঠে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবাটাই হাস্যকর, শানঘাটাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

তাছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়! বলতে গেলে, শেষ দিকে তো সে সকলের বোঝা হয়ে উঠেছিল। সকলের কাছেই বিড়ম্বনা। মরে গিয়েও হতভাগা কি জ্বালাতে কম কসুর করেছে! পাঁচ দিনের বৃষ্টি-বাদলায় শুক্‌নো কাঠ পাওয়াই দায়। ভেজা কাঠে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন ঢেলে কোনোরকমে তার অপদার্থ দেহটাকে ঝলসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর শ্মশানেই পচাই টানতে বসেছে শ্মশানবন্ধুরা। সিতাব টেনেছিল সবচেয়ে বেশি।

শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরতেও কম ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। সিতাবকে প্রায় সারা রাস্তা টেনে-হিঁচড়ে আনতে হয়েছে। শ্মশানবন্ধুরা যখন বাড়িতে পৌছে দিলো তাকে, তখন তার পা টলছে, চোখ দু'টো জবা ফুলের মতো টকটকে। বকবক করে অনর্গল বকে যাচ্ছে, বকুনি আর থামে না—'শালা সুমাদিস কাকার কি তেজ! বেঁচে থাকতে শালা হামাগুড়ি দিঞে বেড়াত। সুজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা ছিল না। যেই শালাকে চিত্যাব ওপর চড়াল্‌ছি, শালা মেজাজ নি হাত-পা শক্ত করে উঠে দাঁড়াল্‌ছে। সংসারের মায়া কাটাতে পারে না। বাঁশের এক বাড়িতে দিয়্যাছি শালাকে পাথাল করে। সিতুর কাছে বাঁদরামি!'

ওইটুকুই যথেষ্ট। রাতের অন্ধকারে ফুল্লরা দেখল, সুমাদিস কাকা আগুনের ভেতর শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেও ওই একই দৃশ্য। চিৎকার করে জেগে উঠল ফুল্লরা। সিতাবের একটুও হুঁশ নেই! অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে।

পাশের ঘর থেকে সিতাবের মা খোঁজ নিতে এলো, 'কি হলো বৌ? চ্যাঁচাছিস ক্যানে?'

ফুল্লরা বলল, 'এমনি শুধু শুধু। কিছু লয়।'

'সিতু জেগে আছে ?'

'না।'

'গাঁয়ে মানুষ ম'লে গাঁ ভারি হয়ে থাকে। আমার কাছে উঠে আয় না-হয়।'

'না। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো।'

'দরকার হলে আমাকে ডাকিস।'

সিতাবের মা পাশের ঘরে চলে গেলো। কিন্তু ফুল্লরার মনে হতে লাগল, হয়তো যে-কোনো সময় সুমাদিস এ-ঘরে এসে হাজির হবে। হয়তো সিতাবরা যখন ফিরেছে, তখনই ওদের পেছনে পেছনে এসে বাড়ির মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয়ে আতঙ্কে ফুল্লরা আর ঘুমোতে পারল না। একবার মনে হলো, শাশুড়ীর কাছে চলে গেলেই ভালো হতো।

সকালবেলা সেই সব কথা ভেবে নিজেরই হাসি পায় ফুল্লরার। সিতাবকে পর্যন্ত সে-কথা বলতে লজ্জা হলো। তারপর এক সময় মাদুলির কথা মনে পড়ল। মাদুলি হাতে বেঁধেছে আজ সাতদিন। সাতদিনে একবারও সিতাবকে কাছে পায়নি ফুল্লরা। গতরাতে তো সে নিজেই ভয়ে আতঙ্কে বিশ্ব-সংসার ভুলে গিয়েছিল।

ফুল্লরার মন্দ ভাগ্য। নইলে যেদিন ওষুধ বাঁধে, সেদিন থেকেই শুরু হয় বৃষ্টি-বাদলা! তারপর সুমাদিস কাকার মৃত্যু, গতরাতে অহেতুক ভয়। না, আজকের রাত সে কিছুতেই বিফল হতে দেবে না। আজ রাতে সে সিতাবের কাছে অবশ্যই 'ফল' চেয়ে নেবে।

কিন্তু ভাগ্য যার মন্দ, ওষুধে তার কি হবে? সুমাদিস কাকাও তো ঘোষ ডাক্তারের ওষুধ খেত, তবু সে বাঁচল না কেন? আসলে সবই কপালের লিখন।

বিকেলবেলা যখন সংসারের কাজ চুকল, খাওয়া-দাওয়া থালা-বাসন ধোয়া, সব শেষ হলে ফুল্লরা বসল চুল বাঁধতে। দাওয়ার দেওয়ালে আয়নাটা রেখে নিজে নিজে চুল বাঁধল সে। নিজেই চুল বাঁধে। কখনো কখনো শাশুড়ী আদর করে চুল বেঁধে দেয়। কিন্তু পারতপক্ষে সে শাশুড়ীর চুল বাঁধা নিতে চায় না। নিজে নিজেই চুল বেঁধে কপালে নখ-পালিশের টিপ পরল সে। বেশ বড় করে টিপ নিলো। অনেকদিন আগেকার কেনা নখ-পালিশ, বড় হিসেব করে খরচ করে ফুল্লরা।

তারপর কিছুক্ষণ বসে বসে নিজেকে দেখল আয়নায়। সিতাবের চোখ দিয়ে দেখল। হঠাৎ কি মনে হতেই, সিঁথিতে তেল দিয়ে সিঁদুরটা আরও ডগডগে করে নিলো। হাতের আঙুলের নখগুলো নখ-পালিশে রাঙালো। আজকের দিনে হঠাৎ ফুল্লরা বড় বেহিসেবী।

সিতাব খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়েছিল, ফিরল সন্ধ্যের একটু আগে। কাজ নেই, তবু ফুল্লরা দাওয়াটা একবার ঝাঁট দিলো। সিতাব জুতো জোড়া নামিয়ে

ধুলো ঝাড়তে শুরু করল। বছরে বারোমাসই তোলা থাকে, বিশেষ বিশেষ সময়ে, যখন কোথাও একটু সেজে-গুজে বেরোয় সিতাব, তখন জুতো জোড়াটা ব্যবহার করে।

ফুল্লরা এসে কাছে দাঁড়াল। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। আদুরে গলায় বলল, 'হঠাৎ জুত্যা জুড়ার ওপর বাবুর অত সুহাগ ক্যানে?'

সিতাব বেশ ভারিক্কী চালে বলল, 'একবার বের্যাতে হবে। গানের বায়না আছে।'

'কুথা?'

'পত্তাপ্‌পুরে?'

'কবে?'

'আজই। কাল বায়না দিঞে যেল্‌ছে।'

ফুল্লরার মুখ শুকিয়ে গেলো। চোখ দু'টো ছল্‌ছল করে উঠল তার। কোথাও গান হবে, অথচ সেখানে সিতাব থাকবে না, এটা অসম্ভব। ফুল্লরা বুঝতে পারল, সিতাব গানের দলের সঙ্গে যাবেই। দুনিয়ার সবাই যেন তার সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেছে। ফুল্লরা বলল, 'তুমার যেঞে কাজ নাই। পরশু সারা রাত জেগে এস্যাছো শুঁশানে। আবার আজ রাত জাগব্যা?'

ফুল্লরার ছেলেমানুষী যেন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সিতাব হেসে বলল, 'তাই হয় না-কি! আমি না যেলে যাবে কে?'

অথচ সিতাব দোহারের দলে বসে। গানের দল তাকে গুনতির মধ্যে ধরে না। সবই জানে ফুল্লরা। বলল, 'তুমিই গানের দলের মাথা-ছাতা না-কি? তুমি না যেলে গান হবে না?'

সিতাব রেগে গিয়ে বলল, 'বেশি বক্‌বক কৈর‍্বি না। সরে যা এখ্যান থেকে।'

ঝাড়ু দিয়ে জুতো ঝেড়ে নিলো সে। তারপর ধুতির খুঁটে মুছতে শুরু করল। যেখানে ময়লা বসে জমে গেছে, সেখানে থুতু দিলো থুঃ থুঃ করে, তারপর ধুতির খুঁটে ঘষে ঘষে ময়লা তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

ফুল্লরা ক্ষুব্ধ বাঘিনীর মতো সিতাবের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সহজ হওয়ার চেষ্টা করল —'স্বভাব দ্যাখো না! থুঃ থুঃ! জল লিতে পারো না?'

সিতাব ফুল্লরার কথা গ্রাহ্যই করল না।

ফুল্লরা ঘটি নিয়ে গিয়ে সিতাবের সামনে বসল। সিতাবের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো জুতোটা। ঘটি থেকে জল নিয়ে জুতোর ওপর ছিটিয়ে দিলো একটু। তারপর একটা ন্যাকড়া টেনে নিয়ে ঘষতে শুরু করল। বলল, 'সারা বছর তো একবারও মনে পড়ে না! এমন দশা হবে না তো কি হবে?'

সিতাব বলল, 'যখুন নতুন কিন্যাছিল্যাম, তখন মুখ দেখা যেত।'

'একবার রঙ করে লিও। মুচিদেরকে দিলেই রঙ করে দিবে।'

'শালারা পয়সা হাঁকে কত!'

'তা হৈক্। দামী জিনিস। হুট্ করেই তো আর কিন্যা যায় না ইসব।'

'আজ চার বছর হলো। বিয়ের এক বছর আগে কিন্যা। এই জুত্যা পরেই বিয়ে কৈর্‌তে যেল্‌ছিল্যাম।'

'পর্‌থম যেদিন যাও বিয়ের কথা বুল্‌তে, সেদিন তুমার পায়ে জুত্যা ছিল না।'

'ভুলে যেল্‌ছিল্যাম। ওই ভুলেই তো সব মাটি। পায়ে এই চড়োজুত্যা থাকলে তোর বাপের সাধ্যি ছিল না অমন করে হাঁকে।'

'আহ্‌-হা-হা, জুত্যা পায়ে থাকলেই আমার বাপ ভয়ে কাঁপত। বাপ তো কখ্‌নো এমন জুত্যা দ্যাখেনি!'

'এমন জুত্যা বাহির কর না, পাঁচখান গাঁয়ে ক'জুড়া বাহির কৈর্‌তে পারিস দেখি! এমন জুত্যা যার পায়ে থাকে, সে যে-সে লোক লয়, বুঝলি?'

'হৈল্‌ছে বাবা, হৈল্‌ছে। আমরা এমন কালে-কস্মিনে দেখিনি, হলো তো?'

হাতের জুতোটা রেখে অন্যটা তুলে নিলো ফুল্লরা।

জুতোর ওপর ন্যাকড়া ঘষতে ঘষতে সিতাবের চোখে চোখ রেখে পলকহীন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। তারপর ফিক করে হেসে ফেলল।

সিতাব বলল, 'তোর কপালে টিপ মানায় ভালো। রোজ পৈর্‌লে পারিস।'

সলজ্জ হাসি হেসে ফুল্লরা বলল, 'রোজ পৈর্‌লে ভাল্লাগ্‌বে না।'

'তুই ভালো-মন্দর কি বুঝিস?'

'তবে কে বুঝে?'

'আমি বুঝি। তোর কত্তা সিতাব মণ্ডল বুঝে।'

'ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বিশেষ ভঙ্গিতে কটাক্ষ করল সিতাবকে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'আজ যেও না। একদিন না যেলে কি হয়?'

সিতাব ফের গম্ভীর হয়ে বলল, 'না যেলে কি হয়! তুই কি জানিস?'

'না। আজ তুমি যেতে পাবা না। কথা শুনো।'

এই জন্যেই হাত থেকে জুতো কেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসা ফুল্লরার! যত অনর্থের মূল! সিতাব বুঝতে পারে। ছোঁ মেরে জুতো কেড়ে নেয় ফুল্লরার হাত থেকে। বলে, 'ছাড় আমার জুত্যা। সরে যা এখ্যান থেকে। পালা বুলছি।'

ফুল্লরা বিমূঢ় হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কাল আমি সারা রাত ঘুমাইনি, জানো? ভয়ে-ডরে দু'চোখের পাতা এক কৈর্‌তে পারিনি।'

'ক্যানে, বাঘ-ভালুক ছিল?'

'কত খারাপ খারাপ স্বপুন দেখ্যাছি। মা এসে দু'বার খোঁজ নি যেল্‌ছে। গাঁ ভারি হঞে আছে না দু'দিন থেকে? আমি বাপু, একলা এই বাড়িতে থাকতে পারব না।'

'বেশ তো, মা-র কাছে থাকিস।'

'না, তুমি আজ যেতে পাবা না। তুমি যেলে আজ আমি অনথ কাণ্ড বাঁধাব বুলছি।' বলেই সেখান থেকে উঠে দুম দুম করে পা ফেলে চলে গেলো ফুল্লরা।

সন্ধ্যের পরই খেতে চাইল সিতাব। বলল, 'খেতে দে ফুলি।'

ফুল্লরা সাড়া দিলো না। আবার বলল সিতাব। ফুল্লরা তবু সাড়া দিলো না।

রাগে ছুটে গেলো সিতাব ঘরের মধ্যে। ফুল্লরা উপুড় হয়ে মাদুরে শুয়ে আছে। চুলের মুঠি ধরে তুলে বসাল ওকে। বলল, 'কি হৈল্ছে তোর? খুব বাড বেড়্যাছিস লয়? জুয়াব দে —জুয়াব দে—'

ফুল্লরা নিরুত্তর। বিস্মিত-বোবা চোখ মেলে চেয়ে রইল সিতাবের দিকে।

'মুখে রা নাই ক্যানে? হারামজাদী—!' ঠাস ঠাস করে গালে চড় মারল সিতাব।

ফুল্লরা কাঁদল না। শুধু টপ্‌টপ্‌ করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সিতাব তখনও তার চুল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলছে, 'জুয়াব দে কথার। জুয়াব দে।'

মা তখন পাড়া বেড়িয়ে ফিরে এসেছে। ছুটে গেলো ঘরে। বলল, 'ছাড় সিতু। ছেড়ে দে। কি হৈল্ছে?'

সিতাব ছেড়ে দিলো। কোনো কথা বলল না।

জুতো পায়ে দিয়ে গায়ে জামাটা পরে নিয়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। যাওয়ার আগে শুধু মা-কে বলল, 'পত্তাপ্‌পুর যেছি। রেতে ফিরব না।'

সযত্নে বাঁধা চুল এলোমেলো হয়ে গেছে ফুল্লরার। সযত্নে আঁকা টিপ, চোখের জল মুছতে গিয়ে সারা কপাল একাকার হয়ে গেছে। হাতের মাদুলিটা সে একটানে ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। একটু বেশি রাতে যখন শাশুড়ী ভাত খাওয়ার জন্যে ডাকল, ফুল্লরা কোনো উত্তর দিলো না।

নয়

কিন্তু ফুল্লরাকে 'অনথ' কাণ্ড বাধাতে হলো না, 'অনথ' কাণ্ড বাধিয়ে বসল সিতাব নিজেই। প্রতাপপুরে গান সেরে ওদের ফিরতে বেলা হলো। সাদিনপুর স্টেশনের ভেতর দিয়েই রাস্তা। সিতাবকে দেখেই টিকিটবাবুর ছোট খোকা বাবলু লাফাতে লাফাতে এসে তার হাত ধরল —'সিতুদা —সিতুদা—'

সিতাব জিজ্ঞেস করল, 'মা কেমন আছে?'

'ভালো। আমাদের বাড়ি এসো না সিতুদা!'

'আজ লয়। আরেক দিন যাবো।'

কিন্তু বাবলু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। কোয়ার্টারের কাছাকাছি আসতেই চিৎকার শুরু করল, 'মা, এই ছাখো, সিতুদা বাড়ি আসতে চায় না।'

ঘর থেকে বেরোলো মেজ মেয়ে লখী। বলল, 'মা ডাকছে সিতুদা। এসো।'

সিতাবকে যেতেই হলো। সম্পর্কটা একটু নিবিড় হয়েছে। নিবিড় করে নিয়েছেন ও পক্ষই। বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকতে গেলে স্থানীয় লোকজনের মাঝে মাঝে দরকার পড়ে বৈ-কি! সেই প্রথম দিন পরিচয় হওয়ার পর বুধির মা তারকেশ্বরী মাঝে মাঝে এটা-ওটা ফরমাশ করেছেন ওকে —কখনও লাউয়ের ডগা, কখনও ভালো চাল কিংবা মাছ। সিতাব এনে দেয়। এনে দিতে পারলে খুশি হয়। কতবারই এটা-ওটা এনে দিয়েছে সে।

সিতাব কোয়ার্টারের কাছে এসে পৌঁছতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ভবতোষ-বাবু। এখানে স্বনামে পরিচিত নন। সবাই তাঁকে জানে টিকিটবাবু বলে। এখন ডিউটি নেই। পরনে লুঙ্গির ওপর একটা গেঞ্জী। বললেন, 'সিতাব এসেছ? অনেক দিন দেখি না যে?'

সিতাব আকর্ণ হাসি হেসে বলল, 'আজ্ঞে, ক'দিন জলের লেগে আসতে পারিনি।'

'কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?'

'গানের দল নি যেল্‌ছিল্যাম। পত্তাপ্‌পুর।'

'ও, তোমাদের গানের দলও আছে? তুমি নিজেও গান গাও না-কি?'

গান জানাটা প্রশংসার। কিন্তু কে জানে কেন, সিতাবের স্বীকার করতে লজ্জা হলো। বলল, 'আজ্ঞে না, আমি শুধু দলে থাকি।'

'বেশ বেশ। একদিন আমাদের শুনিয়ে যেও, কেমন? বসো। ওপরে গিয়ে বসো।'

ভেতর থেকে বুধির মা বললেন, 'একটু বসো বাবা। এখুনি যাচ্ছি।'

সিতাব বারান্দায় উঠে বসল। ভবতোষবাবু সামনের মাঠ দিয়ে চলে গেলেন। হয়তো খোলা হাওয়ায় একটু পায়চারি করতে চান।

একটু পরেই বুধি বেরোলো। পরনে সাদা ফ্রক। পায়ে জুতো মোজা। বগলে একগাদা বই। হেসে বলল, 'আমরা ভাবি, সিতুদা ভুলে গেছে।'

সিতাব বলল, 'না দিদিমণি, ভুলিনি। জলের লেগে আসতে পারিনি ক'দিন।'

'তাই বলো। আচ্ছা সিতুদা, আমায় একটা শালিকের ছানা এনে দেবে?'

'কি হবে?'

'পুষব। আমার সঙ্গে একটা মেয়ে পড়ে, ওর একটা শালিক আছে, জানো! কি চমৎকার কথা বলে!'

এমন সময় ভেতর থেকে তারকেশ্বরী আঁচলে ভেজা-হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এখনো দাঁড়িয়ে আছিস তুই? গাড়ির টাইম হয়ে গেছে না?'

বুধি বলল, 'এখান থেকে এক ছুটে গিয়ে গাড়ি ধরতে পারি। আসুক না।'

কিন্তু বুধির কথা শেষ হতে না হতেই গাড়ির হুইস্‌ল্ শোনা গেলো।

আউট্ সিগ্‌ন্যালের কাছে গাড়ি। বুধি বইগুলো বুকে চেপে ধরে এক দৌড় দিলো স্টেশনের দিকে।

তারকেশ্বরী গজগজ করতে লাগলেন, 'মেয়ের এই কাণ্ড! আমার হয়েছে জ্বালা। গাড়িতেই কবে কাটা পড়বে ও। এমন আজব স্টেশন বাবা, প্লাটফর্মটাও একটু উঁচু নয়। হাতল ধরে ঝুল খাটতে খাটতে গাড়িতে চড়তে হয়। আবার এদিকে গাড়ি দাঁড়ায় এক মিনিট।'

সিতাব বলল, 'বাবু একটুকুন বেশি গাড়ি দাঁড় করায় না ক্যানে?'

তারকেশ্বরী হাসলেন। বললেন, 'তোমারও যেমন বুদ্ধি! বাবুর কি সেই ক্ষমতা আছে? কি হবে না হবে, সব হুকুম আসে ওপর থেকে। যাক গে, সেদিন তুমি সেই যে মিহি চালটা এনে দিয়েছিলে, তোমার কাকাবাবুর ভারি পছন্দ। বলেছেন, সিতুকে বোলো আর কিছু এনে দেবে। পাওয়া যাবে তো?'

সিতাব বলল, 'যেঞে দেখব। পেলে এনে দিবো।'

তারকেশ্বরী টাকা এনে দিয়ে বললেন, 'পুজোর দিন এখানে এসো, কেমন!'

সিতাব টাকা গুনে নিলো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার শুধু মনে হতে লাগল, কেমন একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন বুধির মা। 'টিকিটবাবু' সম্বন্ধে বললেন 'তোমার কাকাবাবু'। কিন্তু তারকেশ্বরীকে 'কাকীমা' বলে সম্বোধন করতে কেমন লজ্জা লাগে সিতাবের।

পুজোর আর ক'দিন বাকি? মনে মনে হিসেব করল সিতাব। আজ মঙ্গলবার। কাল বুধবার মহালয়া। সামনের সপ্তায় লক্ষ্মীবার সপ্তমী। মা আসবেন। তারপর অষ্টমী, নবমী, দশমী। দশমী রোববার।

গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই চোখ দু'টো কেমন জ্বালা করতে লাগে সিতাবের। গা-মাথা ঝিমঝিম করছে। রাত-জাগার জন্যে কি? ফুল্লরা নিষেধ করেছিল, শোনেনি। উলটে ফুল্লরাকেই মেরেছে সিতাব। মনটা খারাপ হয়ে যায় তার। বাড়ি গিয়েই ফুল্লরাকে আদর করবে সে। আদর করে কথা বলবে। সহজেই রাগ ভুলে যায় ফুল্লরা।

একটা শালিকের ছানা যোগাড় করে দিতে হবে বুধিকে। অত বড় মেয়ে, এখনও পাখি পোষার শখ। বাবুদের মেয়েদের ওরকম শখ থাকে। গাঁয়ের মেয়ে হলে কতদিন আগে বিয়ে হয়ে যেত। এতদিনে হয়তো ছেলেপিলের মা হতো। আচ্ছা, ফুল্লরার এখনও ছেলেপিলে হয় না কেন? প্রায় তিন বছর তো হলো বিয়ে হওয়া। এখন আবার সে দাইয়ের কাছে ওষুধ নিয়েছে। ফুল্লরা বাঁজা নয় তো?

হঠাৎ সিতাব যেন বুঝতে পারে, কাল ফুল্লরা ওকে গানের দলের সঙ্গে যেতে নিষেধ করেছিল কেন, কেন অমন সাজগোজ করেছিল। সে মনে মনে ঠিক করে, আজ সে ফুল্লরাকে খুব আদর করবে।

সিতাবের চোখ-কান সব যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। ভীষণ শীত করে তার।

গাঁয়ের ভেতর পা দিয়ে তার মনে হয়, সে বাড়ি পর্যন্ত এই সামান্য রাস্তাটুকুও বুঝি আর হেঁটে যেতে পারবে না।

তবু সে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে বাড়ি এসে পৌছল। দাওয়ায় পা দিয়েই বলল, 'ফুলি, একটা চাটাই পেতে দে।'

মাদুরে শুয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলো সিতাব।

'অনত্থ' কাণ্ড আর কাকে বলে! চোখ দু'টো টকটকে লাল হয়ে উঠল সিতাবের। সারা গায়ে যেন আগুন জ্বলছে। কপালে হাত দেওয়া যায় না। বাড়ির সব কাঁথা এনে গায়ে চাপানো হলো। তবু ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে। সিতাবের মা চেপে ধরে রইল ছেলেকে।

জ্বর বলে জ্বর! সারা রাত্রি আবোল-তাবোল বকতে থাকে। সে-সব কথার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। মা বলে, 'বিগ্যাড় (বিকার) লিয়্যাছে। কপালে জলপটি দে বৌ।'

ফুল্লরা জলপটি দিতে থাকে। কপালে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়। আবার নতুন জলপটি দেয় কপালে।

সিতাবের মা বলে, 'ওষুধ আনতে হবে। ঘোষের হেমাপতি দিলে চট্ করে জ্বর ছাড়বে।'

ফুল্লরা বলল, 'কত মানা কৈর্ল্যাম, যেতে হবে না। কে শুনে কার কথা!'

'জানিস তো বৌ, উ ওইরকম। ক্যানে কথা বুলতে যাস?'

'ওষুধ-টষুধ কিচ্ছু দিতে হবে না। যা হবে হৈক্। আমার কপাল পুড়ে পুড়বে।'

'বৌ!' সিতাবের মা চিৎকার করে উঠল।

ফুল্লরা তখন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। ডান-হাতে জলপটি দেয়, বাঁ-হাত দিয়ে আঁচলে চোখের জল মোছে। শাশুড়ী বলে, 'তা কাঁদিস ক্যানে? কাঁদলে জ্বর ছাড়বে? মানুষের জ্বর-জ্বালা হয় না?'

ফুল্লরা কোনো কথা বলে না। নীরবে কাঁদতে থাকে।

সিতাব তখনও বকছে, 'আমার নাম সিতাব মণ্ডল। আমার সাথে ইয়ার্কি? শালা সুমাদিস, চিত্যা থেকে পালাবা? সিতুর সামনে এত বড় আস্পদ্দা! শালার বাঁচার শখ মিটেনি আখুনো। ছকু মোড়লের দশ সের ধান খেয়্যাছিস। ছকু তোর লেগে গোটা তলা (মরাই) বেঁধে থুয়্যাছে না-কি রে শালা? খাবি?'

বকুনির বিরাম নেই। অবশেষে শাশুড়ী-বৌ মিলে মাথায় জল ঢালল এক কলসি। তবেই শান্ত হয়ে ঘুমোলো সিতাব।

সকালবেলা ফুল্লরা সিতাবের কপালে হাত দিতেই সে চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'কে? ফুলি? আহ্—'

তারপর আবার চোখ বুজল সে।

দশ

জ্বর ছাড়ল বিশু পরামাণিকের মিকচার খেয়ে। প্রথমে সিতাবের মা ঘোষ ডাক্তারের কাছেই গিয়েছিল। গঙ্গাচরণ তিন পুরিয়া গুলি-ওযুধ দিয়ে বলেছিলেন, এতেই জ্বর ছেড়ে যাবে। কিন্তু ছাড়েনি। তখন বাধ্য হয়েই গঙ্গাচরণকে ওপাড়া থেকে এপাড়া আসতে হয়েছিল। তিনি এসে প্রথমে নাড়ি দেখলেন সিতাবের। দেখেই বললেন, 'উঃ, প্রচণ্ড জ্বর। কাল থেকেই এ রকম?'

ফুল্লরা মাথার কাছে বসে। সিতাবের মা ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে। বলল, 'কাল পত্তাপ্‌পুর থেকে এসেই শুঞে পড়্যাছে। তখুন থেকেই বেহুঁশ। খালি ভুল্ল বৈক্‌ছে।'

গঙ্গাচরণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, 'আমার তো মনে হয় টাইফাস্‌। দিন চার-পাঁচেক পরেই দেখবে, এই পাঁজরার কাছে গুটি বেরিয়েছে। লাল লাল। ভয়ের কোনো কারণ নেই। এখন ল্যাকেসিস দিচ্ছি কয়েক পান। যদি এতে না সারে, কাল যেও। রাস্‌টাক্স দিয়ে দেবো, জ্বর পালাতে দিশে পাবে না।'

কিন্তু সিতাবের মতো গোঁয়ার-গোবিন্দের জ্বর, সে-ও বুঝি গোঁয়ার-গোবিন্দ। গঙ্গাচরণের ল্যাকেসিসই বলো, আর রাস্‌টাক্সই বলো, সিতাবের অবস্থা একই রকম। সিতাবের মা আর গঙ্গাচরণের ওপর ভরসা রাখতে পারে না। বিশু পরামাণিকের দ্বারস্থ হয়। বিশু পরামাণিকের 'অ্যালোপতি' জ্বরে অব্যর্থ।

পাশের গ্রাম লক্ষ্মীবাটিতে বিশু পরামাণিকের ডাক্তারখানা। 'কল্‌' পেয়ে সে গলায় স্টেথোস্‌কোপ ঝুলিয়ে আসে। সম্প্রতি একটি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড স্টেথোস্‌কোপ কিনেছে সে। বাবা গণপতি ছিলেন কবিরাজ। কবিরাজী চিকিৎসায় এ-অঞ্চলের লোকে তাঁকে ধন্বন্তরি বলে জানত। তিনি যদি কারোর নাড়িতে হাত দিয়ে ওষুধ না দিয়ে উঠে যেতেন, তাহলে সে-রুগীকে জল ছাড়া কোনো ওষুধ দেওয়ার কথা ভাবত না কেউ। যারা তাঁর প্রতি অতটা আস্থাশীল ছিল না, তারা তখন শহরের পাস-করা বড় ডাক্তার নিয়ে আসত। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল পাওয়া যেত কদাচিৎ। সুতরাং গণপতি কবিরাজ মানুষের মনে ক্রমশ একটা গভীর শ্রদ্ধার আসনে বসতে পেরেছিলেন। এ অঞ্চলে তিনি এখন কিংবদন্তী। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে বিশু পরামাণিক বাবার ডাক্তারখানায় বসতে শুরু করে। কিন্তু আজকালকার লোকজন কবিরাজী চিকিৎসায় তত আস্থাশীল নয়। সবাই অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে ছোটে। বিশু বাবার ডাক্তারখানা টিকিয়ে রাখার জন্যে বাড়িতে বসে অ্যালোপ্যাথি-চর্চা শুরু করে। প্রয়োজনে শহরে গিয়ে পাস-করা ডাক্তারের পরামর্শ নেয়। নানারকম বটিকার কাঁচের বয়ামগুলো আড়ালে সরিয়ে ফেলেছে সে। তার বদলে এখন বোতলে বোতলে রঙ-বেরঙের ওযুধ। টেবিলের

ওপর একটা ওযুধ মাপার গেলাস, একটা বড় কাঁচের জারে জল। খলনুড়ি। ভিজিটে যাওয়ার জন্যে বড় লেদার-ব্যাগ। স্টেথোস্কোপ সর্বদা গলায় জড়ানো। রুগীর পাশে বসেই আর আগেকার মতো নাড়ি ধরে না। ব্যাগ খুলে কয়েকটা ওষুধের শিশি বার করে, কয়েকটা ইন্জেকশনের অ্যাম্পুল, ইন্জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ-বক্স, থার্মোমিটার। গম্ভীর মুখে থার্মোমিটার আলোর দিকে ধরে পারদ নিরীক্ষণ করে। কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়ে ঠিক করে নেয়। তারপর সেটা রুগীর মুখে দিয়ে সিরিঞ্জ-বক্স খোলে। জলে পিচকারি দিয়ে দিয়ে সিরিঞ্জ ধুতে থাকে ততক্ষণ। রুগী দর্শক সবাই সভয়-বিস্ময়ে বিশু পরামাণিকের কাণ্ড-কারখানা দেখে।

সেই বিশু পরামাণিক গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে যখন সিতাবকে দেখতে এলো, তখন পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল তার বাড়িতে। বিশু প্রথমে থার্মোমিটারে জ্বর দেখল, স্টেথোস্কোপ কানে লাগিয়ে বুক-পিঠ দেখল অনেকক্ষণ। জিভ দেখল। চোখের পাতা উলটিয়ে চোখ পরীক্ষা করল। সিতাবের পেটে টোকা মেরে মেরে বাজাল খানিকটা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঘোষ মশাই কি বুললেন?'

ফুল্লরা শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাল। সিতাবের মা ঘেমে উঠল। কি যেন নাম বলেছিল অসুখটার? মনে করার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'ঘোষ ডাক্তোর তো খুব কঠিন ব্যারাম বুললে বাবা। টাইফাইট্ না-কি—'

'ঘোড়াড্ডিম।' সিতাবের মা-র কথা শেষ না হতেই বিশু পরামাণিক চিৎকার করে উঠল। বলল, 'এমনি করেই ত্যাশের লোকগুলিনকে মারবে দেখছি। আর, আজকালকার লোকগুলিনও হৈল্ছে বাবা, দু'পয়সা সস্তা পেলে ওষুধের নামে বিষ খাওয়াতেও পেছপা লয়।'

'আবার বুলছিল, চার-পাঁচদিন পরেই পাঁজরায় গুটি বেরয়াবে। লাল লাল।'

'কচু বেরয়াবে।' আবার গর্জন করে উঠল বিশু। বলল, 'বিশু পরামাণিককে তো চিনে না! প্যাঁক প্যাঁক করে দু'ট্যা সুঁই ফুঁড়লেই —হ্যাঁ বাবা, তা ঘোষ মশাইয়ের টাইফাইট্ই হৈক্ আর ডেঙ্গুই হৈক্, একদিনেই পালাতে পথ পাবে না।'

সিতাব চিঁ-চিঁ করে বলল, 'ইন্জিশিন দিও না মামা। তুমার মিকচারেই জ্বর ছেড়ে যাবে।'

বিশু ধমক দিলো, 'তুই ব্যাটা থাম্। জ্বর কিসে ছাড়বে, তা আমি দেখছি।' বিশু পরামাণিক জোরে জোরে সিরিঞ্জ ধুতে থাকে। ছোট ছুঁচটা পালটে একটা বড় ছুঁচ লাগায়। তারপর আবার জলে পিচকারি শুরু করে।

ছুঁচটার দিকে তাকাল সিতাব। গলা শুকিয়ে গেলো। যেন একটা আস্ত গুনছুঁচ। বিশু পরামাণিকের এসব ব্যাপারে মায়া-মমতা নেই। প্যাঁক করে আস্ত ছুঁচটা ভরে দেবে চামড়ার ভেতরে।

সিতাব ফের চিঁ-চিঁ করে বলল, 'ইন্জিশিন দিও না মামা। আজ জ্বর একটুকুন কম। তুমার ওই মিকচারেই দু'দিনে সেরে যাবে।'

বিশু তখন একটা অ্যাম্পুলের শিশিতে আঙুল দিয়ে টোকা মারছে।

সিতাবের মা ভয়ে ভয়ে বলল, 'টাকা-পয়সা হাতে নাই ভাই বিশু। মিকচার দিএেই ছ্যাখো না আগে, যদি ছেড়ে যায়—'

বিশু পরামাণিক এতক্ষণে নিরস্ত হলো। বলল, 'ভালো, তাই দেখা যাক। আমার সাথে এসো, ওষুধ নি আসব্যা। মিকচার খাইয়েই ছ্যাখো একদিন। আর ঝাঁটুকে ডেকে মাথার চাঁদিটা চেঁচে লাও। চন্দন ঘষে লাগাও উখ্যানে।'

ঝাঁটু নাপিতকে ডেকে মাথার তালুর অনেকখানি জায়গার চুল চেঁছে ফেলা হলো। চন্দন ঘষে তার প্রলেপ দেওয়া হলো। বিশু পরামাণিকের নিমের মতো তেতো ওষুধ কষ্ট করে খেতে শুরু করল সিতাব। তবু সেদিন জ্বর ছাড়ল না। পরদিন সকালে আরেক শিশি ওষুধ নিয়ে এলো সিতাবের মা। বলল, 'বিশু আজ বিক্যালে আসবে। এতে জ্বর না ছাড়লে ইন্‌জিশিন দিবে।'

সিতাব তক্ষুনি এক দাগ ওষুধ খেলো। তারপর গায়ের জ্বর না ছাড়লেও আধ ঘণ্টা পরেই উঠে বসল সে। বলল, 'ফুলি, জ্বরটা ছেড়্যাছে মনে হছে।'

ফুল্লরা এসে গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখে বলল, 'না, আখুনো জ্বর লেগে আছে। তবে একটুকুন কম।'

সিতাবের মা দেখে বলল, 'কই, একই রকম মনে হছে।'

সিতাব জানাল, 'আমার তো মনে হছে জ্বর নাই। আজ যদি আর জ্বর না আসে, কাল আমাকে সকাল সকাল দু'টি ভাত রেঁধে দিস ফুলি। নন্তুদের দু'ট্যা কলা চেয়ে এনে ঝোল করে দিস।'

বিকেলে বিশু পরামাণিক এসে থার্মোমিটারে তাপ দেখে বলল, 'আখুনো গায়ে জ্বর আছে। তবে আগের থেকে কম। ইন্‌জেকশনের আর দরকার হবে না।'

তারপর কানে স্টেথোস্‌কোপ লাগিয়ে বলল, 'দেখি, গায়ের চাদরটা নামিয়ে দে সিতু।'

সিতাবের গায়ে একটা পাতলা চাদর ছিল। বুক থেকে সেটা কোমরের নিচে অব্দি নামিয়ে দিলো। সিতাবের এখন খালি গা। ক'দিনেই অস্থিচর্মসার। বুকে স্টেথোস্‌কোপ লাগাতে গিয়েই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বিশু পরামাণিক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিতাবের বুকের দিকে চেয়ে রইল। সেদিকে চেয়ে সিতাবের মা-ও চমকে উঠল। গোলাপী আভা নিয়ে বুকের দু'পাশে পাঁজরায় ছোট ছোট গুটি বেরিয়েছে। গঙ্গাচরণ ঘোষ বলেছিলেন, চার-পাঁচদিনেই গুটি দেখা দেবে।

বিশু পরামাণিক একটা গুটির ওপর আঙুল দিয়ে টিপে দিতেই গুটিটা মিলিয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার লাল আভা নিয়ে ফুটে উঠল সেটা। মাথা নাড়ল বিশু। সিতাবের মা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাই উ-গুলিন? মা-র দয়া?'

বিশু আত্মস্থ হয়ে বলল, 'না না, উসব কিছু লয়। ওযুধের রি-অ্যাকশান। কড়া ওযুধের লেগে গায়ে বের‍্যাল্ছে। ভয়ের কিছু নাই। উসব আপনা থেকেই সেরে যাবে। জর ছাড়লে কিস্‌সু থাকবে না।'

বিশু পরামাণিক স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বুক-পিঠ দেখল। তারপর বলল, 'বুকে দোষ আছে। সাবধানে থাকিস। ঠাণ্ডা লাগালে টাইফাইড্ হঞে যাবে।'

সিতাবের মা বলল, 'কাল দু'টি ভাত খেতে চাইছে যে ভাই?'

'না না, মাথা খারাপ! গায়ে আখুনো জর। ভাত খাবে কি? কাল যদি জর ছেড়ে যায়, পরশু বাদ দিঞে তরশু দিতে পারো। আজ থেকে মাথায় আর চন্দন লাগাবার দরকার নাই।'

বিশু পরামাণিকের কথা মতো পরদিন জর ছাড়ল। কিন্তু সিতাব আর সিতাব রইল না। রোদে পিঠ দিয়ে উঠোনে বসে থাকে উবু হয়ে। আচমকা সিতাবের মা-র মনে হয়, নিমতলায় যেন সুমাদিস বসে আছে।

সিতাব চিঁ-চিঁ করে বলে, 'ফুলি, দু'টি খেতে দে না। বড্ড খিদে।'

ফুল্লরা বলে, 'আমার কি সাধ যায় না বাপু! কিন্তু ডাক্তোরের যে বারণ।'

'তা হৈক্, চাট্টি দে। ডাক্তোর তো আর দেখতে আসছে না?'

ফুল্লরা ইতস্তত করে। তারপর চুপড়িতে করে সামান্য মুড়ি এনে সিতাবের সামনে রাখে।

সিতাব আবার আব্দার ধরে, 'মুড়িতে একটুকুন তেল দে ক্যানে ফুলি। শুধু মুড়ি কি চিব্যানো যায়?'

জরের রুগীকে তেল দেওয়া মুড়ি দিতে নেই। ফুল্লরা বলে, 'তেল নাই এক ফোঁটাও। দোকান থেকে আনব, তবেই রাঁধাবাড়া হবে।'

রোদে পিঠ দিয়ে ব্যাজার মুখে মুড়ি চিবোয় সিতাব।

এগারো

বিজয়া দশমীর পরদিন। বাড়িতে ভালো রান্নাবান্না হচ্ছে। ভবতোষবাবুর স্টেশনে মন টেকে না। মাঝে মাঝে কোয়ার্টারে চলে আসেন। আজ শঙ্করবাবু আসেননি। আসবেন না, সে-কথা গতকাল বলে গেছেন। পদের দিক দিয়ে সহকারী স্টেশন-মাস্টার। সাদিনপুরের মতো ছোট স্টেশনে স্টেশন-মাস্টারের কাজ চালাচ্ছেন। রামপুরহাটে রেলের কোয়ার্টারে থাকেন। সেখান থেকেই যাতায়াত করে ডিউটি করেন।

আজ স্টেশনে ভবতোষ একা। আর আছে কেবিনম্যান শিউপ্রসাদ আর হারুন। দরকার হলে শিউপ্রসাদ টেলিফোনের রিসিভার ধরে। খবর থাকলে ডেকে নিতে বলেছেন ভবতোষবাবু।

সকালে হারুনকে পাঠিয়ে রামপুরহাট থেকে পূজা-স্পেশ্যাল বাজার আনানো

হয়েছে। এইটুকু এইটুকু হলদে রঙের ফুলকপি, নাড়ুর মতো ছোট ছোট পোকা-খাওয়া বাঁধাকপি, সীম, বরবটি, বড বড নৈনিতাল আলু, বড় সাইজের কুলের মতো টোম্যাটো, সাত টাকা সের পচা ইলিশ ইত্যাদি।

ভবতোষবাবু বাজার দেখে খুব খুশি। খুশি তারকেশ্বরীও। বললেন, 'যাই বলো, মাছের দামটা খুব বেশি নিয়েছে।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'নেবে না? আজ কি আর জিনিসের দাম? তবু সকাল সকাল গিয়েছিল বলেই পেয়েছে। দেরি করলে তা-ও পেত না।'

তারকেশ্বরী রান্না করছেন। ভবতোষ লুব্ধ দৃষ্টিতে পাশে বসে। বুধি মা-র এটা-ওটা ফাইফরমাশ খাটছে। অন্য ছেলেমেয়েরা বাইরে খেলাধুলো করছে।

তারকেশ্বরী বললেন, 'ভেবেছিলাম সিতুকে আজ এখানেই খেতে বলব। তা এ ক'দিন একবারও টিকি দেখালে!'

ভবতোষ বললেন, 'তুমিও যেমন! অতগুলো টাকা একসঙ্গে বার করে দিতে আছে?'

'এর আগেও তো দিয়েছি। কি করে জানব এ রকম করবে! কতদিন এটা-ওটা এনে দিয়েছে। টাকা দিয়ে বললাম, পুজোর দিন এসো। কেমন হাসতে হাসতে চলে গেলো। তখন কি জানি, ওর পেটে পেটে এইরকম বুদ্ধি!'

'ওরা ওইরকমই, বুঝলে! নরম নরম স্বরে কথা বলে, বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে, কিন্তু সব্বার পেটে পেটে শয়তানী। এক-একটা ক্ষুদে শয়তান। যেই চান্স পেয়েছে, অমনি তোমায় গয়া-বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। এদেশের ছোটলোক-দের তো তুমি চেনো না।'

'না গো, আমাদের দেশের লোকেরা অতটা নয়। তবে এক-আধটু ওরকম না হলে ছোটলোক কেন হবে! তাই বলে দিনে-দুপুরে বাটপাড়ি!'

'রোসো না। মজা দেখাচ্ছি। টাকা নিয়ে পালাবে কোথায়?'

'কেন, তুমি আবার মামলা-মোকদ্দমা করবে না-কি?'

'না গো না, তার দরকার হবে না। ওই গাঁয়েরই সাম মোড়ল, খুব নামকরা লোক, বিস্তর টাকা-পয়সা। আমাকে খুব খাতির করে। ওকে শুধু এক কথা বললেই না, ব্যাটার গলায় গামছা লাগিয়ে—'

বুধি বলল, 'প্রথমে কেমন এটা-ওটা এনে দিয়ে আলাপ করে নিলে, তারপর টাকা নিয়েই, ব্যস! আমাকে আবার বলেছিল, একটা শালিকের ছানা এনে দেবে।'

ভবতোষ বললেন, 'তাই তো বলি, সাবধানে থাকিস। সংসারে ভালোমানুষ ক'জন আছে?'

শিউপ্রসাদ স্টেশন থেকে চেঁচাচ্ছে —'লথী, বাবুকো বুলাও—'

'এই রে, লোকালের টাইম হয়ে গেছে।' বলেই ভবতোষ মুক্তকচ্ছ হয়ে স্টেশনে ছুটলেন।

বারো

সিতাবকে এখন দেখায় ঠিক শকুনির মতো। মাথার চারপাশে চুল, মধ্যিখানে নেড়া। এখন সেখানে ছোট ছোট চুল গজাচ্ছে। মাগুরে রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মুখখানায় যেন একটুও মাংস নেই, উঁচু উঁচু চোয়াল, ধনেশ পাখির ঠোঁটের মতো নাক। হাঁটাহাঁটি করতে বড় কষ্ট হয়। গায়ে চাদর জড়িয়ে চুপচাপ বসে থাকে দাওয়ায়। ফুল্লরাকে জ্বালাতন করে সারাদিন, 'খেতে দে ফুলি। চাট্টি মুড়ি দে। পাতুদের দু'ট্যা আমড়া এনে রাঁধ্ না। টক দিয়্যা মাছ খাইনি কতদিন। রঘুকে বুলিস, মাছ পেলে দিবে। শুঁটকি দিয়্যা পুঁইশাকের চচ্চড়ি কর না-হয় আজ।'

সারাদিন বসে বসে খাওয়ার জল্পনা। অথচ খেতে পারে না। মুখে স্বাদ নেই। মেজাজটা তো এমনিতেই তিরিক্ষে, জ্বরে ভুগে আরও তিরিক্ষে হয়েছে।

সেদিন দাওয়ায় বসে বসে সারাদিনের খাওয়ার ফর্দ তৈরি করছে সিতাব। ফুল্লরা সকাল সকাল রান্না চড়িয়েছে। ওসমান কচু তুলছিল, তার কাছ থেকে ক'টা এঁঠে চেয়ে এনেছে সিতাবের মা। ফুল্লরা উনুনের কাছে বসে সেগুলো চাকা চাকা করে কাটছে। সিতাব বলল, 'ওতে একটুকুন তেঁতুল দিস ফুলি। খেতে ভালো হবে।'

ফুল্লরা বলল, 'তুমার আখুন টক মানা। ডাক্তোর বারণ কর‍্যাছে।'

'ডাক্তোর তো সবই বারণ কর‍্যাছে। জ্বর থেকে উঠে লোকটা খাবে কি শুনি?'

'টক ছাড়া সবই খাবে।'

'মুখে সোয়াদ (স্বাদ) নাই। খেতে বসে খেতে পারছি না। আর হাতের যা রান্না, কুকুরেও মুখ দ্যায় না।'

রাগে ফুল্লরা মাথা গুঁজে বসে বসে কাজ করে যেতে থাকে। কোনো উত্তর দেয় না।

সিতাব গজগজ করে, 'দুনিয়ার সব লোক শালা নিজের মগজে চৈল্‌বে। তুই খেতে পারিস না-পারিস, তাতে লোকের কি যায় আসে! হাঁড়িতে সিদ্ধ করে মুখের সামনে ধরে দিলে, ব্যস। তুই শালা সিতাব মণ্ডল একটা গরু, খা না গোগ্‌গেরাসে—'

ফুল্লরা বলে, 'যে ভালো রাঁধে, তাকে বোলো না!'

'চুপ করে থাক হারামজাদী। ফের কথা বুললে গালে চড় মারব। দেড়শো টাকার কিন্যা বাঁদী, যা বুলব শুনবি।'

ফুল্লরা বঁটি থেকে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'পারব না আমি তুমার কথা শুনতে। যে পারবে, তাকে বোলো। তুমার মা-কে বোলো, পরিপাটি করে রেঁধে দিবে।'

'তবে রে হারামজাদী!' বলেই লাফ দিয়ে উঠল সিতাব। ভুলে গেলো, এখন হাঁটতে গিয়ে তার পা কাঁপে থরথর করে। এখনই সে যেন ছুটে গিয়ে ফুল্লরার

চুল ধরবে হাতের মুঠোয়। কিন্তু দাওয়া থেকে তাকে আর উঠোনে পা দিতে হলো না। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেলো। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে গেলো সবকিছু। বাঁশের খুঁটিটা চেপে ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করল। সম্বিৎশূন্য দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ফুল্লরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'মা গো, ছুটে এসো। আমার কি হলো গো—'

সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল সিতাবকে। মাথাটা কোলে নিয়ে সিতাবের চিবুক ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, 'ওগো, কি হলো? কথা বুলছ না ক্যানে? কথা বোলো —কথা বোলো। মা, কি হলো ছাখো গো—'

আকুলি-বিকুলি করে কাঁদতে থাকে ফুল্লরা। সিতাবের মা ছুটে এলো পাশের ঘর থেকে। একটা পাখা নিয়ে মাথায় হাওয়া করতে শুরু করল। বলল, 'কাঁদিস না বৌ। দুব্বল শরীল। মাথা ঘুরে যেল্‌ছে বুধ হয়।'

দু'তিন মিনিট পরেই চোখ মেলে তাকাল সিতাব। নিজে থেকেই উঠে বসল। ফুল্লরা জিজ্ঞেস করল, 'আখুন কেমন লাগছে গো? খুব খারাপ লাগছে? ডাক্তোরকে খবর দিবো?'

সিতাব বলল, 'না।'

মা জিজ্ঞেস করল, 'কি হৈল্‌ছিল রে?'

'মাথাটা কিরকম ঘুরে যেল্‌ছিল।'

'একা-একা হাঁটাহাঁটি করিস না বাছা। কুথা পড়ে-টড়ে যাবি।'

সিতাব বাঁশের খুঁটিতেই ঠেস দিয়ে বসল। বোবার মতো বসে রইল চুপচাপ। দু'জনের কাজ একা করে যে সিতাব মণ্ডল, তার এই অবস্থা! কি লজ্জা! কি লজ্জা!

বেচাক্কায় পড়ে হাতি, চামচিকেতে মারে লাথি। হায় রে সিতু, তোকে এখন বৌ-এর মুখ-ঝামটা খেতে হবে, লোকের গঞ্জনা শুনতে হবে!

মনে মনে ফুঁসতে থাকে সিতাব, 'দেখে লিবো। একটুকুন সেরে উঠি, তারপর সব্বাইকে দেখে লিবো। আমার নাম শালা সিতাব মণ্ডল।'

ফুল্লরা ফের ফিরে গেছে উনুনের কাছে। সিতাবের মা দাওয়ার একপাশে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে বসেছে।

ফুল্লরা এক সময় জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আজ চান কৈরব্যা? জল গরম করে দিবো?'

সিতাব কোনো উত্তর দেয় না। মুখ গোঁজ করে বসে থাকে।

সেই দিনই বিকেলের দিকে বুধি এলো। 'সিতুদা —সিতুদা' বলে ডাকতে ডাকতে বাড়িতে ঢুকল। বাবলুর হাত ধরে এসে দাঁড়াল উঠোনের মধ্যিখানে। শকুনির মতো চেহারা সিতাবকে দেখে সে যেন স্তব্ধ। বিস্মিত চোখে সিতাবের দিকে চেয়ে রইল সে।

ফুল্লরা ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে বুধিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যেন এখনই ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা দোলাতে শুরু করবে।

সিতাব বলল, 'এসো দিদিমণি। বাবু পাঠিয়ে দিলে বুঝি?'

সিতাবের মা জিজ্ঞেস করল, 'তুমরা কে গো বাছা?'

সিতাবই উত্তর দিলো, 'সাদিনপুরের টিকিটবাবুর মেয়ে।'

'ও মা। এসো এসো।'

সিতাবের মা তাড়াতাড়ি আপ্যায়ন করে মাদুর বিছিয়ে দিলো উঠোনে। বলল, 'বোসো বাছা, বোসো। তুই তো কিছু বুলিসনি সিতু!'

'বাবু ভালো চাল কিনে নি যেতে বুল্যাছিল মা। টাকাও দিয়্যাছিল। আমার ওই কাপড়ের খুঁটে বাঁধা আছে দ্যাখো। সেই যেদিন পত্তাপ্‌পুরে গান করে এল্যাম, সেই দিন। তা সেদিন এসেই তো জ্বর—'

বুধি বলল, 'তোমার কি হয়েছে সিতুদা? একেবারে চেনা যায় না!'

সিতাবের মা বলল, 'আর বোলো ক্যানে বাছা! পুড়া কপাল। কত জ্বরে ভুগল। ঠাকুরের দয়ায় আর তুমাদের আশুব্বাদে সেরে উঠ্যাছে।'

সিতাবের মা কাছে বসে বসে সিতাবের অসুখের কথা বলতে লাগল। সিতাব বলল, 'আমি তো আখুন যেতে পারব না দিদিমণি। একদম হাঁটতে পারছি না।'

বুধি হাঁ হাঁ করে উঠল, 'না না, তোমায় এখন যেতে হবে না সিতুদা। সেরে উঠলে যেও। পুজোয় যাওনি বলে মা খুব দুঃখ করছিল। তোমার জ্বর হয়েছে, তা তো কেউ জানে না!'

সিতাব বলল, 'তুমরা বোসো। আমি চাল পাওয়া যায় কি-না, দেখে আসি।'

সিতাবের মা বাধা দিলো, 'তুই থাক সিতু। আমি যাই। কুথা পড়ে-টড়ে যাবি।'

কিন্তু সিতাব শুনল না। মা-র সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় বলল, 'একটুকুন বোসো দিদিমণি। আমি এখুনি আসছি।'

বাবলু বুধির কাছ থেকে উঠে গেছে। একটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে গরুটার সঙ্গে খেলা শুরু করেছে। বাবলু কঞ্চি নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে গরুটাকে। গরুটাও শিঙ নেড়ে নেড়ে ঢুসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে বাবলুকে। এই নিয়ে দু'জনেরই মজা।

বুধি সাবধান করে দেয়, 'কাছে যাস নে বাবলু। মারবে।'

কিছুক্ষণ পরে সিতাব ও সিতাবের মা ফিরে এলো। তখন ফুল্লরা ও বুধি পরস্পর বড় অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে। সিতাব বলল, 'দিদিমণি, কাল তুমাদের বাড়িতে চাল দিঞে আসবে। তুমাদের বয়ে নি যেতে হবে না। নিজের লোক দিঞে পাঠিয়ে দিবে বুললে পাল মশাই।'

শালিকের ছানার কথা বলবে ভেবেছিল বুধি, বলা হলো না। তার শুধু মনে হতে লাগল, আহা, লোকটার বড় কষ্ট। বড় কষ্ট।

বুধি বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলো।

কিন্তু তবু বুকের জ্বালা জুড়োয় না কেন ফুল্লরার!

মেয়েরা কি মেয়েদের চোখ দেখে কিছু বোঝে না? বুধির চোখ দেখে কি ফুল্লরা কিছু বুঝতে পারেনি? সিতাবের কষ্ট দেখে তার প্রাণে এত মায়া কেন? খুব বোঝে ফুল্লরা। ঘরে এসেছ সাধু সেজে, চোখ রয়েছে গাঁটরির দিকে!

মনে মনে বলে ফুল্লরা, 'ঠাকুর, সিতাব যেন বুধিকে ভুলে যায়। তোমার শিব-মন্দিরে স'-পাঁচ আনার সিন্নি দেবো। আমার স্বামী-সুখ বজায় রেখো ঠাকুর।'

কিন্তু মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল সারাদিন।

রাত্রে সিতাবের পাশে শুয়ে তার মাথার চুলে বিলি কাটছিল ফুল্লরা। সিতাবের মুখের কাছে মুখ রেখে কথা বলছিল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি উখ্যানে যাও, লয়?'

সিতাব বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কুথা?'

'ওই যে, যে-মেয়েটা এস্যাছিল, ওদের বাড়ি।'

'ও, বুধিদের বাড়ি? হুঁ, যাই তো। ক্যানে?'

'না, কিছু লয়। এমনি শুধাছি।' তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বলল, 'এবার বাপু আমাকে একটা জিনিস দিতে হবে।'

'কি জিনিস?'

'তুমি যা ভালো বুঝো।'

'বোল্ না কি লিবি?'

'আমি কি বুঝি! আমি যা পৈর্‌লে আমার কত্তাকে ভালো লাগবে, তাই।'

সিতাব হেসে উঠল। বলল, 'সেদিন বুল্যাছিল্যাম, তাই বুলছিস?'

সিতাবের মুখটা আঙুলে টিপে দিয়ে ফুল্লরা বলল, 'হুঁ-হুঁ। তুমি খুব ভালো লোক গো, তুমি খুব ভালো লোক। খালি মাঝে মাঝে কথা শুনো না, এই যা দোষ।'

'তোর কথা না শুনলে পাপ হয় ফুলি।'

'হবেই তো। বৌ-র কথা না শুনলে পাপ হবে না?'

'হ, এবার থেকে তোর কথা আর অমান্যি কৈরবো না।'

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

সিতাব ফুল্লরার মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে আর একটু টেনে নিলো। ফুল্লরা চুমু খেলো সিতাবের ঠোঁটে। তারপর সিতাবের গালে গাল ঠেকিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। পরম স্নেহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অঘ্রাণ মাস। মাঝামাঝি সময়। সারা মাঠ জুড়ে ধান কাটা চলছে। সকাল হতে না-হতেই গাঁয়ের লোকেরা এসে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাতে কাস্তে। চলতে গেলে শিশির-ভেজা মাটি পায়ে লেগে লেগে যায়। আলের জবজবে ভেজা ঘাস থেকে ফড়িং লাফ দিয়ে পালায়। লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল ছিটকে পড়ে। দূরে দূরে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা। তখন সূর্য ওঠে। কুয়াশার ছাঁকনি দিয়ে কিছু ঠাণ্ডা রোদ ঝরে পড়ে মাঠে। বেশ কড়া শীত থাকে। লোক-গুলো পরনের কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে হাঁটে। সুতীর মোটা চাদর থাকে খুব কম লোকেরই। অনেকে আবার বুকের কাছে শুধু হাত দু'খানা জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে যায়। কুয়াশা কেটে গেলেই রোদের পাক একটু কড়া হবে। তখন শীত কেটে যাবে।

ধান গাছের গোড়ায় হাত দিতেই হাত ভিজে যায় শিশিরে। ভেজা তুলোর মতো জবজব করে ধানগাছগুলো। হাত কনকন করে ওঠে। কাস্তের পোঁচ পড়ে ধানগাছের গোড়ায়। তবু আনন্দ। কেউ কেউ গান ধরে গলা ছেড়ে—

নতুন ধানে আমার উঠান ভরল বধু হে,
তুমি রইল্যা বাপের ঘরে।
আমার মন যে কেমন করে বধু হে,
আমার মন যে কেমন করে॥

গানের সুর জলের ঢেউয়ের মতো কুয়াশার ভেতর দিয়ে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। স্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়। কুয়াশা কেটে যেতে থাকে আস্তে আস্তে। রোদের রঙ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়। ধানগাছে ঘাসে মাটিতে শিশির শুকোতে থাকে। গানের জবাব দেয় অন্য ক্ষেত থেকে কোনো এক চাষী—

নতুন ধানে ধানী শাড়ি বন্ধু
গলায় সোনার হার
না দিলে এই মুখ দেখাব না
বাপের কিরা্যা আমার, বন্ধু—
বাপের কিরা্যা আমার॥

একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ সাড়া দিয়ে ওঠে —'হেই হো।' উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অনেক মন। অনেক শরীর। কুয়াশার সমস্ত আবরণ ঝেড়ে ফেলে রোদ এসে দাঁড়ায়

সামনাসামনি। শীতের সূর্য তখন অনেকটা ওপরে। ঝকঝকে কাঁসার থালা ঘোরে যেন বনবন করে।

ছকু মোড়ল মুনিষদের পেছনে পেছনে ঘোরে। গায়ে জড়ানো দামী শাল। হাঁটুর ওপর ধুতি। মুনিষেরা ধানের শিষ ছেড়ে গেলে সেটা সযত্নে তুলে কাটা-ধানের সারিতে রাখে সে। গান শুনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, 'হারামজাদাদের মুখে লাগাম নাই। চ্যাংড়ামি ছ্যাখো না!'

মুনিষদের পেছনে পেছনে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ধানের শিষের টুং (টুকরো) কুড়োয়। তাদের প্রত্যেকের বগলে একটা করে ঝুড়ি। শাড়ি-ধুতি-গামছা যে যা পায়, তাই গলায় বেঁধে আসে। কারোর হাঁটুর নিচ অব্দি, কারোর বা গোড়ালি অব্দি সেই কাপড়ে ঢাকা থাকে। পায়ে পায়ে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে টুং খোঁজে। দৈবাৎ একটা গোটা শিষ পেলে আনন্দে উল্লসিত হয়। অন্যদের ডেকে ডেকে দেখায়। মেয়েদের মধ্যে বয়েসে বড় রাধা, সুমাদিসের মেজ মেয়ে। বয়েস তেরো-চোদ্দ। লিকলিকে পাতলা শরীর। কিন্তু চোখ দু'টো বড় উজ্জ্বল। গানের কথা বুঝতে পারে সে। চোখ-মুখ রাঙা হয়ে ওঠে তার। আরো বেশি করে চোখ নামিয়ে শিষ খোঁজার ভান করে।

জগতকারু ধান কাটতে কাটতে পেছন ফিরে রাধার দিকে তাকায়। তারপর শিবুকে বলে, 'কেমন জুয়াব পেল্যা শিবুকাকা! দাও এবার, পালটা জুয়াব দাও, দেখি।'

শিবু হাসে। জিজ্ঞেস করে, 'নিতাইয়ের গলা, লয়?'

সিতাব বলে, 'নিতাই ছাড়া আর কে অমন জুয়াব দিবে?'

জবাব শুনে শিবু খুশি। বলে, 'দিতে পারি একখান। কিন্তু আমাদের মোড়ল যে চ্যাংড়ামি পছন্দ করে না। কি মোড়ল, দিবো একখান?'

ছকু মোড়ল বলে, 'লে লে, কাজ কর। ফাজল্যামি কৈর‍্যতে হবে না।'

হি হি করে হাসে শিবু।

ছকু মোড়ল ওদের কাছে এগিয়ে আসে। বলে, 'সিতু, তুই এবার ভালো কাজ কৈর‍্যতে পারিস না। তাড়াতাড়ি হাত চালা বাবা একটুকুন। জল খাওয়ার বেলা হলো, কি কাজ কৈর‍্যলি এর মধ্যে?'

সিতাব পিছিয়ে পড়েনি। অন্যদের সঙ্গে সমানভাবেই কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু সিতাবের কাছে এটুকু কেউ প্রত্যাশা করে না। সিতাব সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে ধান কাটতে কাটতে, দু'পাশে গেছো ধানের মধ্যে তার কাটা-ধানের সারি পড়বে, লজ্জায় অন্য মুনিষেরা প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুত কাস্তে চালাবে, তবু ক্ষেতের মাঝামাঝি তাদের পৌছতে না পৌছতেই সিতাব ক্ষেতের আর এক মাথায় আলের কাছে পৌছে যাবে। এ রকম একটা প্রতিযোগিতায় কাজ এগোয় বেশি। তাই সিতাবকে নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে। কিন্তু এবার সিতাবের গায়ে সে-শক্তি

নেই, সে-ফুর্তিও নেই তার। শিবু জগতকারু সিতাব —সবাই যেন সমান হয়ে গেছে। কোনো বিশেষত্ব নেই তার। তাই আলাদা কোনো খাতিরও নেই।

সিতাব লজ্জিত হয়। প্রাণপ্রণে দ্রুত কাস্তে চালায়। হয়তো একটু এগিয়ে যায়, কিন্তু অল্পেই হাঁসফাঁস করে ওঠে। বিড়ি ধরানোর অজুহাতে একটু ফুরসৎ খোঁজে সে।

ছকু মোড়ল আবার বলে, 'ওই লে, মিনিটে মিনিটে যদি বিঁড়ি ধরাবি, তবে কাজ কৈর্‌বি কখন ?'

দেখতে দেখতে জল খাওয়ার বেলা হয়। ছকু মোড়লের মাহিন্দার সিধু এক পুঁটলি মুড়ি নিয়ে আসে। সবারই কোঁচড়ে মুড়ি দেয় সে। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা। ছকু মোড়ল বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। বাড়িতে জল-টল খেয়ে আবার মাঠে আসবে সে।

কাটা-ধানের সারিতে বসে বসে মুড়ি চিবোয় সবাই। গায়ে মিষ্টি রোদের তাপ। জগতকারু রাধাকে ডাকে, 'রাধি, শুন। এদিকে আয়। মুড়ি খাবি ?'

রাধা অন্যদিকে চোখ ফেরায়। বলে, 'আমি পান্তা খেঞে এস্যাছি।'

'আয় না। লে, চাট্টি লে।'

রাধা আসে না।

ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে জমির অন্যদিকে চলে যায়। তারপর এক জায়গায় গোল হয়ে বসে কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করতে থাকে।

খেতে খেতে গল্প করে ওরা। শিবু বলে, 'তোর জমিতে এবার ভালো ধান হৈল্‌ছে সিতু। চার বিশ তো যাবেই।'

জগতকারু বলল, 'চার বিশের ওপর যাবে।'

সিতাব বলল, 'জমিতে জোরা (সার) দিতেই শালার মোড়লের কাছে অনেক ধার হঞে যেল্‌ছে।'

চিপতি বলল, 'ধান হৈল্‌ছে এবার পাল খুড়োর বাঁকিতে। অমন ধান উ-চাক্‌লায় নাই। ধানও আছে শালা ভাসামানিক। ঝাড়ে ঝাড়ে ঠেকে যেল্‌ছে।'

গৌরসুন্দর পালের জমির ধানের গল্প হচ্ছে।

সিতাব বলল, 'এবার শালা বুঝতেই গেলো। গৌরদা ধানে ইউরিয়া দিয়্যাছিল, জানিস ? ইমুনিয়া থেকে বেশি তেজী। তোর দশ সের ইমুনিয়াতে যা না হবে, চার সের ইউরিয়াতে তার চে বেশি কাজ হবে। গৌরদা বুলছিল, ইউরিয়াতে পাইল্ (ভেজাল) চলে না।'

'ক্যানে ? পাইল্ চলে না ক্যানে ?'

'ওতে কিছু মিশালেই না, গলে জল হঞে যায় !'

শিবু বলল, 'তাহলে ইউরিয়া দিয়্যাই ভালো। ইমুনিয়াতে তো শালা আদ্ধেক নুন। ধান হবে কি করে ?'

জগতকারু বলল, 'পি-এলে বাবু (গ্রামসেবক) গাঁয়ে এসে নতুন জোরার কথা বুলছিল। ওতে ধান না-কি আরো বেশি হয়। কিসব নাম বুলছিল—ফস্‌পেট, পটাশ—'

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। চিপতি বলে, 'উসব বাবুদের কথা ছাড়। ওদের খেঞে-দেঞে কাজ নাই, গরমেণ্টের টাকা খেঞে ফুট্যানি করে বেড়ায়। লাঙলের মুঠ্যা ধরুক না হাতে, কোদাল ধরুক আমাদের মতুন। সে মুর‍্যাদ্‌ (মুরদ) নাই —ফস্‌পেট, পটাশ! ওদের কথা শুনলে তোর ধানও ফস্‌ করে পটাস্‌ হঞে যাবে।'

আবার একচোট হেসে ওঠে সবাই।

জগতকারু ঘটি নিয়ে কাছের একটা পুকুরে জল খেতে যায়। সিতাব চিপতি শিবু বিড়ি ধরায়।

শিবু ছেলেমেয়েদের বকে, 'এই, তুরা উখ্যানে বোসে বোসে ধান টুংছিস না-কি? ধান টুঙিস না। মোড়ল জানতে পারলে আস্ত থুবে না।'

সিধু গিয়ে তাড়া করতেই ছেলেমেয়েরা ছুটে পালায়। রাধা শুধু দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে। সিধু ওকে কিছু বলতে পারে না। বড় মেয়ে, কিছু বলতে লজ্জা পায়। গাঁয়ের দিকে পা বাড়ায় সে। একটু পরে গাড়ি নিয়ে আসতে হবে। ধান নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

জল খেয়েই ছকু মোড়লের এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু এলো না। ছেলে-মেয়েগুলো এসে আবার টুং কুড়োতে শুরু করে। মাটির ওপর হলুদ শিষের টুকরোগুলো পড়ে থাকে, ঝকঝক করে সোনার মতো। চোখে পড়লেই ছোঁ মেরে তুলে নেয় ওরা। ধান কাটতে কাটতে জগতকারু ডাকে, 'ও রাধি, এদিকে আয়। আমার কাছে। ধানে ঝোড় লেগে আছে এখ্যানে। খুব শিষ ভাঙছে।'

একসঙ্গে সমস্ত ছেলেমেয়ে ছুটে যায় ওর দিকে। কুণ্ঠিত পা ফেলে রাধাও এগিয়ে যায়। জগতকারু অন্য ছেলেমেয়েদের বকে, 'তুরা আবার এক জায়গায় ভিড় কৈরছিস ক্যানে? যা, উদিকে যা।'

জগতকারু সুযোগটুকু শুধু রাধাকে দিতে চায়। আর কাউকে না। ওরা সরে যায়। জগতকারু ধান কাটতে কাটতে কাস্তে দিয়ে এক-আধটা শিষ ছুঁড়ে দেয় রাধার দিকে। বলে, 'এই দ্যাখ্‌, এখ্যানে একটা পড়ে আছে। কাছে আয়।'

এগিয়ে যেতেই হয় কাছে। শিষটা কুড়িয়ে নেয়। রাধা বুঝতে পারে, সব শিষই ভেঙে পড়ছে না। জগতকারু ধানগাছগুলো সোজা করে নেওয়ার ভান করছে কাস্তে দিয়ে, অমনি ধারালো কাস্তেতে শিষ কেটে পড়ছে। তারপর আবার সেটা কাস্তে দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর দিকে।

জগতকারুর মাথায় ঘাড় পর্যন্ত চুল। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। গলাটা সরু। পেছন থেকে দেখলে মেয়ে বলে ভুল হয়। শরীরটা ছিপছিপে। সরু

কোমর, প্রশস্ত বুক, কোমরের নিচে পাছা প্রশস্ত। পা দু'টো হালকা হালকা। কিশোরী মেয়ের লাবণ্য তার সারা শরীরে। বয়স্ক পুরুষরাও পছন্দ করে ওকে। গাঁয়ের প্রায় সবাই জানে সে-কথা। রাধা লজ্জা জড়ানো ভীরু ভীরু চোখ তুলে চেয়ে দেখে জগতকারুকে।

জগতকারু গান ধরে—

ও সখী, আজ যমুনায় জল আনিতে
যাবো না যাবো না—

সিতাব শিবু তারিফ করে। উৎসাহ দেয় জগতকারুকে।

গঙ্গাচরণ লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে জমির মাথায় এসে দাঁড়ান। আলের ওপর। জিজ্ঞেস করেন, 'কে গান গাইছে? জগতকারু না-কি?'

জগতকারুর গান বন্ধ হয়ে যায়। সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'ধান কাটতে লেগ্যাছো না-কি খুড়ো?'

গঙ্গাচরণ বলেন, 'আমি আর কি ধান কাটতে লাগব বাপু! মুনিষ কোথায় গাঁয়ে? সবই তো সাম-ছকু-নিবারণের বাঁধা। আগে থেকে সবাই ধান খেয়ে রেখেছে, টাকা খেয়ে রেখেছে। আমার ধান কাটতে ধর মাঘ মাস। সবার শেষে পুঁতি, সবার শেষে কাটি।'

গঙ্গাচরণের কথা মিথ্যে নয়। দু' পাঁচ বিঘে যাদের জমিজমা, জমির ধানেই যাদের সারা বছরের খরচ জোটে না, তারা অসময়ে মুনিষের ওপর টাকা-পয়সা দিতে পারে না। নিজেরাই তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় চারটি ধানের জন্যে। তাই সময়ে মুনিষ পায় না তারা। সকলের ধান রোয়া হয়ে গেলে তাদের কাজ শুরু হয়, ধান রুইতেই ভাদ্র মাস, তাতে আর ভালো ধান হয় না। ধান কাটার সময়েও একই অবস্থা। সকলের ধান কাটা হয়ে গেলে তাদের ধান কাটা শুরু। পৌষ মাসের শেষ কিংবা মাঘ মাসের প্রথম দিক। তখন রোদের তেজ বাড়ে। ধান-গাছগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে যায়। কাটতে গিয়ে অর্ধেক ধানের শিষ ভেঙে পড়ে। সাবধানে কাটতে হয়। কাজ এগোয় না। চারদিকে লোকসান।

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে এদিকে কুথা যেছো খুড়ো?'

'হারুর মা ধান কাটছে। মুনিষ পাইনি, ও একা যা পারে কাটুক। পেট যে মানতে চায় না সিতু। তোরাও এক-আধদিন মুনিষ দে আমাকে। চাট্টি ধান তুলে দে বাবা। চলছে না যে।'

মাঠে পাকা ধান, অথচ বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। এ-কথা নতুন নয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত যারা, নিজেদের হাতে চাষ করতে পারে না, এটা তাদের নিত্যকার ঘটনা। তার চেয়ে যারা মুনিষ খাটে, তাদের অবস্থা এখন অনেক ভালো। এ-সময় গাঁ-ঘরে চাল সস্তা। মজুরি অল্প-স্বল্প যা পায়, তাতেই দিন চলে। অভাবে-অনটনে যাদের বারো মাস কাটে, বর্তমানের এই অবস্থাকেই তারা সচ্ছলতা বলে মেনে নেয়।

গঙ্গাচরণ বলেন, 'সিতু, সাদিনপুরের টিকিটবাবু তোকে যেতে বলেছে।'

সিতাব বলল, 'কি করে যাই খুড়ো! কাজের সময়।'

'কাল আমি রামপুরহাট থেকে আসছিলাম বাপু। আমাকে চেনে-জানে। বললে, সিতুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো। দরকার আছে।'

'যাবো। আজ হচ্ছে না। কাল সাঁজের দিকে যাবো একবার।'

গঙ্গাচরণ পা বাড়ান মাঠের দিকে। তাঁর লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এমন সময় ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করে ওঠে, 'ওই ত্যাখ, মোড়ল আসছে।'

জগতকারু উঠে দাঁড়িয়ে দেখে, সিধু গরুর গাড়ি আনছে। গাড়ির মাঝখানে বসে আছে ছকু মোড়ল। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের ঝুড়িতে ঝুড়িতে বেশ কিছু ধান। তারা সবাই পালিয়ে যেতে শুরু করে। মোড়ল দেখলে বকবে।

সবচেয়ে বেশি ধান রাধার ঝুড়িতে। ঝুড়ি উপচে ধান পড়ছে। সিতাব বলল, 'রাধি, পালিয়ে যা শীগ্‌গীর। মোড়ল আজ কিছু থুবে না।'

রাধা ভয়ে আড়ষ্ট। চোরের মতো ছুটে পালিয়ে যেতে লজ্জা করে তার।

জগতকারু বলে, 'যা, শীগ্‌গীর পালা।'

চিপতি বলে, 'এই কারু ছোঁড়াটার কুনু হুঁশ নাই। সবাইকে বকুনি খেতে হবে আজ।'

ঝুড়িটা কাঁখে তুলে নিয়ে সবেমাত্র পা বাড়িয়েছে রাধা, গাড়িতে বসে বসেই ছকু মোড়ল হাঁক পাড়ল, 'শিবু, ওদেরকে ধর তো রে। একটাকেও ছাড়বি না। ধর ওদেরকে।'

সিধু বলদ দু'টোর পিঠে পট্‌পট্ করে পাঁচনের বাড়ি মারছে। বলদ দু'টো গাড়ি নিয়ে ছুটে আসছে চার পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে। ছেলেমেয়েগুলো মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হয়ে যাচ্ছে তারা, ছকু মোড়লের নাগালের বাইরে এখন, তবু দৌড়চ্ছে। ছকু মোড়ল হাঁকছে, 'ধর ওদেরকে সিতু। একটাকে ধর—'

রাধা চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, তার পা উঠল না আর। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। জগতকারু হিস্‌হিস্ করে বকছে, 'যা না রাধি। পালিয়ে যা —পালিয়ে যা—'

রাধা যেন কালা-বোবা হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে এলো ছকু মোড়ল। বলল, 'ধৈরতে পারলি না একটাকেও? আমি যে চেঁচাছি তখুন থেকে, একটাকে ধর, একটাকে ধর —তা তোদের কানে গেলো কথাগুলিন? একটুকুন এদিক-ওদিক হওয়ার জো নাই, সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে।' তারপরই হঠাৎ রাধার দিকে চোখ পড়ে তার। চিৎকার করে ওঠে ছকু মোড়ল, 'দেখ্যাছো হারামজাদীর মজা! কত ধান ছিঁড়্যাছে দেখ্যাছো? তুরাও কি চোখ-কান বুজে থাকিস? তোদের কি চোখে পড়ে না?'

শিবু বলে, 'আমরা কি দেখ্যাছি মোড়ল! আমরা তো ধান কাটছি।'

'তা দেখবি ক্যানে? নিজের হলে চোখে পড়ত। সব শালা জুয়্যাচ্চোরের দল। কাউকে বিশ্বেস নাই সংসারে। উদিকে শালা মাগ্-বৌ মিলে ধান চুরি কৈর্ছে ঘরে, এদিকে শালা মাঠে পঙ্গপাল। আমার হৈল্ছে মরণ—'

ধান ওঠার সময় প্রায় প্রতি গেরস্থবাড়িতে বাড়ির মেয়েরা কর্তার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু কিছু ধান সরিয়ে রাখে, সেই ধান গোপনে বিক্রি করে নিজের নিজের আলাদা আলাদা পুঁজি করে। ছকু মোড়ল একটু আগে তাই নিয়ে বাড়িতে ঝগড়া করে এসেছে। আবার এখানে মাঠে এসেই দেখে এইসব কাণ্ড।

ছকু মোড়লের মাথা ঠিক থাকে না। ছুটে যায় সে রাধার কাছে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, 'ক্যানে ধান ছিঁড়্যাছিস বোল্? আস্পদ্দা দ্যাখো মাগীর! তোর বাপের ধান? তোর মরা বাপ লাগিয়ে যেল্ছে?'

রাধা নিরুত্তর। জগতকারুর বুক টিপটিপ করে। হয়তো এখনি সে তার নাম বলে দেবে। বলবে, সে নিজে কিছু করেনি। জগতকারুই তাকে শিষ কেটে কেটে দিয়েছে।

কিন্তু রাধা কোনো কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ছকু মোড়লের মাথা খারাপ হয়ে যায়। বলে, 'এক চড় দিবো গালে। হারামজাদী ঢেম্নি কুথাকার! থো ঝুড়ি এখ্যানে —থো বুলছি—'

একটানে রাধার হাত থেকে ঝুড়ি কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছকু মোড়ল। শিষগুলো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে ঝুড়ি থেকে। তবু তার রাগ পড়ে না। পায়ে করে শিষগুলো লাথি মেরে মেরে আরও ছড়িয়ে দিতে থাকে। ভুলে যায়, লক্ষ্মীতে পা ছোঁয়াতে নেই। চিৎকার করতে থাকে, 'ধান লিবি? লে ধান— লে ধান —বাপের ধান পেয়্যাছিস—'

সিতাব শিবু চিপতি জগতকারু সবাই বোবা। হতভম্ব।

রাধা কাঁদে না। তার চোখ দিয়ে শুধু দু'টো জলের ধারা অবিরত গড়িয়ে পড়ছে। জগতকারু এসে খালি ঝুড়িটা রাধাকে তুলে দেয়। রূঢ় কণ্ঠে বলে, 'যা। বাড়ি চলে যা।'

রাধা আস্তে আস্তে পা বাড়ায়।

ধান কাটা হয়ে গেলে ধান কপচানো শুরু হয়। খড়ের দিকটা রেখে শুধু শিষের দিকটা কেটে কেটে নেওয়া। তিন মুঠো নিয়ে এক-একটা বিঁড়ে তৈরি হয়। প্রায় এক আড়ি করে ধান হয় এক-একটা বিঁড়েতে। কুড়ি বিঁড়েতে এক বিশ ধান। মানে আড়াই মণ। খড়গুলো এখন মাঠে পড়ে থাকবে। অবসর সময়ে ওগুলো তুলে নিয়ে যাবে। কেউ কেউ ধান কাটা সম্পূর্ণ শেষ হলে মাঠ থেকে খড় তোলে।

ধান কপচানো শেষ হতেই সন্ধ্যে হয়ে গেলো। সারা মাঠ জুড়ে ঈষৎ ঘন

অন্ধকার। মাঠের অনেক মুনিষ বাড়ি চলে গেছে। দু'চারজন যারা কাজ করছে, তাদের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

শিশির পড়ছে। খড়গুলো ইতিমধ্যেই বেশ নরম। আলে ঘাসের ডগায় শিশিরের ফোঁটা। হাঁটতে গেলেই শিশিরে পা ভিজে যায়। বেশ শীত পড়েছে। অন্ধকারে মাঠে এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে। মাঠে যাদের এখনও কাজ পড়ে আছে, তারা খড় জেলে আগুন পোয়াচ্ছে।

গাড়িতে ধানের বিঁড়েগুলো চাপানো হচ্ছে। ছকু মোড়ল দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির কাছেই। শিবু গাড়ির ওপর ধান সাজাচ্ছে। চিপতি বিঁড়েগুলো একটা একটা করে ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, ওপর থেকে সেগুলো লুফে নিচ্ছে শিবু। সিতাব জগতকারু সারা ক্ষেত জুড়ে ছড়ানো বিঁড়েগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে আসছে গাড়ির কাছে।

ছকু মোড়ল বলল, 'ভালো করে দেখিস, বিঁড়্যা পড়ে থাকে না যেন।'

গাড়িতে ধান চাপানো হয়ে গেলে একটা বড় বাঁশ ওপরে দিয়ে গাড়ির সঙ্গে বাঁশটাকে কষে বাঁধা হলো, যাতে ধানগুলো পড়ে না যায়। তারপর গাড়িতে গরু জুতে দেওয়া হলো। জগতকারু জিজ্ঞেস করল, 'আমার কেন্থা (কাস্তে) আছে তুমার কাছে চিপতিদা ?'

চিপতি বলল, 'তোর কেন্থা আমি দেখিনি।'

জগতকারু ক্ষেতের মধ্যে গেলো কাস্তে খুঁজতে। সিতাব জিজ্ঞেস করল, 'পেলি কারু ?'

অন্ধকারে জগতকারু জবাব দিলো, 'না। এখ্যানেই থুল্যাম কুথা !'

অগত্যা সিতাবও গেলো কাস্তে খুঁজতে।

বলদ দু'টো তখন বোঝাই গাড়ি নিয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করছে গাড়িটা। ছকু মোড়ল বলল, 'ওরা পরে আসছে। গাড়ি নি চল শিবু।'

চিপতি শিবু সিধু ছকু মোড়ল গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে। গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ক্রমাগত অন্ধকারে দূরে সরে যায়।

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'কুথা থুলি বুল্‌তো কেন্থাটা ? আঁধারে আখুন আর পাওয়া যাবে না। কাল সকাল না হলে—'

জগতকারু বলল, 'কেন্থা আছে হে সিতুদা। শালা ছকুকে বিগ্যায় কৈর্‌ল্যাম, বুঝল্যা না ?'

'ক্যানে ?'

'এসো না আমার সাথে।'

সিতাব অবাক হয়ে দেখে, আলের আড়ালে দু'বিঁড়ে ধান। জিজ্ঞেস করে, 'ধান চুরি কৈর্‌লি ?'

জগতকারু সে-কথার জবাব না দিয়ে বলে, 'আমার মাথায় তুলে দাও সিতুদা। রাধির লেগে থুয়্যাছি। এক্ষুনি যেঞে দিঞে দিবো।'

সিতাব জগতকারুর মাথায় ধানের বিঁড়ে দু'টো তুলে দেয়।

গাঁয়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে জগতকারু বলে, 'শালা ছকু মেয়েটাকে কেমন বৈক্‌লে, দেখল্যা তো সিতুদা! কেমন গালমন্দ কৈর্‌লে! দু'দিন আগে মেয়েটার বাপ মৈল্‌ছে, শালার একটুকুনও মায়া-দয়া হলো না!'

সিতাব হুঁ-হাঁ কোনো শব্দ করে না। সে যেন অন্ধকারে দেখতে পায়, রাধা নড়ছে না, কাঁদছে না, তার দু'গাল বেয়ে শুধু দু'টি জলের ধারা অবিরত গড়াচ্ছে।

দুই

সাদিনপুর স্টেশনে একজন লোক নেওয়া হবে। পিয়নের চাকরি। হারুন একটা ছেলের খবর নিয়ে এসেছে। চাকরিটা করে দিতে পারলে শো-তিনেক টাকা দেবে। ভবতোষ বলেছেন পাঁচ শো। অবশ্য ওপরে দিয়ে-থুয়ে খুব বেশি একটা হাতে থাকবে না। তবু যেটুকু আসে।

আসলে এই ছোট্ট স্টেশনটায় বদলি হয়ে এসে ভবতোষ সংসার নিয়ে বড় নাজেহাল। এর আগে এত বিব্রত আর কখনও বোধ করেননি। চাকরির প্রথম দিকে দু'চারটে অখ্যাত ছোট স্টেশনে কাজ করতে হয়েছে, তখন বিয়ে-থা হয়নি, মাইনের সামান্য টাকাতেই তুড়ি মেরে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের পর খরচ বেড়েছে, তেমনি বাড়তি দু'চার পয়সা হাতেও এসেছে। মোটামুটি অসুবিধে হয়নি। সাদিনপুরে এসেই তিনি তাঁর চাকরির তুচ্ছতা বুঝতে পারলেন। এখানে মেল ট্রেনগুলো ধরে না। দিনে-রাতে পাঁচ ছ'খানা গাড়ি। যাত্রি-সংখ্যা অতি নগণ্য। বাড়তি রোজগারের পথ প্রায় বন্ধ।

হারুনের প্রস্তাবে একটু আশার আলো দেখতে পান ভবতোষ। ওপরে শো তিনেক টাকা দিয়ে যদি চাকরিটা হয়ে যায়, তাহলে দু'শো টাকা হাতে থাকে। অভাবের সংসারে অনেকটা সুরাহা হয়। ক'দিন আগে পুজো গেলো। ধার-বাকি তো কম হয়নি। এর ধাক্কা সামলাতেই আগামী তিন-চার মাস প্রাণান্ত হবে। ক'দিন পরেই বুধি-লখীর পরীক্ষা। পরীক্ষার আগেই স্কুলের মাইনে, পরীক্ষার ফী, সব মেটাতে হবে। তারপরই তো আবার নতুন বছরে সেসন্‌ চার্জ, বই কেনার ঝামেলা —এসব রয়েছেই।

সমস্যার অন্ত নেই। সংসারের খরচ বাড়ছে, তার ওপর জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে, সে-তুলনায়, বলতে গেলে, মাইনে বাড়ছে না কিছুই। আগে ইউনিয়নের ধার ধারতেন না ভবতোষ, নিজের সংসার আর চাকরি নিয়ে নিরুপদ্রবে দিন কাটাতে চেয়েছিলেন তিনি। ইদানীং কয়েক মাস থেকে

ইউনিয়নে চাঁদা দিচ্ছেন। ইউনিয়নের দাবিগুলো এখন বড় যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় তাঁর কাছে। যে সর্বনাশা অর্থনীতির ফলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, সেই অর্থনীতির নিয়ামক যারা, তারা কর্মচারীদের কথা ভাববে না, তাদের অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না, এ কেমন কথা! এসব কথা আগে তিনি কখনও ঘূণাক্ষরেও চিন্তা করতেন না। তখন ইউনিয়নের লোকগুলোকে তাঁর এক-একটা বোকা পাঁঠা বলে মনে হতো। তাঁরা চাঁদা চাইতে এলে ভবতোষ তাঁদের 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দিতেন না ঠিকই, কিন্তু মিষ্টি কথায় দিব্যি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতেন। সেদিনকার সেই ভবতোষকে আজ তাঁর বড় নির্বোধ বলে মনে হয়। এ-অবস্থায় না পড়লে হয়তো তিনি এমন পরিষ্কারভাবে সবকিছু উপলব্ধি করতে পারতেন না। তিনি তো শুধু চাঁদা দেন, চাঁদা দিয়েই ঘাড় খালাস করেন, কিন্তু যাঁরা কর্তৃপক্ষের অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ঐক্য গড়ে তুলতে দিনরাত প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁদের মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন না তিনি। কিন্তু এত শত চেষ্টা সত্ত্বেও কি অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে? কর্তৃপক্ষ তো সম্পূর্ণ নির্বিকার —কর্মচারীদের দাবি-দাওয়াকে তারা আদৌ আমল দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। এভাবে যে কিছু করা যায়, তাতেও ভবতোষের যথেষ্ট সংশয় আছে।

শঙ্কর বলেন, 'ওসব ইউনিয়ন-টিউনিয়নে গুলি মারুন। সব ক্যারিয়ার তৈরি করার ফন্দি-ফিকির, বুঝলেন না!'

ভবতোষ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, 'ক্যারিয়ার?'

'হ্যাঁ মশাই, ক্যারিয়ার। ফাঁক তালে একটা নেতা-টেতা গোছের হয়ে গেলে মন্দ কি? প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে, ওপরওয়ালাদের কাছেও যথেষ্ট খাতির-সম্মান জোটে!' শঙ্কর বেশ জোর গলায় জানান।

কিন্তু শঙ্করের কথা মেনে নিতে পারেন না ভবতোষ। শঙ্করের পক্ষে ও-কথা বলা স্বাভাবিক, কারণ ভবতোষ জানেন, শঙ্করের বাড়ির অবস্থা ভালোই। শুধু 'ভালো' বললে ভুল বলা হয়, বেশ অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলে শঙ্কর। তাঁর পক্ষে ভবতোষের মতো কর্মচারীদের সমস্যা ঠিক বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

ভবতোষকে তো মাসান্তে সংসারের খরচটুকুর কথা ভাবতে হয়। একটা পুজো-পার্বণ এলে তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়। ছেলেমেয়েদের বইপত্র কেনা, স্কুলের মাইনে, পরীক্ষার ফী, তাদের জামা-কাপড় —এসব নিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয় তাঁকে। অথচ হিসেব করতে গেলে কতটুকুই বা খরচ!

সুতরাং হারুনের প্রস্তাবটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয় ভবতোষকে।

তাই সেদিন তারকেশ্বরী যখন সংসারের একগাদা সমস্যা এনে হাজির করলেন চোখের সামনে, তখন ভবতোষ শুধু সংক্ষেপে বললেন, 'দেখি, কিছু টাকা-পয়সা হাতে আসার কথা আছে, যদি হয়ে যায়—'

তারকেশ্বরী সোৎসাহে স্বামীর মুখের দিকে তাকান।

ভবতোষ বলেন, 'সাদিনপুরে একটা পিয়নের পোস্ট খালি আছে। হারুন একটা ছেলেকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে খুব ধরেছে।'

'পারবে তুমি?'

'এখান থেকে রেকমেণ্ড করলে হয়তো হয়ে যাবে।'

তারকেশ্বরী যেন কি ভাবতে থাকেন। তারপর বলেন, 'সিতুর জন্যে দেখো না, যদি হয়ে যায়। বুধি বলছিল, ছেলেটা খুব গরিব।'

ভবতোষ হেসে বলেন, 'তাহলে টাকার আশা ছাড়তে হবে। ও কি আর টাকা-পয়সা দিতে পারবে?'

'কিছু যদি কমও দেয়। ছেলেটাকে আমার খুব ভালো লাগে বাপু।'

ভবতোষ তখনকার মতো চুপ করে যান। কিন্তু তারপর নিজেই একদিন গঙ্গাচরণকে বলে পাঠান, সিতাব যেন এসে দেখা করে।

গঙ্গাচরণের কাছে খবর পেয়ে তার পরদিন দেখা করতে এলো সিতাব। সন্ধ্যের পর। অন্ধকারে সাদিনপুর স্টেশন একটা ঝোপের মতো দেখায়। প্লাটফর্মে সারি সারি ল্যাম্পপোস্টের ওপর কেরোসিনের বাতি। তাতে চতুষ্পার্শ্ব মৃদু আলোকিত। ফলে স্টেশনের লাল বাড়িটা আরও অন্ধকার।

সিতাব কোয়ার্টারে না গিয়ে সোজা স্টেশনে এলো। ভবতোষ তখন নাইট্ শিফ্টের বুকিং ক্লার্ক রজতবাবুকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বেরোতে যাচ্ছেন। সিতাবকে দেখে বললেন, 'একটা কথা বলার জন্যে ডেকেছিলাম। এসো আমার সঙ্গে।'

সিতাবকে ডেকে নিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন ভবতোষ। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি রেলে চাকরি করবে?'

সিতাবের মুখ দিয়ে হঠাৎ কোনো কথা বেরোলো না। রেলের চাকরি? টিকিটবাবু কি তাকে ঠাট্টা করছেন? ভবতোষের মুখের দিকে তাকাল সে। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। একজন লোকের অস্তিত্ব শুধু অনুমান করা যায়, কাছে একজন দাঁড়িয়ে, কিন্তু তিনি টিকিটবাবু না হয়ে যে-কেউ হতে পারেন।

ভবতোষ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি পড়াশুনো জানো এক-আধটু?'

সিতাব বলল, 'একটুকুন একটুকুন জানি।'

'কদ্দুর পড়েছ?'

'সিক্স পজ্যন্ত।'

'আচ্ছা। এই স্টেশনে একজন লোক দরকার। তুমি যদি করতে চাও—'

সিতাব অবাক। তার মতো সামান্য লেখাপড়া জানা লোক রেলের চাকরি পায়!

ভবতোষ বললেন, 'হারুনের জানাশোনা একজন খুব ধরেছে। তোমার কাকীমা বলছিল, সিতু যদি করতে চায়, করে দাও। কিন্তু চাকরি তো আর

আমাদের হাতে নয়। সে-সব ওপরওয়ালাদের ব্যাপার। খালি হাতে ওরা কিছু করবে না। টাকা দিতে হবে কিছু।'

অন্ধকারে চোখে আরও অন্ধকার দেখে সিতাব। সামনে করবীর ঝাড় থেকে দু'একটা জোনাকি আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে পড়ছে বাইরে। জ্বলছে, আবার নিভে যাচ্ছে। সিতাবের চোখ থেকেও একটা জোনাকি পোকা উড়ে গেলো যেন।

টাকা ? টাকা কোথায় পাবে সিতাব ?

ভবতোষ বললেন, 'তুমি যদি কিছু দিতে পারো, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। রেলের চাকরি। মাইনে মোটামুটি মন্দ না। ভালো কাজ দেখাতে পারলে ওপরে উঠে যেতে পারবে। আর যদি লেখাপড়া একটু চালাতে পারো, প্রাইভেটে পরীক্ষা-টরিক্ষা দিয়ে, রেলেই ভালো চাকরি হয়ে যাবে। তোমার বয়েসও তো এমন কিছু বেশি না, অনেক আশা আছে এখনো।'

অনেক আশা ? সে এখনও অনেক কিছু করতে পারে ? মনের মধ্যে এক অসাধারণ শক্তি অনুভব করে সিতাব। জিজ্ঞেস করে, 'কত টাকা লাগবে কাকাবাবু ?'

টিকিটবাবু সম্পর্কে তারকেশ্বরীই সিতাবকে বলেন, 'তোমার কাকাবাবু।' কিন্তু সে নিজে কখনও সম্বোধন করতে পারেনি। আজ যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কথাটা। হঠাৎ এই অন্ধকারে টিকিটবাবুকে খুবই আপনার লোক বলে মনে হয় তার।

ভবতোষ একটু চিন্তা করে বললেন, 'লাগে তো অনেক। এ রকম চাকরি পেলে তো অনেকে হাজার টাকা দিয়ে দেয় হাতে হাতে। তুমি যদি অন্তত শো পাঁচেক দিতে পারো—'

সিতাব হতাশ গলায় বলে, 'অত টাকা পারব না কাকাবাবু।'

'একটু ধার-কর্জ করে —যদি শো তিন-চারেকও পারো —আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'আমার যে কিছু নাই কাকাবাবু!' একটা হতাশার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো সিতাবের গলায়।

ভবতোষ নীরবে কি যেন চিন্তা করলেন একটু। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখো। এ রকম সুযোগ পাওয়া যায় না। হলে খুব ভালো হতো।'

সিতাব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলো।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে কোয়ার্টারে ফিরলেন ভবতোষও। বারান্দায় ছেলেমেয়েরা হ্যারিকেনের আলোয় পড়াশোনা করছে। বুধির সামনে পরীক্ষা, ও আলাদা একটা হ্যারিকেন নিয়ে বসেছে ভেতরের বারান্দায়। তারকেশ্বরী তখনও রান্নাঘরে। ভবতোষ ঘরে এসে চেয়ারে বসে বললেন, 'আমায় এক কাপ চা দাও তো।'

কিছুক্ষণ পরে তারকেশ্বরী এক কাপ চা এনে ভবতোষকে দিলেন। বললেন,

'আজ এত দেরি করে ফিরলে যে ? মেয়েটার পরীক্ষা, একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে হবে তো !'

ভবতোষ চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। বললেন, 'সিতু এসেছিল।'

'কখন ?'

'এই তো, ওর সঙ্গে কথা বলেই আসছি।'

'কি বললে ?'

'পারবে না। টাকা-পয়সা দিতে পারবে না ও।'

তারকেশ্বরীর মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো।

ভেতরের বারান্দায় বুধির পড়া শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সে হয়তো কান পেতে শুনছে সব কথা।

ভবতোষ বললেন, 'ছেলেটার হলে মন্দ হতো না কিন্তু।'

তারকেশ্বরী বললেন, 'জানাশোনা ছেলে, বেশ কথাবার্তা শোনে। হাতের কাছে থাকলে ভালো হতো। কত কি দরকার হয়। নতুন কে আসবে, কিরকম হবে না হবে।'

'আমিও তো তাই ভাবছিলাম। কিন্তু কিছুই পারবে না বলছে যে !'

তারকেশ্বরী আর কোনো কথা বললেন না। নীরবে রান্নাঘরে ফিরে গেলেন।

ভবতোষ চিন্তান্বিত মুখে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকেন। বুধি আবার পড়তে শুরু করেছে, তার পড়া শোনা যাচ্ছে এ-ঘর থেকে।

তিন

এবার সিতাবের জমিতে বেশ ধান হয়েছে। সকালবেলা মাড়ন নিকাশ করে ধান ভাগ-বাঁটোয়ারা হতে হতে দুপুর। মনিবের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়েও সিতাব পেয়েছে তিন বস্তা ধান। দুপুরবেলা বস্তাগুলো বয়ে বয়ে এনে উঠোনে ফেলল সে। ফুল্লরা এসে হাসিমুখে কাছে দাঁড়াল, 'গেলোবারের চেঞে এবার বেশি পেয়্যাছো, লয় গো ?'

সিতাব বস্তাগুলোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়। বলে, 'ধর, সাড়ে চার বিশের দরেই গেলো। বিঘ্যাতে ন'বিশ। ধার-বাকি ছিল, নাহলে আরো পেত্যাম।'

'কত পেয়্যাছো ?'

'ন'বিশে পাওনা হয় ন'মণ। আট-বারো ভাগ। সব দিঞে-থুঞে পেয়্যাছি সাড়ে চার মণ।'

'এবার বাপু আমাকে একটা কিছু দিতে হবে।'

'তা লিস। মাড়নের ঝামেলা চুকে যাক, তারপর একদিন রামপুরহাট যাবো।'

সিতাবের মা এখন ছকু মোড়লের খামারে। আগ্‌ড়া পাছড়াচ্ছে। যে সব ধান পুষ্ট হয় না, ভেতরে চাল হয় না, সেই সব ধান শুকনো চিমসে আগ্‌ড়ায় পরিণত হয়। ধানে জোরে কুলোর হাওয়া দিলে উড়ে গিয়ে চারদিকে জমা হয় সেগুলো। সেই আগ্‌ড়ার সঙ্গে কিছু ধানও চলে যায়। মেয়েরা কুলোয় পাছড়ে আগ্‌ড়া থেকে ধান বার করে। ধান মাড়াইয়ের সময় আগ্‌ড়া পাছড়ানো গাঁয়ের মেয়েদের একটা প্রধান কাজ। নাওয়া-খাওয়া বাদে সারাদিন ওই নিয়েই ব্যস্ত থাকে তারা।

সিতাবের সারা গায়ে ধুলো। ধুলোতে মাথার চুল প্রায় সাদা। বলল, 'নাঃ, আগে চান করে আসি। সারা গা স্থংস্থং (চিড়বিড়) কৈর্‌ছে। চান করে এসে বস্তাগুলিন ঘরে ভরে দিবো।'

গাঁয়ের বাইরে পুকুর। ঘন কালো জল। শালুকপাতা-পদ্মপাতায় জল দেখা যায় না। শুধু ঘাটের কাছে, যেখানে লোকজন চান করে, সেখানকার জল কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার। বেশ কিছু দূরে দূরে শালুক ফুল পদ্ম ফুল ফুটে থাকে। মোজেইক-করা সবুজ মেঝেতে যেন লাল-সাদা রঙে আঁকা ছবি। একটা পায়ে-হাঁটা সরু পথ পুকুরের পাড় থেকে হাঠাৎ লাফ দিয়ে ধান-ক্ষেত ডিঙিয়ে চলে গেছে। সেই পথ ধরে ভোলাদাস গোঁসাই আসছে। সাদিনপুরের কাছেই, একটা মাঠ পেরিয়ে লক্ষীবাটি। সেখানে ওর আখড়া। ছোট্ট কুঁড়েঘর, এক চিলতে উঠোন, ঝোপঝাড়-জঙ্গলে ভর্তি। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তার ঘর-সংসার।

আখড়ায় খুব কম থাকে ভোলাদাস। রাজ্যে যত মেলা, সব মেলায় তার যাওয়া চাই। সঙ্গে নিয়ে যায় মেয়েকে।

ঘাটে নামে না সিতাব। অপেক্ষা করতে থাকে।

ভোলাদাসের গাল-ভরা দাড়ি। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল। কপালে তিলক। হাতে গাবগুবো। এক মনে পথ চলতেও মাঝে মাঝে আনমনে গাবগুবোর তারে আঙুল ছুঁয়ে যায়। তার যাত্রাপথ জুড়ে যেন এক আবহ-সঙ্গীত। গুনগুন করতে করতে কাছে আসে ভোলাদাস।

সিতাব বলল, 'অনেকদিন দেখা পাইনি গোঁসাইবাবা। কুথা যেল্‌ছিল্যা ?'

একমুখ দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে দাঁতগুলো ঝকঝক করে ওঠে গোঁসাইয়ের। চোখে-মুখে হাসি উপচে পড়ে। বলে, 'ছিল্যাম না বাবাজী। বোলপুরের পৌষ-মেলা কৈর্‌তে যেল্‌ছিল্যাম। তারপর উদিকেই ঘুরল্যাম ই ক-টা দিন। ভালো আছিস তো ?'

'হ্যাঁ গোঁসাইবাবা।'

'গা-মাথা যে ধুল্যায় ভর্তি রে ! কি কৈর্‌ছিলি ?'

'মাড়ন নিক্যাশ করে এল্যাম। তুমি চলো, আমি চান করে যেছি।'

সিতাব আর দেরি করে না। ছুটে গিয়ে ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

চান সেরে ফিরতে গিয়ে দেখে, ইতিমধ্যেই ভোলাদাসের গাবগুবোতে আসর জমে উঠেছে। পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে নিমতলায়। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিতাবের আর বাড়ি যাওয়া হয় না। ভেজা কাপড়েই একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ভিড়ের মধ্যে। হ্যাঁ, ওই তো, মেয়েদের জটলার মধ্যে ফুল্লরা দাঁড়িয়ে। গাবগুবোর আওয়াজ শুনে ও কি আর ঘরে থাকতে পারে! জগতকারুও এসেছে। তার চোখ রাধার দিকে। রাধা দাঁড়িয়ে আছে তার ছোট বোন গৌরীর কাঁধে হাত রেখে।

ভোলাদাস গাবগুবোর তারে আঙুল ছোঁয়ায়। গুব্-গুব্ —গুব্-গুব্— গুব্-গুবা-গুব্ —গুব্-গুবা-গুব্—

সবারই চোখ ভোলাদাসের দিকে। ভোলাদাস চোখ বুজে গাবগুবোতে বোল তোলে —গুব্-গুবা-গুব্ —গুব্-গুবা-গুব্—

তারপর এক সময় গান ধরে ভোলাদাস—

আমার মন হারাল মনের মধ্যে
খুঁজে পেলাম না—
আমার মনের সোনা আপনজনার
নাগাল পেলাম না।

মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায় ভোলাদাস। সেই রকম ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একবার নগরের মেলায় খোঁজ পেয়েছিল এক পরমাত্মীয়ের। সে কামিনী বোষ্টমী। একসূত্রে তারা বেঁধেছিল তাদের দু'টি মনকে।

কামিনী বোষ্টমীকে দেখেছে সিতাব। কি রূপ তার দেহে। সে মাঝে মাঝে আসত সাদিনপুরে। কাঁখে ধামা নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াত। গান শোনাত। মেয়েদের ভিড়ে উঠোন ভরে যেত। কামিনী বোষ্টমীর গলা ছিল বাঁশির মতো। খুশি হয়ে মেয়েরা চাল দিত আঁজলা ভরে। গাঁ ঘুরতে ঘুরতে তার ধামা ভরে উঠত। সেই কামিনী বোষ্টমীই গাইত এই গান। এ-গান তার বড় প্রিয় ছিল।

আমার সকাল গেলো দুপুর গেলো
বিকেল গেলো সন্ধ্যে হলো
আহা, এ-কূল গেলো ও-কূল গেলো
দেখা পেলাম না।

ভোলাদাসের সঙ্গে ঘর বেঁধেও যেন মনের মানুষের নাগাল পায়নি কামিনী বোষ্টমী। সে-আগুন ছিল তার মনের মধ্যে। মনের মধ্যেই জ্বলত। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু দেখে তার মনের জ্বালা বাইরে থেকে টের পাওয়া যেত না। তাই একদিন পাঁচ-ছ'বছরের মেয়েকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো সে।

কামিনী বোষ্টমীর প্রিয় গান এখন ভোলাদাসের কণ্ঠে গানের সুরে সুরে সে যেন খুঁজে বেড়ায় তার আপনজনকে—

আমার মনের ঘরে ঘাপটি মেরে
বসে একজনা
ও সে সিঁধেল চোরের গুরু সেজে
করলে বঞ্চনা।
তার নাগাল পেলাম না ॥

গান শেষ হতেই ভোলাদাস চোখ বুজে গাবগুবো কপালে ঠেকিয়ে সবাইকে প্রণাম করে। টুকিতে টুকিতে মেয়েরা চাল এনে দেয় ভোলাদাসকে। বগলে ঝোলানো একটা লম্বা থলেতে চাল নেয় সে। থলে ভারি হয়ে ওঠে ক্রমশ। ফুল্লরাও চাল এনে দেয় গোঁসাইকে। রাধা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় সঙ্কুচিত। একমুঠো চাল এনে গোঁসাই বাবাকে দিতে তারও সাধ যায়। কিন্তু তাদের সংসার বড় অভাবের। মা কিছুতেই চাল দেবে না। দুঃখে ভারি হয়ে ওঠে তার বুক।

রাধার করুণ মুখ বিষণ্ন করে তোলে জগতকাকাকে। সে কোমরের গেঁজে থেকে একটা নতুন ঝকঝকে দশ পয়সা বের করে। হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক চায়। তারপর আস্তে ডাকে, 'রাধি —রাধি—'

চমকে ফিরে তাকায় রাধা। লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে সে।

জগতকাকু বলে, 'ইটা গোঁসাইবাবাকে দিঞে দে না।'

মুহূর্তে রাধার করুণ মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। চোখে-মুখে ঘৃণা ও ক্রোধের ছায়া। দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে যায়। তীক্ষ্ণ ঝাঁজালো কণ্ঠে বলে, 'তুমিই দাও না!' তারপরই দ্রুত পায়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় সে।

জগতকাকু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই যেন।

জগতকাকু লক্ষ্য করেনি, কখন ভোলাদাস তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে একগাল হাসি। হাত বাড়িয়ে বলল, 'কই, দাও বাবাজী।'

নিঃসাড় হাতখানি বাড়িয়ে পয়সা দেয় জগতকাকু। ভোলাদাস হাতটা কপালে ছুঁইয়ে বলে, 'রাধে কেষ্ট —রাধে কেষ্ট!' তারপর গ্রামের পথে পা বাড়ায় সে। গাবগুবোর তারে ঝঙ্কার ওঠে —গুব্-গুব্ —গুব্-গুব্ —গুব্-গুবা-গুব্—

চার

শিবুর বাড়ির উঠোনে ধান মাড়াই চলছে। বড় ছেলে লাটু পাঁচন-হাতে গরুর পেছনে পেছনে ঘুরছে। শিবু কাঁড়াল* দিয়ে ধানের শিষগুলো নেড়ে-চেড়ে

* দীর্ঘ লাঠির একপ্রান্তে লোহার ফলা লাগানো আঁকশি।

দিচ্ছে। শিবুর ছোট ছেলে পটু এবং মেয়ে বুঁচি মাড়নের পাশে দাঁড়িয়ে। খালি গা তাদের। গরুগুলো ঘুরতে ঘুরতে তাদের সামনে থেকে চলে যেতেই ওরা ছুটে গিয়ে মাড়নের ওপর গোটা দু'তিনেক ডিগবাজি খেয়ে নেয়। গরুগুলো ফিরে আসার আগেই তারা মাড়ন থেকে নেমে এসে দাঁড়ায়। হাসে খিলখিল করে। শিবু মাঝে মাঝে বকে, 'অ্যাই —অ্যাই —অ্যাই গ্যাখো না! এক্ষুনি গরুর পা-র তলায় পৈড়্বে। দিবে আঁতুড়ি-ভুতুড়ি বার করে। যা এখ্যান থেকে, যা বুলছি।'

শিবুর কথায় ওরা মোটেই কান দেয় না। খিলখিল করে হাসে। কে ক'টা ডিগবাজি খেয়েছে, তার হিসেব নিয়ে ঝগড়া করে। পটু বলে, 'আমার পঁচিশ।'

বুঁচি বলে, 'আমার আঠাশ।'

'এবার দেখিস, একবারে পাঁচটা খেঞে লিবো।'

'আমি ছ'টা খেঞে লিবো।'

শিবু চেঁচায়, 'লাটুর মা, ও লাটুর মা! এদের দু'কিল দিঞে ঘর থেকে বার করে দাও তো। হারামজাদারা কথা শুনে না। এক্ষুনি মৈর্বে।'

লাটুর মা-র সাড়া পাওয়া যায় না। দাওয়া অন্ধকার। ঘরের ভেতর লম্ফর মিটমিটে আলো।

এমন সময় দরজায় ছকু মোড়লের গলা শোনা যায়, 'কই হে, শিবু ধাড়িতে আছো?'

শিবু আপ্যায়ন করে, 'এই যে মোড়ল, এসো এসো। ওরে পটু, একটা মুড়া নি আয়। তোর খুড়োকে বৈস্‌তে দে।'

ছকু মোড়ল মোড়ায় বসে জিজ্ঞেস করে, 'কি ধান দিয়্যাছিল্যা হে? ধলাসিন? পোয়াল খুব বড় বড় মনে হছে।'

শিবু একপাশে কাঁড়াল রেখে মোড়লের কাছে এসে মাটিতে বসে। বলে, 'না মোড়ল, ইন্দোশাল। ধরো, ভাত-মুড়ি দু'য়েই চৈল্‌বে। তাই ভেবে—'

'তা বেশ বেশ। ধান তো ভালোই হৈল্‌ছে দেখছি।'

'গাছি ধান তো ভালোই হৈল্‌ছিল। আখুন কেমন ফলে দেখি।'

শিবুর জমি বেশি নয়। মোটে সাতাশ কাঠা। একখানা পনেরো কাঠা, অন্যখানা বারো কাঠা। বারো কাঠা পুকুরের কাছে। ধান ছাড়াও অন্য ফসল ফলে তাতে। আলু পেঁয়াজ তরি-তরকারি —ধান তুলে নিয়ে সে-সবেরও চাষ করে শিবু। বারো কাঠার চার কাঠা আখ লাগানো হয়েছে এবার।

ছকু মোড়ল বলল, 'তুমার আখটুকুন কিন্তু খুব ভালো হৈল্‌ছে। কোট্টুকুন দিয়্যাছো?'

'মুটে চারকাঠা। খরচাপাতির ভয়ে বেশি লাগাতে পারিনি।'

'ওতেই তুমার এক পালা আখ হবে। দেখতে হবে না। কি আখ আছে? সৈঁতি?'

'ফাটাজবা দিয়্যাছি মোড়ল। সৈঁতি খুব মরে। গেলোবার পাথরার ইয়াসিন সৈঁতিতেই ফেরাল হলো। চোদ্দ কাঠা আখ। ভাদর মাসে সেই আখ জড়তে হলো এই উঁচু টুলে চেপে। হায় হায় রে আখ! জান কেড়ে লেয় মোড়ল। তারপর যেই মৈর্‌তে লাগল, এক মাসের মধ্যে সাবাড। লায়েক ব্যাটা ম'লেও অত 'শোগ্‌' হয় না হে।'

'হ্যাঁ, বেচারা আখের চাষই ছেড়ে দিলে।'

'না ছেড়ে কি কৈর্‌বে বোলো! আখ তো আখ গেলো, একগাছা বিচুনও পেলে না। আর বিচুনের যা দর, কিনে আখ-চাষ করা যার-তার কম্ম লয়।'

'তুমার বিচুন বেশি হলে আমাকে দিও হে। সামনের বছর সৈঁতি-টেতির পাট উল্‌টে দিবো, বুঝল্যা!'

কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল ছকু মোড়ল। শিবু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'বোসো মোড়ল, বোসো। তামুক খেঞে যাও।'

ছকু মোড়ল বলল, 'না হে, আর বৈস্‌বো না। ধানের সব তাগাদা দিতে হবে। লিব্যার সময় লেয়, দিব্যার সময় মনে থাকে না, বুঝ্‌ল্যা। এবার থেকে ইসব পাট আর থুবো না ভাবছি। সুমাদিস ব্যাটা তো মরেই গেলো। ধান্‌ চাড্ডি যে আদায় কৈর্‌বো, তারও উপায় নাই। তা শিবু, তুমার ধানটা এবার শোধ করে দিও, বুঝল্যা। কাল সকালে সিধুকে পাঠিয়ে দিবো। বাকি ধান দিঞে দাও, দরকার হলে আবার লিও। তুমাদের কথা আলাদা, তুমাদের না দিলে—'

শিবু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মোড়ল, অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। একটুকুন বুঝে-সুজে —সময়ে মুনিষ-টুনিষও তো দিছি।'

'সে তো দিছো। দিছো না, উ-কথা তো বুলছি না। মুনিষ-টুনিষ দাও বুলেই তো, নইলে ধান বাকিতে দিঞে আমার লাভ কি বোলো? খালি-খালি টাকা বন্ধ করে রাখা। সামকে দ্যাখো, পয়সায় পয়সা কোচ্ছে। কিন্তু খালি পয়সা দেখলেও তো হয় না। অমন মাক্ষিচোষ হঞে পয়সা রোজগার করা—পয়সার মুখে 'ইয়ে' করে দিই। মানুষের সময়-অসময় বুলেও তো কিছু আছে!'

'তা তো বটেই মোড়ল, তুমরা না দেখলে—'

'তাই তো বোলি হে। পুর‍্যানো বাকি শোধ করে দাও, দরকার হলে আবার লাও। আমি তো আর মরে যাইনি। আমি যদ্দিন আছি শিবু, দেখব। যট্টুন পারি, কৈর্‌বো। তারপর আমি মরে যেলে কেউ দ্যাখে তো দেখবে, না-হয় মাথার ওপরে ভগবান আছে।'

'উ-কথা বুলিও না মোড়ল। তুমি না থাকলে—'

'তুমার গেলোবার ধান ভালো হয়নি, ধানে পোকা লেগে গেলো। সবারই এক দশা। কি করে বোলি, আমার ধান ফেলে দাও। দৈবের ওপরে তো আর মানুষের হাত নাই। তুমি বুল্‌ল্যা, ই বছর পারব না মোড়ল, আমি আর

কিছু বোলি নি। থাক্, আমার যখুন আছে, তুমার কাছ থেকে জোর করে আদায় না কৈর্‌লেও চৈল্‌বে। এবার দিঞে দাও, বাকি থুলেই বাকি পড়ে। তুমার ধরো, গেলোবারের চার মণ লিয়্যা ছিল। চার মণে হলো যেঞে ছ'মণ। এবারে তার দেড়্যা ন'মণ। আর ই-বছর লিয়্যাছো তিন মণ। তিন মণের দেড়্যা হয় যেঞে সাড়ে চার মণ। মুট সাড়ে তেরো মণ। কম ধানটা তো বাকি নাই শিবু!'

শিবু কাতর কণ্ঠে বলল, 'মোড়ল, গেলোবারের দেড়্যা ধানের আবার দেড়্যা ধৈর্‌ছো? আমরা গরিব মানুষ, মরে যাবো মোড়ল।'

ছকু মোড়ল রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো, 'ইটাই তো আমাদের দোষ শিবু। তুমরা ধান খাবা, বছরের পর বছর বাকি থুব্যা, চাইতে যেলেই আমাদের দোষ! তুমি গেলো বছর ধান দিল্যা না, দিতে পারল্যা না, জোর করে আদায় কৈর্‌লেই ভালো হতো?'

'কিন্তু মোড়ল, দেড়্যা ধানের ফের দেড়্যা চাইছ —আমরা গরিব মানুষ—'

'ইটা কি নতুন আইন, অ্যাঁ? ইটা কি নতুন আইন? আচ্ছা, গেলো বছর ধানটা আদায় কৈর্‌লে আমার টাকাটা তো বাকি পড়ে থাকত না? গেলোবারে জমির দাম তেরো শো, এবার এখন পনেরো শো। আমার লোকসানের কথাটা ভেবে গ্যাখো। তার ওপর জমি থেকে একটা ফসলও উঠে আসত। তুমাদের কাছে ওই মাক্ষিচোষ সামই ভালো। কথায় বোলে না —সুদের টাকা জোয়ারের বান, ঘোড়ার আগে আগে যান। তা শিবু, আমার বাপু দেরি হঞে যেছে। তুমি সাড়ে তেরো মণের জায়গায় তেরো মণই দিও। তুমরা আমাকে মুনিষ-টুনিষ দাও বুলেই —'

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল লাটুর মা। মাথায় ঘোমটা। আরও একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে বলল, 'ছোট ছেলেপিলেদের দিকে একটুকুন তাকাও মোড়ল। তেরো মণ ধানই হবে না হয়তো —সব দিলে খাবো কি?'

পেছনে লাটুর মা-র কথা শুনেই ফিরে তাকাল ছকু মোড়ল। লাটু মাড়ন থেকে নেমে এসে একপাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছে। পটু এবং বুঁচির মুখে কোনো হাসি নেই, চেয়ে আছে ছকু মোড়লের দিকে। মাড়নের ওপর গরুগুলো শ্লথ গতিতে হাঁটছে।

ছকু মোড়ল মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল একটু। তারপর বলল, 'না হে না। তুমরা আদায় না দিলে আমার চৈল্‌বে কি করে? সারা গাঁয়ে আমার কম ধান পড়ে নাই।' ছকু মোড়ল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো হনহন করে।

পটু এসে শিবুর কাছে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'সব ধান নি লিবে বাবা?'

শিবু কোনো উত্তর দিলো না। এক পা এক পা করে দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়ল। লাটুকে বলল, 'লাটু, এক কল্কে তামুক সেজে আন তো বাপ।'

গরুগুলো শ্লথগতিতে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে। চেয়ে চেয়ে দেখে শিবু। কিন্তু তার উঠে যাওয়ার আগ্রহ নেই। লাটু তামাক সাজতে বসেছে, পটু পাশে বসে বসে দেখছে। সারা বাড়িটা মুহূর্তে যেন স্তব্ধ। বুঁচি দাওয়ার মেঝেয় শুয়ে —হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। লাটুর মা তেমনি খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

শিবু বলল, 'পটু, গরু ডাকা, গরু ডাকা।'

পটু পাঁচন নিয়ে উঠে গেলো। খুব খুশি। গরুগুলোর পিঠে পাঁচনের বাড়ি মারতে থাকে, 'হেট্ —হেট্—'

তার শিশুকণ্ঠের শাসন মানতে চায় না গরুগুলো। পটু মারতে থাকে, 'হেট্—হেট্ —হেট্—'

অবশেষে নেহাতই যেন শিবুর মুখ চেয়ে গরুগুলো মন্থর পায়ে হাঁটতে শুরু করে।

লাটু হুঁকোয় কয়েক টান দিতেই কল্কের আগুন গনগনে হয়ে ওঠে। মুখভর্তি ধোঁয়া ছেড়ে হুঁকোটা এনে বাবার হাতে দেয়। শিবু আস্তে আস্তে হুঁকো টানতে থাকে।

লাটুর মা বলে, 'মোড়লকে কাকুতি-মিনতি করে বোলো গা, ই-বছরটা যেন—'

শিবু ঝাঁজালো গলায় জবাব দেয়, 'বকবক করিস না। শুনলি তো সব! কুন্থ কথা শুনবে না।'

লাটুর মা-র গলাও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'কিন্তু কোত্থেকে দিব্যা শুনি? সব ধান দিলে ছেলেপিলেরা খাবেই বা কি?'

শিবু গুম হয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে হুঁকোয় টান দেয়।

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে লাটুর মা বলে, 'সব না ছাড়ে, আদ্দেকটা লিক এবার, আসছে বছর বাকিটা দিবো। মোড়লকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বোলো। সাত মণ লিক না-হয়। তাহলেও ছ'মণে চার মণ ভাতের ধান, দু'মণ মুড়ির ধান থাকবে। দু'তিন মাস তো যাবে।'

শিবু বলল, 'ছ'মণ বাকি থাকলে আসছে বছর ন'মণ দিতে হবে।'

'তাই দিবো। ই-বছর ধার-বাকি কৈর্বো না। খেতে পাই খাবো, না পাই খাবো না। কত লোক এথ্যানে-উথ্যানে খাটতে যায়, তুমিও না-হয় যাবা।'

শিবু উত্তর দেয় না। চুপচাপ বসে বসে হুঁকো টানতে থাকে।

পাঁচ

সকালবেলা শিবু মাড়ন নিকাশ করছে। কাঁড়াল দিয়ে পোয়ালগুলো টেনে টেনে নামিয়ে নিচ্ছে মাড়ন থেকে। পাশে ডাঁই হয়ে পোয়াল জমছে। লাটু সেগুলো দড়িতে বোঝা বেঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। গাদা করে রাখছে এক জায়গায়।

একটা করে বোঝা বাঁধা হলে শিবু এসে কাঁড়াল রেখে লাটুর মাথায় বোঝা তুলে দিচ্ছে।

মাড়ন নিকাশ হলে শিবু লাটু দু'জনে মিলে উঠোনের মাঝখানে লিহির* গোড়ায় ধানগুলো জড়ো করল। আগ্‌ড়া বিশেষ নেই। পুষ্ট দানা। খড়ের কুটো আছে কিছু। কুলোর হাওয়া দিলে সোনার মতো ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

এমন সময় সিধু এলো। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'কই গো শিবুকাকা!'

সিধুর কাঁধে খালি বস্তার বাণ্ডিল। এক গোছা এলো পাট দিয়ে বাঁধা। কাঁধ থেকে বস্তাগুলো দাওয়ায় নামিয়ে রাখল সে। তারপর বস্তার ওপরেই বসে পড়ল উঠোনে পা ঝুলিয়ে। বলল, 'আখুনো অনেক দেরি দেখছি শিবুকাকা! ধানে বাতাস দিতেই লাগোনি!'

শিবু আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল সিধুকে। চেয়ে চেয়ে দেখল, সিধু বসে আছে, সেই বস্তাগুলোর দিকে। কোনো জবাব দিলো না। বুকের ভেতর কিরকম একটা ব্যথা দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসছে। মনে হচ্ছে যেন চোখ ফেটে জল বেরোবে। লিহির কাছে স্তূপীকৃত ধানগুলোর দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে সে। সোনার মতো ঝকঝকে ধান। কত দিন আগে সে মাঠে লাঙল দিয়েছিল, বীজ বুনেছিল যত্ন-সহকারে। বুঁচির মাথার কোমল মসৃণ চুলগুলোর মতো ধানের চারাগাছগুলো দেখে দেখে তার সাধ মিটত না। এক হাঁটু কাদা ভেঙে ভেঙে চারাগুলো রোপণ করেছিল গভীর মমতায়। সে কত দিন আগে? কত কাল আগে? এক অস্পষ্ট ছবির মতো মনে পড়ে তার।

লাটু করুণ চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে বারবার তাকায়।

সিধু বলে, 'একটুকুন তাড়াতাড়ি করো কাকা।'

শিবু ধানে বাতাস দেওয়ার জন্যে কুলো খোঁজে। লাটুর মা এসে সিধুর কাছে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'তোর মুনিব আসবে না?'

সিধু বলে, 'না, মুনিব এসে কি কৈর্‌বে? আমাকেই দেখে লিতে বুল্যাছে।'

ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে ধরায় সিধু।

লাটুর মা শিবুকে বলে, 'ওগো, তুমি একবার মোড়লের কাছে যাও। যেঞে বোলো, সবটা না হয়, কিছু বাকি থৈক্। ছেলেদের চোখের সামনে থেকে সব নি চলে যাবে!'

শিবু ঝাঁজালো কণ্ঠে বলে, 'ক্যানে বকবক কৈর্‌ছিস! কুন্থু কথা শুনবে না।'

বুকের কান্না কণ্ঠস্বরের উষ্ণতায় ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে সে।

লাটুর মা বলে, 'তা-ও তুমি একবার যাও। লাটুর লেগে অন্তত দু'মণ ধান যেন দেয়।'

* উঠোনের মাঝখানে পোঁতা বাঁশের বা কাঠের খুঁটি। এই খুঁটিতে আটকানো একটি দীর্ঘ দড়িতে গরুগুলো সারিবদ্ধভাবে বাঁধা থাকে এবং বৃত্তাকারে ঘোরে।

শিবু আর আপত্তি করে না। যাওয়ার সময় বলে, 'তুই একটু বোস্ সিধু। আমি মোড়লকে দেখা করে আসি।'

ছকু মোড়ল যেন তারই অপেক্ষা করছিল। বৈঠকখানায় একটা মোড়ায় বসে বসে গড়গড়া টানছিল সে। গায়ে ফতুয়া। হাঁটুর ওপর ধুতি। শিবুকে দেখেই দূর থেকে আহ্বান জানাল, 'এসো হে শিবু, এসো। সিধ্যা যায়নি বুঝি? সকালে উঠে উঠেই হারামজাদাকে বুল্ল্যাম, শিবুর কাছ থেকে ধান চাট্টি নি আসবি, তা হারামজাদা—'

শিবু বলল, 'সিধু আমার ঘরেই বসে আছে মোড়ল।'

'ও। যেল্ছে তাহলে! তা তুমার কুন্থ দরকার না-কি শিবু?'

'কালকের কথাটাই বুলছিল্যাম মোড়ল। তুমি যদি না গ্যাখো—'

'এসো। বোসো বোসো। তামুক খাও।'

শিবু নিকোনো মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে। ছকু মোড়ল গড়গড়ার মাথা থেকে কল্কে তুলে শিবুর দিকে বাড়িয়ে দেয়। শিবু কল্কে নেয় হাতে। ছকু মোড়ল বলে, 'তুমাদের আমি দেখি না, ই-কথা কি করে বুল্ল্যা শিবু। সময়ে-অসময়ে যখনই এসে চেয়্যাছো, যা পের‍্যাছি, দিয়্যাছি। কখুনো তো 'না' বুলিনি।'

'এবার না-হয় আদ্দেকটা লাও মোড়ল। সামনে বারে সব শোধ করে দিবো।'

'আমিও বড় বিপদে পড়্যাছি শিবু। নইলে কথা ছিল না। পালদের ইবার ভাগ-বাঁটোয়ারা হঞে যাবে। ছোটজনা না-কি এখ্যানকার সম্পত্তি-টম্পত্তি সব বিক্রি করে দিবে। আমাকে চিঠি দিয়্যাছে। জমিগুলিন সব এক চকে, আমার জমির ওপরেই। না লিলে লয়। অন্য শরিক ভিতরে ঢুকে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বাঁধাবে। তা জমিটা তো কম লয়। তার ওপর সতীদীঘির অংশ। আমার পক্ষে সব লিয়্যাও মোশকিল। তবু যেমন করে হৈক্, লিতেই হবে। তাই ধার-বাকি যার কাছে যা আছে, আদায় কৈর‍্ছি। নইলে তুমাদের কথা অন্য সময় কি থুই না?'

'অন্তত দু'মণও ছাড়ো মোড়ল। দু'দিন পরে তো আবার তুমার কাছেই আসতে হবে।'

'তাই তো হে। তুমার ব্যাপারটা আমাকে ভাবালে দেখছি।'

ছকু মোড়ল চুপ করে ভাবতে থাকে। শিবু দারুণ উৎকণ্ঠায় চেয়ে থাকে মোড়লের মুখের দিকে। মাঝে মাঝে কল্কেয় টান দেয়। কয়েক টান দিয়ে কল্কেটা গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দেয় সে। ছকু মোড়ল গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নেয়। বিলম্বিত লয়ে ধূমপান করতে থাকে। স্তব্ধতাকে ছাপিয়ে গড়গড়ার জলের শব্দ ওঠে।

'দু'মণ দাও মোড়ল। যদি বোলো, মুনিষ খেটেই না-হয় শোধ দিবো।'

'মুনিষ খেটে শোধ দিলে তুমার সংসার চৈল্বে কি করে হে?'

শিবুর সংসারের ভাবনা এখন ছকু মোড়লের। শিবু চুপ করে থাকে। ছকু

মোড়ল বলে, 'তার চেঞে এক কাজ করো শিবু। আমি বোলি কি, ধানটা দিঞে দিলে কালই তুমাকে আবার কারোর কাছে ছুটতে হবে। ধার-কজ্জ কৈর্‌তে হবে। সামলে উঠতে পারব্যা না তুমি। তার চেঞে, তুমার ওই বারো কাঠা জমি আমার কাছে থোও। বছর তিনেকের মতুন। মুনিষ-টুনিষ খেটে আমার টাকা শোধ দিব্যা। শোধ হলেই জমি ফেরত লিব্যা। তেরো মণ ধানের দাম ধরো, কুড়ি টাকা করে ধৈর্‌লেও, দু'শো ষাট টাকা। যা নিয়ম, তাতে অন্তত এক বিঘ্যা জমি থুতে হয়। তা তুমি ওই বারো কাঠাই থোও।'

শিবু স্তব্ধ হয়ে ভাবে।

ছকু মোড়ল বলে, 'তুমার আখ আছে চার কাঠা, তুমি চাষ কর‍্যাছো, তুমি লিও। ওতে আমি হাত দিতে যাবো না। আসছে বার থেকে আমি চাষ কৈর্‌বো। বছর তিনেক সময় দিছি। আমার টাকা শোধ হলেই তুমার জমি তুমি চাষ করিও।'

শিবু বলে, 'ওই বারো কাঠাই আমার দু'ফসল্যা জমি মোড়ল। একটুকুন তরি-তরকারির গাছ-টাছ লাগাই ওতেই।'

'বেশ তো, তাহলে তুমি ওই পনেরো কাঠাই থোও। উ-জমির দাম অনেক কম। তা হৈক্ গে। তাই করো তাহলে। আর তুমি যদি চাষ কৈর্‌তে চাও, তো পনেরো কাঠা ক্যানে, আরো দু'বিঘ্যা জমি লাও আমার। ভাগ-চাষ করো। তুমাদের সংপরামর্শ দিবো শিবু—তুমরা আমার নিজের লোক। ওই সামের মতুন মাক্ষিচোষ পাওনি আমাকে। কি বুলছো, রাজি তো?'

শিবু আর ভাবতে পারে না। তার মাথার মধ্যে সব যেন কিরকম তালগোল পাকিয়ে যায়। ভালোমন্দ চিন্তা করার ক্ষমতাটুকুও যেন তার আর নেই। নির্জীব কণ্ঠে বলে, 'তাই করো মোড়ল, যা ভালো হয়। আমি আর কি বুলবো?'

'তুমার ভালোর লেগেই বুলছি হে। তা তুমি একটুকুন বোসো, কাগজ আনাই।' তারপর গলা ছেড়ে হাঁক দেয় ছকু মোড়ল, 'পাঁচু—ওরে পাঁচু—'

ভেতর বাড়ি থেকে সাড়া আসে, 'যাই বাবা।'

পাঁচু এসে দাঁড়ায়। কালো কুচকুচে, লম্বা দড়ির মতো চেহারা। চোখ দু'টো উজ্জ্বল। মাথার চুল কোঁকড়ানো—পেছনের দিকে আঁচড়ানো। পরনে লুঙ্গির মতো করে ধুতি, গায়ে ধবধবে গেঞ্জি। মুখ-চোখে বেশ শৌখিনতার ভাব। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি বুলছো?'

ছকু মোড়ল বলল, 'তোর মা-কে বোল্, বাক্সে কাগজ আছে, বার করে দিবে। আর একটা কাজলতি (কাজললতা) নি আসিস, বুঝলি!'

পাঁচু কিছুক্ষণের মধ্যেই গভর্ণমেণ্টের ছাপ-মারা কাগজ নিয়ে আসে। শিবু যন্ত্রচালিতের মতো বুড়ো আঙুলে কাজল লাগিয়ে পটপট করে ছাপ দেয় সাদা কাগজের এখানে-ওখানে। রসাতলে যাক সব—বিশ্ব-সংসার রসাতলে যাক!

ছয়

ভৈরব এসেছে কলকাতা থেকে। সকালবেলা মুখ-হাত ধুয়েই ভৈরবের সঙ্গে দেখা করতে গেলো সিতাব। লাঙল নিয়ে বেরোতে হবে মাঠে। অনেক জমিতেই বতর*। সারাদিন নানা কাজে আর ফুরসৎ পাওয়া যাবে না। সকাল সকালই সে ভৈরবের সঙ্গে দেখা করে নিতে চায়।

কিন্তু ভৈরবের বাড়িতে গিয়ে তাকে হতাশ হতে হলো। ভৈরবের দাদা গৌরসুন্দর পাল গোয়ালঘরে গরুকে বিচালি কেটে দিচ্ছে, মদন গোয়াল সাফ করছে। সেখানেই গেলো সিতাব। গৌরসুন্দর বিচালি কাটতে কাটতেই জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর সিতু? সকালবেলা এদিকে?'

সিতাব বলল, 'ছোড়দার সাথে দেখা কৈরৃতে এল্যাম।'

'হুঁ। তা উ তো আখুনো উঠেনি। তুমার যেঞে, কখন উঠবে বোলা মোশকিল। কলকাতার বাবু, বুঝল্যা হে।'

ভৈরব এখন কলকাতার বাবু। সাদিনপুরের কেউ না। অথচ এই ভৈরব সাদিনপুরের ধুলো-কাদা মেখে মানুষ। সিতাবের চেয়ে বছর চার-পাঁচেকের বড় হলেও একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে, পুকুরে সাঁতার কেটেছে, আবার ঝগড়া-ঝাঁটিও করেছে। সেই ভৈরব এখন অন্য মানুষ, কলকাতার বাবু।

আসলে ভৈরবের যা কিছু উন্নতি, তার মূলে তার দাদা গৌরসুন্দর। মা আগেই মারা গিয়েছিল, বাবা মারা যেতেই গোটা সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে গৌরসুন্দরের ওপর। পরপর দু'টি বোন, তারপর ভৈরবসুন্দর, তারপর আর এক বোন। জমি-জমা বলতে বিশেষ কিছু না —বিঘে চোদ্দ পনেরো। অথচ সংসারের খরচ কম না। কিন্তু গৌরসুন্দর দমে যাওয়ার পাত্র নয়। নিজের হাতে সে চাষ-বাস শুরু করে। লাঙল বওয়া, ধান রোয়া, ধান কাটা, নানারকম সব্জির চাষ, নিজ-হাতে সবকিছু। রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার শরীর হয়ে ওঠে আবলুস কাঠের মতো কালো। এদিকে সংসার সামলায় বাসন্তী। আসলে মা মারা যেতেই সংসারে দরকার হয়ে পড়ে একজন গৃহকর্ত্রীর। তাই গৌরসুন্দরের বাবা ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনেছিল বাসন্তীকে। সংসারে এসে পায়ে আলতা পরে বসে থাকার ফুরসৎ ছিল না তার। ঘর-গেরস্থালী ছাড়াও বাড়ির ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করার দায়িত্বও সেই চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই বাসন্তীকে নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল।

তা নিজের কর্তব্যে এতটুকু গাফিলতি দেখায়নি গৌরসুন্দর। পরপর তিন বোনের বিয়ে দিয়েছে। হেলাফেলা করে নয়, রীতিমতো দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছে।

* লাঙল দিয়ে চাষ করার উপযুক্ত সামান্য ভেজা-ভেজা মাটি

ভৈরবকে সে চাষে খাটতে দেয়নি। গাঁয়ের স্কুল পাস করলে তাকে রামপুরহাট হাই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। সাইকেল কিনে দিয়েছিল একটা। সেই সাইকেলে চড়ে রোজ স্কুলে যেত ভৈরব। সে যখন স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজে ঢুকল, সিতাব তখন পড়াশোনার পাট চুকিয়ে মাঠে জল-কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

বি. এ. পাস করেই কলকাতায় চাকরি পেয়ে যায় ভৈরব। চাকরি পাওয়ার পরেও সে মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসত। ক্রমে আসা-যাওয়াটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। হঠাৎ একদিন চিঠি আসে, বিয়ে করেছে সে, দাদার আশীর্বাদ চায়। মনে বড় ব্যথা পায় গৌরসুন্দর। সবচেয়ে আঘাত পায় বাসন্তী। তবু অকুণ্ঠ আশীর্বাদ পাঠাল দু'জনেই। গাঁয়ের লোকে পাঁচ রকম সমালোচনা করলে গৌরসুন্দর বলে, 'বিয়ে কর‍্যাছে বেশ কর‍্যাছে। অমন লেখাপড়া জানা ছেলে বিয়ে কৈর‍্বে তুমাদের এই গাঁয়ের পোঁটা-পড়া মেয়েকে। জানো, বৌ-মা আমার বি. এ. পাস। অমন লেখাপড়া জানা একটা মেয়ে বার করো না ই-তল্লাটে!'

তা সেই ভৈরব এসেছে অনেকদিন পর। সঙ্গে নিয়ে এসেছে বি. এ. পাস করা বৌ। ভৈরব এখন কলকাতার বাবু। কখন ঘুম থেকে ওঠে বলা যায় না। সিতাব গৌরসুন্দরের পাশে বসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

হঠাৎ গৌরসুন্দর চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'তুমিও এক-আধটুকুন লিতে-টিতে চাও না-কি হে?'

সিতাব বুঝতে পারে না। বোকার মতো হাঁ করে চেয়ে থাকে গৌরসুন্দরের মুখের দিকে।

গৌরসুন্দর বলে, 'কি যে মাথায় খ্যাপামি ঢুক্যাছে ওর, বুঝতে পারি না সিতু। মাটি তুমার হলো যেঞে মা। সেই মাটি বিচতে আছে কখুনো? অথচ কি দুর্বুদ্ধি দ্যাখো, সব জমিজমা বিচে ফেলতে চায়।'

এতক্ষণে সিতাবের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। জিজ্ঞেস করে, 'ভৈরবদা জমি বিচবে? সব জমি?'

'না হলে বুলছি কি! সব জমি লয়, তুমার যেঞে, ওর যেটুকুন পাওনা, সেই-টুকুন। তা সেইটুকুনই কি কম হলো! তোর জমি তো আমি নি লিইনি বাপু, তোর জমি তোরই পড়ে আছে। যেদিন চাস, গাঁ-র পাঁচজনকে ডেকে নিজের অংশ বার করে লে। কিন্তু তাই বোলে সব মাটি কৈর‍্তে আছে খামোখা! জমি থাকবে, তুই নিজে না পারিস, অন্য লোককে দে, চাষ করুক। তোর পাওনা ধান বছরে বছরে এসে নি যা। কত বুঝাই সিতু। কিন্তু উ আখুন তুমার হলো যেঞে বিদ্যের জাহাজ —কলকাতার বাবু। আমার মতুন মুরুখ্যুর কথা কানে লিবে ক্যানে বোলো!'

'কিন্তু তাই বুলে সব জমি বিচে দিবে?'

'তা কি আর বুঝাইনি! চিঠিতেই সব কথা লেখ্যাছিল আমাকে। আমিও

চিঠির জুয়াবে ভালো কথাই বুল্যাছি। কিন্তু উসব কথা ওর পছন্দ লয়। ইবার এস্যাছে ওই লেগেই। ছকুকে, সামকে, তুমার যেঞে, আরো কাকে কাকে চিঠি দিয়্যাছিল শুনছি। জমি বিচ্যার কথা লেখ্যাছিল।'

একটু দম নিয়ে পুনরায় বলতে থাকে গৌরসুন্দর, 'এইটুকুন থেকে মানুষ কর্যাছি সিতু, ছোটতেই মা-বাপ মৈল্‌ছিল। মা-বাপ না থাকার জন্যে যাতে কুন্থু কষ্ট না পায়, সেজন্যে সব কর্যাছি। কুন্থুদিন মাঠে যেতে দিইনি। ইস্কুল-কলেজে পড়াল্‌ছি। আথুন তুমার যেঞে, নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখ্যাছে, আমার কথা কি আর কানে লেয়?'

'কিন্তু ভৈরবদা নিজের অংশ সব বিচে দিলে তুমার তো কষ্ট হবে গৌরদা? তুমার বড় সংসার, অনেক খরচপত্তর। আদ্দেক জমিই তো চলে যাবে!'

'তা যাবে। কিন্তু এ-সংসারে কে কাকে দ্যাখে সিতু! কথাতেই আছে না —আপন চেঞে পর ভালো, পর চেঞে জঙ্গল ভালো!'

'তুমিই নি লাও না গৌরদা? দামটা এক সাথে না পারো, আস্তে আস্তে দিঞে দিব্যা।'

'আমি কোত্থেকে লিবো সিতু? আমার কি টাকা-পয়সা আছে? যা আছে, সবই তো তুমার যেঞে আমাদের দু'জনার। আর পরে বুলছো, পরে টাকা-পয়সা আসবে কোত্থেকে? ও-ই বা পরে লিতে যাবে ক্যানে, হাতে হাতে লগদ টাকা পেছে যখুন!'

সিতাব বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে।

এমন সময় ভৈরব আসে। পরনে পায়জামা, গায়ে তোয়ালে। ব্রাশ করতে করতে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ায়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল, নিটোল স্বাস্থ্য। সাদিন-পুরের পালদের ভৈরব বলে তাকে আর চেনাই যায় না।

সিতাব উঠে যায় ভৈরবের কাছে। বলে, 'আমি অনেকক্ষণ এস্যাছি ভৈরবদা। তুমার লেগে বসে আছি। ভালো ছিল্যা তো?'

ভৈরব সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে। মুখচোখ থমথমে। ভারি গলায় বলল, 'হ্যাঁ, মোটামুটি চলে যাচ্ছে। তা তোর খবর কি? ভালো আছিস তো? কি করছিস এখন?'

'এই খাটছি-খুটছি। কি আর কৈর্‌বো! তুমার সাথে একটা সলা-পরামর্শ কৈর্‌তে এল্যাম ভৈরবদা।'

'কিসের সলা-পরামর্শ রে?'

'একটা চাকরির খবর পেয়্যাছি। রেলের চাকরি।'

'হুঁ। তা চল্‌, ওদিকটায় যাই। ওখানেই কথা হবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সতীদীঘিতে আসে।

সকালবেলা মিঠে রোদে শালুক ফুলে পদ্মফুলে হাসছে দীঘি। পদ্মের পাতায়

পাতায় দলপিপি, জলের ধারে দু'তিনটি বক, দীঘির মধ্যিখানে একটি পানকৌড়ি, দীঘির পাড়ে বাবলা গাছে একটি মাছরাঙা —সবাই প্রাতরাশের খোঁজে ব্যস্ত। পানকৌড়িটা ডুবে গিয়ে অনেকক্ষণ পর পর ভেসে উঠছে, মাছরাঙাটা অনেকক্ষণ বসে থেকে একবার করে জলে ছোঁ মেরে যাচ্ছে, বকগুলো মন্থর পায়ে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, দলপিপিরা ভীষণ চঞ্চল, এ-পাতা ও-পাতা লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ক্রমাগত।

সিতাব বলল, 'সতীদীঘিতে আমরা কত সাঁতার কাটত্যাম, মনে আছে ভৈরবদা?'

ভৈরব বলল, 'তা কি আর নেই! গরমের সময়টা তো সারা দুপুর কাটত সতীদীঘির জলে।' তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কি চাকরির কথা বলছিলি যেন? কোথায়?'

'এই সাদিনপুর ইস্টিশিনেই —পিওনে লোক লিবে।'

'তুই জানলি কি করে?'

'টিকিটবাবু নিজে বুল্যাছে আমাকে?'

'টিকিটবাবুর সঙ্গে তোর আলাপ আছে?'

'হ্যাঁ, আমি প্রায়ই ওদের কোয়াটারে যাই। টিকিটবাবু আমাকে খুব ভালোবাসে কি-না! একদিন ডেকে বুললে —রেলের চাকরি, মাহিন্যা ভালো। কাজ ভালো দেখাতে পারলে আরো মাহিন্যা বাড়বে।'

'হুঁ, রেলের চাকরি অবশ্য ভালোই।'

'কিন্তু টাকা চায়।'

'কত?'

'চায় তো অনেক। পাঁচ শো। আমি দিতে পারব না বোলাতে তিন শো-তে নেম্যাছে।'

'তিন শো! তা তিন শো টাকা দিয়ে যদি চাকরি হয়, ভালোই। কিন্তু লোকটা যদি সুবিধের না হয়, টাকা-পয়সা মেরে দিতে পারে।'

'টাকা-পয়সা মেরে দেবে? কাকাবাবু?'

'বলা যায় না রে। লোক চেনা মুশকিল। অনেকের তো ওই সবই পেশা। চাকরির লোভ দেখিয়ে টাকা নেওয়া। চাকরিও হয় না, টাকাও ফেরত পায় না। বেমালুম হজম করে দেয়। আমাদের অফিসেই এ রকম দু'একজন করে আসছে বরাবর।'

'তুমরা কিছু বোলো না?'

'আমরা কি বলব! আমাদের কথা কি গ্রাহ্য করে?'

সিতাব ভাবতে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভৈরব বলে, 'তবে তিন শো টাকা দিয়ে যদি কাজটা

হয়, তাহলে ভালোই। ও-কাজ পেলে অনেকেই অনেক বেশি টাকা দিতে চাইবে।'

'কিন্তু অত টাকা দিবো কি করে, তাই তো ভাবছি।'

'ধার-ধোর করে। কিংবা, ধর, কিছু বিক্রি-টিক্রি করে!'

সিতাব ভাবতে থাকে। বিক্রি-টিক্রির কথা শুনে তার হঠাৎ মনে পড়ে, ভৈরব সব জমি বিক্রি করে দেবে। জিজ্ঞেস করে, 'তুমি না-কি সব জমি বিচে দিছো ভৈরবদা?'

'হুঁ, ওসব ঝামেলা আর রাখব না ভাবছি।'

'তুমি নিজে চাষ না করো, ভাগে-ঠিক্যাতে দিঞে যাও। বছরে একবার করে এসে ধান বিচে দিঞে টাকা নি যাবা।'

'তা তো বুঝি সিতু। কিন্তু টাকার যে বড় দরকার। কলকাতার কাছাকাছি একটু জমি কিনেছি। একটা ছোটখাটো বাড়ি তুলব। অনেক টাকার দরকার।'

'গৌরদার খুব কষ্ট হবে ভৈরবদা। কত দিন থেকে জমিজমা সব নিজে দেখাশুনা কোচ্ছে!'

'কিন্তু আমি কি করব সিতু! আমার একার কথায় তো সব হবে না!'

'ক্যানে? তুমার একলার কথায় হবে না ক্যানে?'

'তোর বৌদি রয়েছে না? সে এসব জমিজমার ব্যাপার পছন্দ করে না। কলকাতার মেয়ে, বাড়ি-টাড়ির ওপরেই ঝোঁকটা বেশি।'

সিতাব আর কিছু বলে না। আর কিছু বলার নেই তার।

ভৈরব বলে, 'কাজটা পেলে তুই নিয়ে নে সিতু। তোর নিজের জমি-জিরেত নেই, মুনিষ খেটে সংসার চালানো কঠিন। কোনোরকমে টাকাটা যোগাড় করে ফ্যাল্।'

তখনও বকগুলো জলের ধারে শিকার খুঁজছে এক পা এক পা করে। দল-পিপিরা পাতায় পাতায় লাফাচ্ছে। পানকৌড়িটা একইভাবে জলে ডুবছে, ভেসে উঠছে অনেকক্ষণ পর। মাছরাঙাটা অনেকক্ষণ থেকে থেকে একবার করে জলে ছোঁ মেরে যাচ্ছে।

ভৈরবের সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেক বেলা হয়ে গেলো। আজ আর মাঠে লাঙল নিয়ে যাবে না সিতাব।

কয়েক দিনের মধ্যে সব কাজ গুছিয়ে নিয়ে ভৈরব চলে গেছে। তার প্রাপ্য সাত বিঘে জমি মায় সতীদীঘির চার আনা অংশ সব কিনে নিয়েছে সাম মোড়ল। তাই নিয়ে ভৈরবের সঙ্গে ছকু মোড়লের মন কষাকষি। কিন্তু সামের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ছকু মোড়ল? তার হচ্ছে সুদের কারবার। কথায় আছে না— সুদের টাকা জোয়ারের বান, ঘোড়ার আগে আগে যান। কিন্তু ছকু মোড়লের

দায় প্রাণের দায়। এতদিন সতীদীঘির ছিল দুই অংশীদার—ছকু মোড়লের আট আনা, পালদের আট আনা। তাই অন্য কোনো অংশীদার যাতে ঢুকতে না পারে, সেজন্যে সে গিয়েছিল ভৈরবের কাছে। জমি তুমি যাকে খুশি বিক্রি করো, কিন্তু দয়া করে সতীদীঘিতে অন্য কাউকে ঢুকতে দিও না। না-হয় গৌরসুন্দরই নিক। কিন্তু গৌরসুন্দরের টাকা নেই। গৌরসুন্দর নিতে পারলে কোনো কথা ছিল না, কোনো ঝামেলা হতো না। অথচ ভৈরব ছকু মোড়লকেও আলাদা করে সতীদীঘির অংশ বিক্রি করতে রাজি নয়। কারণ সতীদীঘির অংশের জন্যেই সে মাঠের জমির দেড়গুণ দাম পাচ্ছে। অতএব সাত বিঘে জমি যে নেবে, তাকেই সতীদীঘির অংশ দেবে সে। পারলে ছকু মোড়লই নিক। কিন্তু চড়া দামে সাম কিনে নিলো সব। তার সঙ্গে পেরে উঠল না ছকু মোড়ল। শেষ পর্যন্ত তাকে মনের ক্ষোভ মনেই চেপে রাখতে হয়েছে।

ভাগ-বণ্টনের জন্যে গাঁয়ের পাঁচজনকে ডেকেছিল গৌরসুন্দর। তাদের সামনে দলিল-পত্র ফেলে দিলো। একটা দীর্ঘ সাদা কাগজের দু'পিঠে লেখা বিরাট ফিরিস্তি দিলো বাড়ির আসবাবপত্রের। তাতে থালা-বাসন থেকে লাঙল-গরু কিছু বাকি নেই। সমস্ত তৈজসপত্র এনে জড়ো করা হলো উঠোনে। তারপর গৌরসুন্দর পাঁচজনের সামনে হাত জোড় করে বলল, 'আমাকে আর কিছু শুধাবেন না। আপনারা হলেন যেগ্যে গাঁয়ের পাঁচজন। মান্য লোক। যা করে দিবেন, আমি 'না' বুলবো না।'

গঙ্গাচরণ বলেছিলেন, 'বাবা ভৈরব, কিছু মনে কোরো না, কয়েকটি কথা বলি। যা বলবার আগেই বলেছি। আমি আর নিষেধ করব না। শুধু বলতে চাই, এই চাষের কাজে কত জিনিসের দরকার হয়, টুকি-টাকি এটা-ওটা। একসঙ্গে করতে গেলে অনেক খরচের ব্যাপার। এই ধরো লাঙল-গরু-গাড়ি—এসব নতুন করে করতে গেলে গৌরকে আবার জমি বিক্রি করতে হবে। মাথার ওপর চাষ রয়েছে। তুমি অন্তত এইটুকু বিবেচনা করো। আর একটা অনুরোধ, এই যে বাড়ি, সে তোমাদের পৈতৃক ভিটের ওপর। ওটা না-হয় আপাতত রেখে দাও, কিংবা তার জন্যে তুমি দশ কাঠা জমি বেশি নাও। ও নিয়ে আর দর-দাম কোরো না।'

পাঁচজন সবাই সায় দিয়েছিল গঙ্গাচরণের কথায়। ভৈরব আপত্তি করেনি। আসবাবপত্র সে ছেড়ে দিলো, দশ কাঠা জমির বিনিময়ে পৈতৃক ভিটের স্বত্ব ত্যাগ করল।

বাসন্তী সেদিন উনুনে হাঁড়ি চড়ায়নি। ভাগ-বণ্টন নিয়ে ছোট বৌ-এর সঙ্গে তার খানিকটা ঝগড়াও হয়ে গেছে। বাসন্তী বলেছিল, 'একটা লোক মুখে রক্ত তুলে খেটে সংসার চালালে, তা কেউ দেখলে না? একটুকুন জানে লাগল না?'

তার জবাবে ছোট বৌ নির্মলা বলেছিল, 'তার দাম উশুল করতে কম করেছে কেউ? রাবণের গুষ্টি পোষা হচ্ছে কোত্থেকে, শুনি?'

সে-কথা শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বাসন্তী। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আমার কৈলজ্যা ফেটে যেছে, সে-দুখ্যু কে বুঝবে! এইটুকুন থেকে নিজের হাতে মানুষ করয়াছি, জন্মের মতুন চলে যেছে, আর আজ আমাকে এই কথা শুনতে হলো!'

সে যাই হোক, সবকিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা হলো ঠিকঠাক। সাত বিঘে জমি আর সতীদীঘির সিকি অংশ কিনে নিলো সাম। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে ভৈরব-নির্মলা কলকাতায় ফিরে গেলো।

সাত

অবশেষে সিতাব ঠিক করল, যেমন করেই হোক টাকা যোগাড় করতে হবে। রেলের চাকরি ভালো চাকরি, ভৈরবদা বলেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা সামের কাছে গেলো সিতাব। বলল, 'আমাকে তিন শো টাকা দাও সামদা। সুদ যা লাগে, দিবো।'

সাম জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ অত টাকার দরকার হলো ক্যানে রে?'

'রেলে একটা চাকরির চেষ্টা কৈর্‌ছি সামদা। টিকিটবাবু কথা দিয়্যাছে। শো তিনেক টাকা দিলে হঞে যেতে পারে।'

'অত টাকা কুথা পাবো সিতু? আমি একেবারে ফতুর হঞে যেল্‌ছি রে। ভৈরবের জমি লিতেই আমাকে ধার-কজ্জ কৈর্‌তে হৈল্‌ছে। তুই বরং ছকু মোড়লের কাছে যা। সতীদীঘির অংশ কিনতে চাইছিল, টাকা আছে ওর কাছে।'

অতএব পরদিন সকালেই ছকু মোড়লকে ধরল সিতাব। সব শুনে চোখ কপালে তুলল সে। বলল, 'তুই খেপ্যাছিস সিতু! রেলের চাকরি, অত সুজা!'

'টাকা দিলে হঞে যাবে মোড়ল। আমাকে তিন শো টাকা দাও। চাকরি হলে দু'মাসেই শোধ করে দিবো।'

ছকু মোড়ল হাসতে থাকে। বলে, 'তা তো বুঝি বাবা সিতু। চাকরি হলে তোর গরম ছ্যাখে কে! দেখলি তো ভৈরবকে! সতীদীঘির চার আনা অংশ লিতে চাইল্যাম, তা দেখলি তো ব্যাটার দেমাক। ব্যাটা কিছুতেই রাজি হলো না। সব বিচে-খুচে ধেই ধেই করে গাঁ ছেড়ে চলে গেলো। ম'লেও হারামজাদার ঠাঁই হবে না, বুলে দিল্যাম, দেখিস। আর ওই শালা সিদ্‌নির (শকুনের) বাচ্চা সাম, দেখে লিবো শালাকে। ব্যাটার ভিট্যাতে ঘুঘু চরাব।'

সিতাব বলল, 'তা তুমি ছাড়ল্যা ক্যানে মোড়ল? তুমি মনে কৈর্‌লে—'

'তুই তো বুলবি সিতু। আমার রাজ্যের ঝামেলা। কত খরচ! সামের

মতুন তো আমার সুদের কারবার নাই! লোকের রক্ত চুষে খেছে দিনরাত। হারামজাদা চীন্যা জোঁক। তা যাক গে, কিন্তু তোর ব্যাপারটা সিতু—'

সিতাবের জমিজমা নেই, তার বাস্তুভিটেটুকুর দাম মনে মনে হিসেব করে ছকু মোড়ল।

সিতাব অনুনয়ের সুরে বলে, 'তিন শো টাকা দাও মোড়ল। কথা দিছি—'

'আর তোর কথা! যা দিনকাল! যে-ব্যাটাকে টাকা দিবি, সে-ব্যাটা যদি টাকাটা মেরে ত্থায়? চাকরি-বাকরি যদি না হয় তোর? কোত্থেকে দিবি টাকা?'

'যেমন করে হৈক্ দিবো।'

'না বাপু, অমনি অমনি তিন শো টাকা—'

সিতাব ভাবতে থাকে। চোখের সামনে কোনো উপায় দেখতে পায় না সে।

ছকু মোড়ল বলে, 'তিন শো পারব না বাপু। তোর যখন টাকার দরকার, না দিলেও লয়, দু'শো লে। বাকিটা তুই অন্য জায়গায় চেষ্টা করে ত্থাখ।'

'আর কুথাও পাবো না মোড়ল।'

'না বাপু, আমি দু'শোর বেশি পারব না। হাত বড় টান।'

অগত্যা দু'শো টাকাই হাত পেতে নিতে হয় সিতাবকে। একটা সাদা দলিলের কাগজে সই দিতে হয় ওকে। ছকু মোড়ল বলে, 'ইটা কিছু লয় সিতু। নামমাত্র। সই লিতে হয় লিল্যাম। তুই ভালো ছেলে। তুই কি আমার টাকা মেরে দিবি? না, আমি তোর ক্ষেতি কৈর্‌বো? টাকা শোধ হলেই ই-কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিবো।'

দু'শোর বদলে তিন শো দিতে হবে। এক বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে টাকা। সে যাই হোক, টাকা শোধ করে দিলেই সব মিটে যাবে। কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেই ল্যাঠা চুকে গেলো। টাকার দরকারটাই এখন আসল কথা। কিন্তু এখনও একশো টাকা যোগাড় হয় কোত্থেকে?

গাঁয়ে আরও কয়েকজনের কাছে ধরনা দিলো সিতাব। কিন্তু কে দেবে টাকা? দেওয়ার মতো লোক আছেই বা কে? যাদের টাকা আছে, তারা টাকার ব্যবহার জানে। কোথায় টাকা ঢাললে টাকা নষ্ট হবে না, অন্তত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই, বরং আরও পরিপুষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে, সে-কথা তারা ভালো করে বোঝে। বোঝে বলেই টাকা হয়, টাকা হয় বলেই লোক যায় তাদের কাছে টাকার জন্যে। ছকু মোড়লের মতো লোক তো সবাই নয় যে এক কথায় টাকা দিয়ে দেবে!

সিতাব খেতে বসেও খেতে পারে না, ভাত নাড়াচাড়া করে শুধু।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করে, 'তুমার কি হৈল্‌ছে বোলো তো?'

সিতাবের মেজাজ খারাপ। খেঁকিয়ে ওঠে, 'তুই কি বুঝবি? তুই চুপ করে থাক।'

'ক্যানে? চুপ করে থাকব ক্যানে? আমি মানুষ লয়? আমি বুঝি না কিছু?'

'বুঝিস তো বুঝিস। ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করিস না।'

রাগে সিতাব টাকার কথা ভুলে যায়। গোগ্রাসে ভাত গিলতে থাকে। ফুল্লরা আক্ষেপ জানায়, 'মানুষকে একটা কথা শুধালে দোষ হয়, জানি না বাবা। ক্যানে, এমন কি দোষ কর‍্যাছি, ক'দিন ভালো করে মুখ তুলে চাও না পজ্যন্ত।'

সব ভাত চেটেপুটে শেষ করল সিতাব। জলের গেলাস তুলে নিয়ে বলল, 'আমি শালা মাথায় কুকুরের ঘা নি ছুটে বেড়াছি, তোর মুখের দিকে চেঞে বসে থাকলে আমার ভাবনা ঘুচবে? দে না, তোর বাবাকে বুলে ক'টা টাকা এনে দে! সে মুর‍্যাদ আছে?'

ঢকঢক করে জল খায় সিতাব।

ফুল্লরা বলে, 'আমার বাবার মুর‍্যাদ নাই, তুমার তো আছে? তুমি তো রাজা-মহারাজা, তুমার আবার টাকার অভাব?'

হাত-মুখ আঁচাতে আঁচাতে সিতাব বলে, 'চুপ কর ফুলি। মেরে হাড় গুঁড়্যা করে দিবো। আমার মেজাজ খারাপ করিস না।'

মন ভালো থাকলে সব ভালো। সিতাবের মন খারাপ। কথায় কথায় ফুল্লরার সঙ্গে মা-র সঙ্গে ঝগড়া হয়। শালা টাকা —দুনিয়ায় টাকাটাই আসল।

শিবু বলে, 'তুই এক কাজ কর সিতু, অত ঝুট-ঝামেলার দরকার কি? তুই রামপুরহাট চলে যা। কাব্‌লিঅলার কাছ থেকে একশো টাকা নি লে। চাকরি তো হবে। দু'মাসেই শোধ করে দিবি।'

সিতাব আশার আলো দেখতে পায়। বলে, 'খুব সুদ যে শিবুকাকা?'

'মাসে টাকায় দু'আনা। তা তোর ক'টা টাকা বেশি লাগবে দু'মাসে। কিন্তু লোকের কাছে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে তো হবে না!'

'তা তুমি মন্দ বোলোনি কাকা।'

'দাঁড়া, আমি খোঁজ লিছি। গাঁয়ে বেশ ক'জন লেয়। ওদের বুলে-টুলে ব্যবস্থা করে দিছি তোর।'

আর আশ্চর্য, ভগবান যখন সমস্যার সমাধান করেন, তখন এভাবেই করেন। শিবুর পরামর্শ দেওয়ার দু'তিন দিনের মধ্যেই, একদিন সিতাব মাঠে লাঙল বইতে বইতে দেখল, সাইকেলে চড়ে মাথায় পাগড়ি এক লম্বা কাবুলিওয়ালা গাঁয়ে ঢুকছে। ঠিক যেন ভগবানের সেপাই। সিতাব মাঠে লাঙল রেখে তক্ষুণি গাঁয়ে ছুটল। কাবুলিওয়ালার পিছু ধরল সে। কিন্তু কাবুলিওয়ালা যেন সুদের কারবার করে না, তার কারবার অন্য কিছু। বলে, 'কা মাঙ্‌তে হো তুম?'

সিতাব অনুনয় করে, 'টাকা। কাব্‌লিঅলা, টাকা। একশো টাকা দাও ভাই আমাকে।'

'রূপয়্যা ? রূপয়্যা নেই হামারা পাশ। যাও যাও। বাগো। রূপয়্যা কাঁহা সে মিলেগা ?'

'দাও না একশো টাকা। খুব দরকার। রেলের চাকরির লেগে দরকার। দু'মাসেই দিঞে দিবো।'

'ঝুট বাত্। তুম্লোগ সব বদমাশ। ছুদ্ নেই দেতা। হাম্কো দেখ কর্ বাগতা হো তুম্লোগ। তুম্লোগকো রূপয়্যা নেই দেগা।'

'আমি সুদ দিবো কাব্লিঅলা। সুদ দিবো। তুমি যা চাও—'

অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তবে রাজি হয় সে। গাঁয়ে দু'চারজন টাকা নিয়েছে তার কাছ থেকে, কিন্তু কেউ টাকা ফেরত দিতে চায় না। এমন কি সুদও দেয় না ঠিকমতো। তাকে গাঁয়ে ঢুকতে দেখলেই কে কোথায় লুকিয়ে পড়ে। তাই সে আর শুধু শুধু কাউকে টাকা দিতে রাজি নয়। জামিনদার চায়। সাম মোড়ল, ছকু মোড়ল, নিবারণ বাঁড়ুজ্যে —এরা যদি কেউ দিতে বলে, তবে সে টাকা দেবে। অনেক আশা নিয়ে সিতাব গেলো তাদের কাছে। কিন্তু কাবুলিওয়ালার সামনে আসতে কেউ রাজি নয়। সারা গাঁয়ে একজনও জামিনদার পাওয়া গেলো না। কাবুলিওয়ালাব কাছেও টাকা হলো না সিতাবের।

তারপর একদিন রমজানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে হাজির হলো সিতাব। রমজান গরু-ছাগলের ব্যবসা করে। সে গরুটার লেজ ধরে তেজ দেখল, শিঙ ধরে টানাটানি করল, দুই চোয়াল ফাঁক করে দাঁত গুনে দেখল। তারপর পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাল সে। বলল, 'তুমি বাপু আর ক'টা দিন থুতে পারলে ভালো দাম পেত্যা। এই তো সবে চার দাঁত, ছ'দাঁত না হলে দোয়ানো* যাবে না। আখুন বাজারও খুব মন্দা। এমন ভালো জিনিসটা পানির দরে বিচে দিব্যা! আমি বুলি কি, তুমি আর ক'টা দিন সবুর করো।'

সিতাব বলল, 'আমার যে খুব টাকার দরকার রমজানচাচা।'

'তা তো বুঝল্যাম। কিন্তু বাজার যে খুব মন্দা বাপ। একেবারে ডাউন। অ্যাদ্দিন যখুন পুষ্যাছো, আর ক'টা দিন, বাজার ঠিক উঠবেই। আমিই তুমার জিনিস বিচে দিবো, কথা দিল্যাম।'

সিতাব হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কত দাম হবে আখুন ?'

'আখুন ? ধরো, আর মাস দু'তিন যদি সবুর করত্যা, কম-সে-কম চার কুড়ি সাড়ে চার কুড়িতে যেত। আখুন তো আড়াই কুড়ির ওপরে যাবে না। তার ওপর খদ্দের পাওয়াই মোশকিল।'

অনেক ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত রমজান তিন কুড়িতেই নিতে রাজি হলো। ফুল্লরা দাওয়ার খুঁটি ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিতাবের মা দু'একটা প্রতিবাদ

* গরু-মোষকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর আগে প্রশিক্ষণ দিয়ে নেওয়া।

করতে এসেছিল, সিতাবের রুক্ষ মেজাজ দেখে চুপ করে গেছে। নগদ ষাট টাকা গুনে দিয়ে রমজান গরু খুলে নিয়ে গেলো।

ফুল্লরা বলল, 'মানুষের যখুন সব্বোনাশ হয়, তখুন কারোর বাক্যি কানে ঢোকে না। জানে দয়ামায়া বুলতেও নাই! আবুলা জীবটাকে ঘরের বার করে দিল্যা তুমি।'

টাকাগুলো তখনও সিতাবের হাতের মুঠোয়। গরু বিক্রি করে এমনিতেই তার মন খারাপ। তার ওপর এখনও চল্লিশ টাকা!

সিতাবের মা গজগজ করছিল, 'অলপ্পেয়ে মিন্সা! একটা কথা কানে তুললি না! কি ছেলেই আমি প্যাটে ধর্‌য়াছিলাম! সাধে তোর বাপ বুলত, ছেলে ছেলে কৈর্‌ছো সিতুর মা, ওই ছেলেই তুমার কাল হবে। তখুন বুঝিনি, আখুন বুঝছি হাড়ে হাড়ে। প্যাটে আমি ছেলে ধরিনি, শত্তুর ধর্‌য়াছিল্যাম।'

সিতাব দাওয়ায় ফিরে এসে, গর্জন করে তাকাল মা-র দিকে। বলল, 'বেশি বকবক কৈর্‌বি তো এই টাকা সুদ্ধ্যা হাত আখায় ভরে দিবো।'

'দে ক্যানে! তাই দে। তাহলে আমার হাড় জুড়্যায়। শুধু হাত ক্যানে, তুই নিজেও ঢোক আখায়, আমার জান ঠাণ্ডা হৈক্, কৈল্‌জ্যা ঠাণ্ডা হৈক্!'

সত্যিই, সিতাব লাফ মেরে উনুনের কাছে গেলো। বলল, 'তবে এই লে। তোর জান ঠাণ্ডা হৈক্, তোর কৈল্‌জ্যা ঠাণ্ডা হৈক্। এই লে তোর টাকা।'

ফুল্লরা ছুটে গিয়ে সিতাবের ডান হাতটা চেপে ধরল, 'আঃ, কি করো! তুমার কি মাথা খারাপ হৈল্‌ছে? ওগো, তুমি কি পাগল হৈল্‌ছো?'

সিতাব জোর করে হাতটা উনুনে ভরতে যায় —'ছাড় তুই। ছেড়ে দে।'

ফুল্লরা আলুথালু হয়ে সিতাবকে বাধা দিতে থাকে। সিতাবের সব রাগ গিয়ে পড়ে ফুল্লরার ওপর। টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। তারপর ফুল্লরার চুলের মুঠি ধরে দুমদুম করে কিল মারতে শুরু করে ওর পিঠে।

ফুল্লরা বাধা দেয় না। সব আঘাত পিঠ পেতে নিতে নিতে বলে, 'মারো। মেরে ফ্যালো আমাকে। শোধ মেরে ফ্যালো। এক্ষুনি মেরে ফ্যালো। মা-কালীর দিব্যি —মা দুগ্‌গার দিব্যি —মেরে ফ্যালো। তুমার হাতে মরে আমি সগ্‌গে যাবো।'

রাতে ফুল্লরাকে বুকের কাছে টেনে নেয় সিতাব। বলে, 'ফুলি, তুই কি একটা জিনিস লিবো বুলছিলি?'

ফুল্লরা সিতাবের গলার কাছে মুখ রেখে বলে, 'তারই লেগে তুমি গরু বিচ্‌ল্যা?'

'না। সেই রেলের চাকরিটার লেগে। চাকরি হলে তোকে ঠিক জিনিস কিনে দিবো।'

'সে-তো অনেক টাকা বাপু। তুমার ওতে কি হবে?'

'হৈল্ছে। আর কেবল চল্লিশ টাকা হলে হয়।'

'কুথা পেল্যা?'

'পেয়্যাছি। ধার কর্যাছি। চাকরিটা হলে দু'মাসেই শোধ করে দিবো। তোর একটা ভালো কাপড় নাই পজ্যন্ত, মা-র কত কষ্ট! ভৈরবদা বুলছিল, ই-ভাবে মুনিষ খেটে সংসার চালানো যায় না। কবে শালা কাজ হয়, কবে কাজ হয় না! দেখ্যাছিস, ভৈরবদার বৌ কেমন সুন্দর শাড়ি পরে ছিল!'

'ওরা বড়লোক। ওদের অনেক টাকা।'

'আমার চাকরি হলে আমাদেরও টাকা হবে। ভালো কাপড়-চোপড় কিনতে পারব, কাজ কাজ করে ছুটে বেডাতে হবে না। আমাদের ছেলেপিলেরা লেখাপড়া শিখবে, ভালো চাকরি-বাকরি কৈর্‌বে। আর রোজ এই মুনিষ খেটে শালার পেটই ভরে না!'

ফুল্লরা সিতাবের মাথার চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে থাকে। সুখের স্বপ্ন দেখে।

আট

সর্বসাকুল্যে দু'শো ষাট। চল্লিশ টাকা আর কিছুতেই যোগাড় হলো না। অনেক চেষ্টা করেও না। সেদিন রাত্রিবেলা এক পশলা বৃষ্টি হলো। রাস্তাঘাট বেশ কাদা। মাঠে এখন দু'দিন লাঙল দেওয়া যাবে না। অতএব সিতাব সেদিন সকাল-বেলাতেই টিকিটবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলো।

গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় নিবারণ বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা। বলল, 'সিতু, তোর বাছুরটা বিচে দিলি? কাল রমজান নি যেছিল দেখল্যাম।'

সিতাব বলল, 'হ্যাঁ জ্যাঠা।'

'কতোতে দিলি? পাঁচ কুড়ি?'

'না জ্যাঠা। সাড়ে তিন কুড়ির ওপরে কিছুতেই উঠল না। লিতেই চাইছিল না।'

'কি বুললি? সাড়ে তিন কুড়ি! আর রমজান আমাকে বুললে পাঁচ কুড়ি। ছি-ছি, অমন বাছুরটা ওই দামে কি আক্কেলে দিঞে দিলি তুই? আমাকে এক কথা শুধালি না! ই-বছর গরু কিনতে হবে আমাকে। তা চার কুড়ি সাড়ে চার কুড়ি আমিই দিত্যাম তোকে।'

'কি করে জানব জ্যাঠা তুমার গরুর দরকার!'

'রমজানের কাছে চাইল্যাম বাছুরটা। বুলল্যাম, আমাকে দিঞে যা, গাঁ-ঘরের জিনিস, জানাশুন্যা—তা সাড়ে পাঁচ কুড়ির কমে কিছুতেই নামতে চায় না!'

সিতাবের মনটা খারাপ হয়ে যায়। মনে মনে হা-হুতাশ করতে করতে স্টেশনের দিকে পা বাড়ায় সে। ভবতোষবাবু স্টেশনেই ছিলেন। সিতাবকে দেখেই বললেন, 'আয় সিতু, আয়। এতদিন আসিসনি কেন? কি খবর?'

সিতাব বলল, 'আপনার সাথে দরকার ছিল কাকাবাবু।'

'ও। সেজন্যে এসেছিস বুঝি? একটু দাঁড়া —এক মিনিট।'

একটা বড় খাতা খুলে কি যেন লিখছিলেন ভবতোষ। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, 'আয়।'

স্টেশন থেকে নেমে একটু নিরিবিলিতে গিয়ে দাঁড়াল তারা। ভবতোষ জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা যোগাড় করতে পেরেছিস?'

সিতাব বলল, 'সব পারিনি কাকাবাবু।'

'কতো পেরেছিস?'

'দু'শো ষাট।'

'তিন শো-ও পারলি নে পুরো? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করে দেখি। তোকে আমার বড পছন্দ রে। অন্য কেউ এ-চান্স পেলে তো এখুনি হাজার টাকা দিয়ে লুফে নেয়। যাক গে, এনেছিস টাকাটা?'

এমন সময় টেলিফোন বাজতে থাকে। তারপরই শিউপ্রসাদের গলা, 'হ্যালো —হ্যালো —হাঁ হাঁ —বলিয়ে—'

ভবতোষ বিচলিত হন। বলেন, 'একটু দাঁড়া সিতু। আমি এক্ষুনি আসছি।'

ভবতোষ প্রায় ছুটতে ছুটতে যান টেলিফোনের রিসিভার ধরতে।

একটু পরে ফিরে এসে বলেন, 'হ্যাঁ, তা টাকাটা এনেছিস সিতু?'

'এন্যাছি।' সিতাব জামার পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে। ভবতোষ প্রায় ছোঁ মেরে টাকাগুলো হাতে নেন। না গুনেই পকেটে ভরে ফেলেন, জিজ্ঞেস করেন, 'ঠিক আছে তো? দু'শো ষাট? আচ্ছা, তুই আয় আমার সঙ্গে। কাউকে বলবি নে, বুঝলি? অনেকেই চেষ্টা করছে।'

ভবতোষের সঙ্গে সঙ্গে সিতাব আবার স্টেশন-ঘরে ফিরে আসে। একটা সাদা কাগজে ভবতোষ লিখে নেন —শ্রীসিতাব মণ্ডল, পিতা —৺মহাদেব মণ্ডল, গ্রাম ও পোষ্ট অফিস —সাদিনপুর, থানা —রামপুরহাট, জিলা —বীরভূম। তারপর বলেন, 'তুই তোর কাকীমার সঙ্গে দেখা করে যা সিতু।'

সিতাব কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ায়। মনে বেশ ফুর্তি। চাকরিটা হয়ে যাবে। চাকরি হয়ে গেলে সে-ও বাবুদের মতো জামা-কাপড় পরে বেড়াতে পারবে। সম্মান বাড়বে তার। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে কোয়ার্টারে এসে দেখে, বারান্দায় পড়তে বসেছে ছেলেমেয়েরা। বুধি, লখী, বাবলু —সবাই। সিতাবকে দেখে লখী প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'মা, সিতুদা এসেছে। সিতুদা।'

তারকেশ্বরী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। হাসিমুখে বললেন, 'ও মা, সিতু যে! কি খবর? এতদিন পর?'

সিতাব বলল, 'কাকাবাবুকে দেখা কৈরুতে এস্যাছিল্যাম।'

'সেই কাজের জন্যে? আমি বলেছি সিতু। উনি চেষ্টা করবেন। বসো বাবা, বসো। আমি রান্নাঘরে রয়েছি। বসো একটু।'

বুধি এতক্ষণ আড়চোখে দেখছিল সিতাবকে। তারকেশ্বরী চলে যেতেই বলল, 'আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না সিতুদা।'

সিতাবের গলায় কথা আটকে যায়। ঢোক গিলে বলে, 'ক্যানে?'

'এমনি, আমার খুশি। দেখো, আমি তোমার সঙ্গে যদি কক্ষনো কথা বলি—'

সিতাব ভেতরে ভেতরে ঘামতে থাকে। কোনো কথা খুঁজে পায় না। যে দুরন্ত গোঁয়ারগোবিন্দ সিতাব, তার তেজ শুধু ফুল্লরার কাছেই।

বুধি বইয়ের পাতায় চোখ নামায়। তারপর এক সময় উঠে যায় ভেতরে।

লখী ফিক করে হাসে। বলে, 'দিদি খুব রাগ করেছে।'

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'ক্যানে? রাগ কর‍্যাছে ক্যানে?'

'বা রে, তা আমি কি করে বলব? সেকথা দিদি জানে।'

সিতাব নিরুত্তর।

বাবলু বকবক করে কি সব বকে যায়। সে-সব কানে ঢোকে না সিতাবের।

এমন সময় বুধি আসে চা নিয়ে। ডিসের ওপর চায়ের কাপ, পাশে দু'খানা বিস্কুট। কাছে এসে ডিসটা বাড়িয়ে দেয় সিতাবের দিকে। তবু সিতাব কোনো কথা বলতে পারে না। নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয় তার।

অবশেষে বুধিই সমস্যার সমাধান করে। জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আমায় কি দেবে বলেছিলে সিতুদা?'

সিতাব আমতা আমতা করে। কিছুতেই মনে পড়ে না। বুধি হেসে ফেলে। বলে, 'শালিকের ছানা এনে দেওয়ার কথা ছিল না তোমার?'

সিতাব হেসে বলে, 'ও, সেই কথা! তা এনে দিবো দিদিমণি। শালিকের ছানা তো সব সময় পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে ঠিক এনে দিবো তুমাকে।'

'কথা দিচ্ছ, মনে থাকে যেন।'

'হ্যাঁ দিদিমণি, ঠিক মনে থাকবে আমার।'

বাবলু বলে, 'আমাকেও একটা শালিকের ছানা দিতে হবে।'

খিলখিল করে হেসে ওঠে বুধি। বলে, 'কি দুষ্টু ছেলে রে বাবা! তোর জন্যেই তো বলেছি। তুই নিবি ওটা।'

বাবলু খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'বাঃ, কি মজা!'

এমন সময় মাস্টার মশাই আসেন। বলেন, 'কে? সিতু নাকি? এদিকে কোথায়?'

সাদিনপুর স্কুলের শিক্ষক নিকুঞ্জ চক্রবর্তী। বুড়ো মানুষ। চোখে নিকেলের

ফ্রেমের চশমা। সিতাবও তাঁর কাছে পড়েছে ছোটবেলায়। এখানে লখী আর বাবলুকে পড়াতে আসেন।

সিতাব জবাব দেয়, 'এদিকেই এস্যাছিলাম সার।'

তিনি বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের ভৈরব তাহলে সব বিক্রি-টিক্রি করে চলে গেলো?'

সিতাবের তখন চা খাওয়া হয়ে গেছে। উঠি-উঠি করছে। বলল, 'হ্যাঁ সার।'

'ভালো হলো না বাপু। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী —আহা-হা-হা, সেই জন্মভূমি ছেড়ে চলে গেলো হতচ্ছাড়াটা!'

'সবাই মানা কর‍্যাছিল সার।'

'আমার কাছে হাতেখড়ি, বুঝলি সিতু। তা ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, ওর ভাগ্য খুলেছে। ভালো চাকরি-বাকরি পেয়েছে। সেটা তো আমাদের গর্ব। কিন্তু এতদিন পর গাঁয়ে এলো, একবার দেখা করল না! এত শীগ্‌গীর চলে যাবে জানলে আমি নিজেই দেখা করতে যেতাম। তাতে আমার অপমান হতো না।'

সিতাব উঠে দাঁড়ায়। কোনো জবাব দেয় না সে।

নিকুঞ্জ চক্রবর্তী বলতে থাকেন, 'আমি বুড়ো মানুষ। আজ আছি, কাল নেই। নিজের হাতে যাদের মানুষ করেছি, তাদের দেখতে বড সাধ যায় রে। যদি একবার দেখা করে যেত—'

সিতাব বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, সে যখন চাকরি করবে, আরও ভালো চাকরি, বাইরে থাকবে, গাঁয়ে ফিরলে সবার আগে মাস্টার মশাইদের সঙ্গে দেখা করবে সে। তাঁরা বলবেন, সিতু ছোঁড়াটা মানুষের মতো মানুষ হয়েছে।

নয়

দেখতে দেখতে বর্ষা আসে। আষাঢ়-শ্রাবণ। সারা মাঠ জলে থৈ থৈ। আনন্দে কোলাহল করতে করতে জলে-কাদায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সাদিনপুরের মানুষেরা। কেউ মাঠে লাঙল দেয়, কেউ কেউ বিচুন (ধানগাছের চারা) তুলতে থাকে জলে কোমর ডুবিয়ে। কাজ আর কাজ।

কাজ করতে করতে গলায় সুর ওঠে গুনগুন করে। তারপর সুর ক্রমশ মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

এখন সিতাবের বড় ফুর্তি। মাঠের কাজ শুরু হলে তার দাম বেড়ে যায়। তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে সবাই। কিন্তু এখন নিজের দাম বাড়াবার উপায় কোথায় সিতাবের! ছকু মোড়ল তার উপকার করেছে, টাকা ধার দিয়েছে। তার কাজ আগে। সাম মোড়ল বাড়ি এসে রাগারাগি করে। বলে, 'সিতু, আমরাও গাঁয়ের লোক রে। আমাদের দিকেও একটুকুন চেঞে ছাথ।'

গঙ্গাচরণ এসে অভিমান করেন। বলেন, 'আমাকে কেউ ত্যাখে না সিতু। কেউ মুনিষ দিতে চায় না। আমার তো টাকা-পয়সা নেই, কাউকে দিতে-থুতে পারিনি। আমার জমিগুলো অনাবাদী থেকে যাবে রে!'

সিতাবের মা বলে, 'ঘোষ ডাক্তোরকে দু'দিন দে সিতু।'

সিতাব বলে, 'ছকু মোড়ল ছাড়তে চায় না যে গো খুড়ো!'

গঙ্গাচরণ বলেন, 'এসময় কি কেউ কাউকে ছাড়ে রে! একদিন সময় করে দে। আমার দিকে কে আর চোখ তুলে তাকাবে বল!'

গঙ্গাচরণ লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করে চলে যান।

ফুল্লরা বলে, 'খুড়ো খুব ভালোমানুষ।'

সিতাব বলে, 'তা তো বুঝল্যাম। আমার কি সাধ যায় না? কিন্তু ব্যাটা ছকু যে কথা শুনতে চায় না।'

ফুল্লরা আর কিছু বলে না। ছকু মোড়ল তিন বিঘে জমি দিয়েছে সিতাবকে ভাগচাষে। সে-সব জমি আবাদ করতে হবে। সিতাবের নিজের লাঙল-গরু নেই, গেরস্থের ওপরই ভরসা। ছকুর কথা না শুনলে জমি চষতে লাঙল-গরু দেবে না সে। যদি দেয় তো একেবারে শেষে। তাতে ফলন কম হবে। লোকসানটা কম নয়। তার ওপর জমিতে সার-মাটি দেওয়ার জন্যেও ছকুর কাছে ধরনা দিতে হবে। সিতাব তো আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাবে না! চাষাবাদের জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে, কো-অপারেটিভ থেকে টাকা পাবে ছকু মোড়লেরা, যারা জমির মালিক, তারা। ভাগচাষীদের কেউ চেনে না। জমিতে সার-মাটি দেওয়ার জন্যে ভাগচাষীকে নির্ভর করতে হয় জমির মালিকের ওপর। ধারে টাকা দেয় তারা। নতুন ধান উঠলেই টাকার দরুন ধান নিয়ে নেয়। তখন ধানের বাজার-দরও ভালো থাকে না। তাই কম গুনাগারটা দিতে হয় না সিতাবের মতো ভাগচাষীদের।

তাছাড়া সম্পন্ন গেরস্থেরা জমি ভাগচাষে দেয় সময়ে মুনিষের জন্যেই। জমি দিয়ে বেঁধে রাখে তাদের। আগে জমিদারেরা বেঁধে রাখত, এখন রাখে জোতদারেরা —এই সাম মোড়ল, ছকু মোড়ল, নিবারণ বাঁড়ুজ্যেরা। তফাতটা সামান্যই। সুতরাং ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী, ছোট কৃষক —যারা নিজেদের সামান্য জমিটুকু আবাদ করে অন্যের জমিতে জন-মজুরের কাজ করে, তারা, এই অনুকূল সময়কেও নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারে না। ব্যবহার করার সুযোগই পায় না। তাদের সে-অধিকার অনেক আগেই কেড়ে নেওয়া হয় নানা কৌশলে। অতএব জীবন-যাপনের সামগ্রীর প্রাচুর্য তাদের জীবনে কখনোই আসে না, তবু এই দিনগুলিই তাদের কাছে সুখের —সুখ বলতে তারা বোঝে সপরিবারে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়া।

কিন্তু সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। এক সময় তাদের কাজের দিন আনন্দের দিন শেষ হয়। আবার

আসে সেই নিষ্ঠুর সময়। ভাদ্র-আশ্বিন। যে-সময়ের কথা ভাবতে গিয়েই শিউরে ওঠে দিন-মজুরেরা। আবার পেটের খিদে নিয়ে ছুটে বেড়ানো। চারটি ধান দাও মোড়ল। দু'টো টাকা দাও। এ বড় কঠিন সময়। অনুনয়-বিনয় কারোর কানে সহসা ঢোকে না।

সিতাব সেই যে টাকা দিয়ে এসেছে ভবতোষবাবুকে, এখনও কাজের কোনো খবর নেই। শুধু একবার গিয়ে একটা দরখাস্তে সই করে এসেছে, ব্যস্। তারপর মাঝে দু'তিনবার গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছে। ভবতোষ বলেছেন, 'আমি যা করার করেছি সিতু। কখন খবর আসে গ্যাখ।'

কিন্তু খবর আসে কোথায়! ভৈরবের কথা মনে পড়ে। সিতাবের মনে আশঙ্কা দানা বাঁধে। টাকাটা মেরে দিলো না তো!

সিতাবের রাগ হয়। আর ক'টা দিন দেখা যাক।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে ফুল্লরাও। রাত্রে স্বামীকে একান্ত কাছে পেলে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ গো, তুমার সেই চাকরির কি হলো?'

সিতাবের তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'ধেত্তেরি! সব শালা জুয়্যাচ্চোর।'

'তাহলে টাকাগুলিন জলে গেলো?'

সিতাব জবাব দেয় না।

'তুমি টিকিটবাবুকে দেখা করো না ক্যানে? বুলিও, চাকরি না হলে টাকা ক'টা ফেরত দিক। অতগুলিন টাকা!'

'শালা বোলে তো, যা ব্যবস্থা করার কর‍্যাছি। ওপর থেকে চিঠি আসবে।'

'কবে চিঠি আসবে?'

'ভগবান জানে।'

'না বাপু, আমার কেমন সন্দ হয়। টিকিটবাবু হয়তো কিছুই করেনি। খামোখা টাকাগুলিন মেরে দিলে।'

সিতাবের মেজাজ চড়ে। বলে, 'মেরে দিলেই হলো। দাঁড়া না, আর ক'টা দিন দেখি। নাহলে বুলবো, আমার চাকরির দরকার নাই। টাকা ফ্যালো। টাকা না দিলে ঘাড় ভেঙে দিবো শালার।'

'না বাপু, অমন হুজ্জোত-হাঙ্গামা করিও না। বরং গাঁয়ের পাঁচজনকে ডেকে যা হয় করিও।'

সিতাব চুপ করে থাকে। কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত কেটে যায়। সিতাবের চোখের ঘুম নষ্ট হয়। ভাবতে থাকে। চাকরিটা হলে ভালো হতো। অতগুলো টাকা ধার করেছে ছকু মোড়লের কাছ থেকে। চাকরি না হলে কিভাবে শোধ করবে সে?

ফুল্লরা বলে, 'ধান তো শেষ হঞে এলো। খুব জোর টেনে-টুনে আর দশ-পনেরো দিন। কাজ-টাজ গ্যাখো না কুথাও।'

সিতাব বলে, 'গাঁয়ে কাজ কুথা ?'

'অন্য জায়গায় দ্যাখো চেষ্টা করে।'

'দেখতে হবে।' কথায় সায় দেয় সিতাব।

আবার কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত কাটে। তারপর এক সময় ফুল্লরা সিতাবের কাছে সরে আসে। আরও নিবিড় হয়। সিতাবের গলার কাছে হাত বুলোতে থাকে। ফুল্লরার নাকের গরম নিশ্বাস লাগে সিতাবের বুকে।

ফুল্লরা অন্তরঙ্গ গলায় বলে, 'এবার বাপু আমাকে ক'টা টাকা দিতে হবে।'

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'ক্যানে ? জিনিস কিনবি ?'

'না। মানত কর‍্যাছি। সিদ্দিবালিতে।'

'কিসের মানত ?'

'সে তুমাকে শুনতে হবে না। তুমি কিছু বুঝো না '

'হ হ, আমি কিছু বুঝি না।' সিতাবের রাগ হয়। আর এক দিকে ফিরে শোয়।

সিতাবকে জোরে চেপে ধরে ফুল্লরা। বলে, 'অমনি রাগ হঞে গেলো ! খালি খালি রাগ !'

'থাক, তোকে আর বুলতে হবে না।'

'ক্যানে, তুমি বুঝতে পারো না কিসের মানত ?'

সিতাবের রাগ পড়ে না। বলে, 'না। আমার বুঝে কাজ নাই।'

'তা-ও শুধু শুধু রাগ করে।' ফুল্লরা সিতাবকে বোঝায়, 'আমার একলা থাকতে ভালো লাগে ? তুমিই বোলো। আখুনো কোল খালি। তুমার তো উসব ভাবনা-চিন্তা নাই। এদিকে পাঁচজনে পাঁচ কথা বুলছে।'

সিতাব বুঝতে পারে। এক এক সময় তারও ভাবনা হয় বৈ-কি ! এতদিন হলো, এখনও ফুল্লরার ছেলেপিলে হলো না ! কখনো কখনো তার মনে হয়, ফুল্লরা বাঁজা নয় তো। সিতাবের দুঃখ হয়। বলে, 'কখুন লাগবে তোর মানত ?'

'আখুন লয়। ই দু'মাস যাক। তারপর একদিন মা-কে সাথে নি যাবো।'

'তাই যাস।'

ফুল্লরার দিকে ফিরে শোয় সিতাব। লম্ফর মৃদু আলোয় ফুল্লরার মুখখানি বড় সুন্দর দেখায়। অনেকটা বুধির মতো। ফুল্লরার চিবুকে ঠোঁট ছোঁয়ায় সে। ফুল্লরা হাত বাড়িয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দেয়।...

ক্লান্ত অবসন্ন সিতাব এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ফুল্লরা জেগে থাকে বিনিদ্র চোখ মেলে। অন্ধকারে সিতাবের দিকে তাকায়। বড় ভালো সিতাব —বড় ভালো। ফুল্লরার ভাবতে ভালো লাগে, হয়তো এবার কেউ আসবে। ঠিক সিতাবের মতো —সিতাবের মতো চুল, সিতাবের মতো মুখ, সিতাবের মতো দুষ্টু, —হুবহু সিতাবের মতো।

দশ

কিন্তু কেউ আসে না। হতাশা —হতাশা। হতাশা ফুল্লরার মনেও, সিতাবের মনেও।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ভাদ্র-আশ্বিন শেষ হতে চলে। কাজের জন্যে সাদিনপুরের মানুষেরা ছুটে বেড়ায় এখানে ওখানে। কাজ পায় না। বাড়ির যা কিছু তৈজসপত্র, সব নিয়ে গিয়ে ধরনা দেয় সাম মোড়লের কাছে। সাম মোড়ল প্রাণপণ চেষ্টায় মানুষের দুঃখ দূর করে। এক সময় ছকু মোড়ল তার ধানের মরাই খুলে দেয়। দু'হাতে ধান বিলোয় গাঁয়ের লোকদের। গাঁয়ের লোকেরা খেয়ে বাঁচে। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে সাম মোড়লকে ছকু মোড়লকে। এখন প্রচণ্ড অবকাশ। তাই রোজ গানের আসর বসে হাড়ি পাড়ায়। শীতল জগতকারু শাড়ি পরে, মুখে পাউডার ঘষে, আলতা দিয়ে ঠোঁট রাঙায়। নেচে নেচে সিনেমার গান গায় শীতল—

মাধবীর কানে কানে কহিছে ভ্রমর—
আমি তুমারি, আমি তুমারি।

মেয়ে-পুরুষের ভিড়ে গানের আসর জম-জমাট হয়ে ওঠে। রাধা মেয়েদের দলের একেবারে সামনে বসে। অপেক্ষা করতে থাকে সে। তারপর এক সময় জগতকারু গাইতে উঠলে তার চোখ দু'টো আনন্দে চিকচিক করে ওঠে।

গানের ফাঁকে ফাঁকে আসরে শ্রোতাদের মধ্যে নানারকম আলোচনা হয়। এখন তাদের কাছে যথেষ্ট উত্তেজনার খবর ছকু মোড়ল আর সাম মোড়লের মধ্যে মামলা। সতীদীঘির অংশের জন্যে সামের বিরুদ্ধে ছকু মোড়ল মামলা করেছে। প্রি-এম্প্‌শন স্যুট। তাই নিয়ে আলোচনা হয়।

'তা বাপু ইটা ছকুর অন্যায়। ল্যায্য পয়সা দিঞে কিন্যাছে সাম। খামোখা তুমি ওর ওপরে মামলা কৈর্‌তে গেলা ক্যানে?'

'আরে, ল্যায্য পাওনা ছকু মোড়লের। ই-মামলায় উ জিতবেই। পেরেম্‌শুন স্যুট, বুঝল্যা হে! সামের তো দীঘিতে অংশ ছিল না, তার ভিতর উ মাথা ঢুক্যাতে গেলো ক্যানে? বিবাদ বাধাতে গেলো ক্যানে? আইনে হেরে যাবে সাম।'

একজন বলল, 'সাম ব্যাটাচ্ছেলেও কিন্তু কম বুদ্ধিমান লয়। কিন্যাছে ধরো পাঁচ হাজারে, দলিলে দাম ফেল্যাছে আট হাজার। ছকুকে আট হাজারই কোর্টে জমা দিতে হৈল্‌ছে। সাম তো জানতই, ছকু সহজে ছাড়বে না। আখুন ধরো, সাম যদি হেরে যায়, দীঘির অংশ পাবে ছকু, কিন্তু সাম পাবে আট হাজার টাকা। হাতে হাতে শালা তিন হাজার টাকা লগদ লাভ।'

অন্য একজন বিস্ময় প্রকাশ করে, 'বোলো কি হে, জিতলেও লাভ, হারলেও লাভ?'

'ছকু মোড়লের এক গোঁ, টাকা যা খৈস্যবে খসুক, সতীদীঘিতে সামকে নখ ডুব্যাতে দিবো না।'

'আবার উদিকে সামও কি বুলছে জানো ? বুলছে, ছকুকে এবার সাত ঘাটের জল খাওয়াব।'

একজন পরম বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করে, 'গাঁয়ে যখুন মামলা ঢুক্যাছে, তখুন এবার বাপু লক্ষ্মীর আসন টলল। হুঁ, বুলে থুল্যাম।'

ওদিকে তখন জগতকারু পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে নেচে গান গায় —'তিন কন্যা জলকে যায় কার বা কেমন রূপ !' গান গাইতে গাইতে ব্যগ্র চোখে আসরের মধ্যে রাধাকে খোঁজে সে।

এ ভাবেই দিনরাত্রি কাটে সাদিনপুরের।

তারপর যখন সব আশা মরে যায়, একঘেয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে, অসম্ভব কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছেড়ে দেয় সবাই, তখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আবার দানা বাঁধে ধানের সবুজ শিষে শিষে। হেমন্তে হলুদ ছড়ায় ক্রমশ মাঠ জুড়ে। মানুষগুলো তখন আবার দিন গোনে। আবার পেট ভরে ভাত খাওয়ার মতো সুখের কথা ভাবতে থাকে।

আর তখনই হঠাৎ সুখবর আসে সিতাবের। নিতান্ত সাদামাটা ভাবে। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধা বহু দামী মণি-মুক্তোর মতো।

পোস্টাপিসের পিয়ন এসে দিয়ে যায় একটা বাদামী রঙের কাগজ। ভাঁজ করে আঠা লাগানো। ডাকটিকিটের ওপর পোস্টাপিসের কালো ছাপ। ওপরে ইংরেজিতে লেখা: Shri Sitab Mondal, Vill+P.O.—Swadinpore, Dist.—Birbhum, W.B.

আশ্চর্য! আশ্চর্য! অত বড় খবর কি-না এক চিলতে শুকনো পাতার মতো কাগজে! নিশ্চয়ই চাকরির খবর। সবাই অবাক বিস্ময়ে কাগজটাকে দেখে। সিতাবের মা দেখে, ফুল্লরা দেখে। কারোর মুখে বাক্যি সরে না। পাড়ার দু'চারজনও এসে ভিড় করে। কিসের চিঠি হে? মামলা-মোকদ্দমা নয় তো? তা যতক্ষণ চিঠি না পড়া যায়, ততক্ষণ কি করে বুঝবে সিতাব, কি ব্যাপার? আস্তে আস্তে চিঠির আঠা ছাড়ায় সে।

সিতাব বলে, 'চাকরির খবর মনে হছে হে। দেখি, দেবুর কাছে যাই।'

চিপতি বলে, 'তা দেবুকে খবর দাও না। এখ্যানে আসুক। পড়ে দিএ্যে যাক।'

আসলে কৌতূহল সকলেরই। এখানে দেবু এসে পড়ে দিলে ব্যাপারটা সবাই জানতে পারে হাতে হাতে। একটা ছেলে গেলো দেবুকে খবর দিতে। ফিরে এসে বলল, 'দেবুদা বাড়িতে নাই। ইস্কুল যেল্‌ছে।'

তখন সিতাবের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এলো, মাস্টার মশাইয়ের কাছে যাওয়া যাক। নিকুঞ্জবাবুর কাছে।

নিকুঞ্জবাবু তখন স্কুলে। স্কুলেই যায় সিতাব। লম্বা দোচালা স্কুল-ঘর। মাটির দেওয়াল। খড়ের ছাউনি। সামনে খানিকটা উঠোন বাখারি দিয়ে ঘেরা। তাতে গাঁদা দোপাটি আর সূর্যমুখীর গাছ। লাল হলুদ সাদা ফুল ফুটেছে কিছু। দু'জন শিক্ষক পাঁচটি ক্লাসের ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রাণান্ত। একদল ছেলে মহা উৎসাহে খেলা শুরু করেছে। অন্যদিকে উঠোনেরই একপাশে অপেক্ষাকৃত বড় কয়েকটি ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসে স্লেটে কি যেন লিখছে। মধ্যিখানে একখানা পুরনো টিনের চেয়ারে বসে আছেন নিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী। সিতাব সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সিতাবের মুখের দিকে চেয়ে প্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি —'সিতু এসেছিস ? আয় আয়। কি খবর ?'

সিতাব বলল, 'একটা চিঠি পড়ে লিতে এল্যাম সার।'

'দেখি দেখি। কোথা থেকে এসেছে ? কই দেখি, দে আমাকে।'

সিতাব কাগজখানা বাড়িয়ে দেয়।

ডানহাতে কাগজটা ধরে অন্য হাতে চশমাটা ভালো করে চোখের ওপর বসিয়ে নিলেন নিকুঞ্জবাবু। চশমার কাঁচ বহুদিন আগে বদলানো উচিত ছিল, বদলানো হয়নি। এখন আর ভালো করে পড়া যায় না। কাগজটাকে প্রায় চোখের কাছে এনে ধরেন তিনি। তারপর হোঁচট খেতে খেতে পডতে থাকেন। অনেক কথাই বুঝতে পারেন না। মোটামুটি অনুমান করেন, চাকরির খবর। সিতাবকে দেখা করতে বলেছে।

নিকুঞ্জবাবু বলেন, 'চাকরি তোর হয়ে যাবে সিতু। চাকরি হয়ে যাবে। তুই আজই টিকিটবাবুর সঙ্গে দেখা কর গিয়ে। উনি চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।'

আনন্দে সিতাবের লাফাতে ইচ্ছে করে। বাচ্চা ছেলের মতো স্কুলের উঠোনেই গোটা কতক ডিগবাজি খেতে সাধ যায়। চাকরির জন্যে তাকে ডেকেছে! নিশ্চয়ই চাকরি হবে তার।

তা শেষ পর্যন্ত চাকরিটা হলো সিতাবের। প্রথমে ইণ্টারভিউ কল্, তারপর আবার কিছুদিন চুপচাপ। তখনকার দিনগুলো সিতাবের কাছে অসহ্য। শালার চাকরি! কয়েকদিন পথ চেয়ে চেয়ে যখন চাকরির চিঠি আসে না, তখন সে ফের মুষড়ে পড়ে। ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করে। ভবতোষ সান্ত্বনা দেন, 'হবে হবে।'

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'তবে চিঠি আসছে না ক্যানে ?'

'আসবে। বুঝতেই পারছিস গর্মেণ্টের কাজ। সময় হলে ঠিক আসবে।'

আর এসেছে! এক সময় আশা ছেড়ে দেয় সিতাব। চাকরির জন্যে বসে থাকলে তো দিন চলবে না! এদিকে মাঠে ফের ধান-কাটা শুরু হয়। সকালে উঠেই কাস্তে হাতে নিয়ে মাঠে যায় সিতাব। সারাদিন ধান কাটে। ফেরে অনেকটা রাতে। বাড়ি এসেই ফুল্লরাকে জিজ্ঞেস করে, 'পিয়ন আসেনি ?'

ফুল্লরা রোজ একঘেয়ে উত্তর দেয়, 'না।'

তারপর আস্তে আস্তে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে যায়। আর জিজ্ঞেস করে না ফুল্লরাকে। সব দিন মনেও থাকে না। সেদিনও মাঠ থেকে ফিরে ছকু মোড়লের খামারে ধানের পলাই (গাদা) সাজায় অনেক রাত অব্দি। কাজ শেষ হলে বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে খেতে বসে। পরিবেশন করতে করতে ফুল্লরা বলে, 'আজ পিয়ন একটা চিঠি দিএ্যে যেল্‌ছে গো। বুলতে একটুকুনও মনে ছিল না আমার।'

ভাত ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যায় সিতাব। জিজ্ঞেস করে, 'চিঠি? কই দেখি, নি আয় তো। চাকরির খবর?'

ফুল্লরা উঠে গিয়ে চিঠিখানা নিয়ে আসে। ঠিক একই রকম, সেই প্রথম চিঠির মতোই। বাদামী রঙের কাগজ। লম্ফর আলোতে দেখে, ওপরে তারই নাম-ঠিকানা লেখা। একেবারে মাথার দিকে —On India Government Service. পোস্টাপিসের কালো কালো ছাপ। সিতাবের খাওয়া মাথায় ওঠে। জলের গেলাস তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল খায়। এই রাতে সে কোথায় যাবে এখন? কার কাছে চিঠিটা পড়ে নেবে? দূর ছাই, চিঠিগুলো বাংলায় লেখে না কেন? বাংলায় লিখলে এমন কি ক্ষতি হয়? গাঁয়ে গাঁয়ে কি সব জজ-ম্যাজিস্টের বসে আছে? প্রচণ্ড উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সারারাত কাটায় সিতাব। ভালো করে ঘুমোতে পারে না। সকালে উঠেই স্টেশনে ছোটে ভবতোষবাবুর কাছে।

আর যা প্রত্যাশা করেছিল তাই —সেই মহা সুসংবাদ। চাকরি —চাকরি! সিতাব চাকরি পেয়েছে। সিতাব এখন রেলের বাবু। দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে, শুধু গাঁয়েই বা বলি কেন, আশেপাশের দু'চারখানা গাঁয়েও সেই বিস্ময়কর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রচণ্ড রোদ্দুরে সাদিনপুরের আকাশ খাঁ খাঁ করে। আষাঢ় মাস শেষ হতে চলল, এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মাঠে কচি কচি ধানের 'বিচুন' রোদ্দুরে পুড়ে হলুদ হয়ে যাচ্ছে। শঙ্কিত হয়ে ওঠে সাদিনপুরের মানুষেরা। সঙ্গতিপন্ন গেরস্থেরা নির্বিকার, বৃষ্টি হওয়া না-হওয়াতে যেন তাদের কিছুই যায় আসে না। ছকু মোড়ল সাম মোড়লের তাতে সুবিধে। পেটের খিদে নিয়ে লোক ছুটে আসবে তাদের কাছে, চোখের সামনে ঝকঝকে টাকার নোট নাচাতে থাকবে তারা। মানুষগুলোর পেটে খিদের আগুন জ্বলে উঠবে আরও শত গুণ হয়ে। টাকা ওরা পাবে ঠিকই, কিন্তু পাবে সর্বস্বান্ত হয়ে। তার পর থেকেই তাদের কেনা গোলাম হয়ে যেতে হবে। তাদের অক্টোপাশের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় থাকবে না কোনোদিন, যেমন হয়েছিল সুমাদিসের—যেমন হয়েছে শিবু সিতাব নিতাই চিপতি জগতকারুদের —যেমন আস্তে আস্তে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে গঙ্গাচরণ। নইলে একদিন ওদেরও জমি ছিল। কারোর বাবার, কারোর কর্তাবাবার। কারোর বা চার-পাঁচ পুরুষ আগে। মোট কথা, জমি ছিল। এ রকম নিঃস্ব ছিল না। পথের ভিখেরী ছিল না।

একদা বিশ্ব-ভূমণ্ডল পড়ে ছিল অনাবাদী। মানুষ যেখানে উর্বর জমি পেয়েছে, পেয়েছে প্রকৃতির অফুরন্ত আশীর্বাদ, সেখানেই তারা ঘরবাড়ি তুলেছে, বসবাস শুরু করেছে। অনাবাদী জমিকে আবাদ করেছে। বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, কেড়ে নেওয়ার প্রশ্ন ছিল না।

তারপর একদিন শুরু হলো মাটির ওপর, মানুষের ওপর কর্তৃত্ব। গোষ্ঠী-সর্দারের কর্তৃত্ব, রাজার কর্তৃত্ব। তাদের হাত থেকে মাটির মালিকানার অধিকার নিয়ে এলেন নবাব, জমিদার। মালিকানার অধিকার বজায় রাখার জন্য দরকার হলো পাইক-বরকন্দাজ, মোসাহেব, নায়েব-গোমস্তার। তাদের খুশি রাখার জন্য জমি দেওয়া হলো, কিন্তু পোড়া চামড়ার লোকদের একেবারে ফাঁকি দিয়ে নয়। তাদেরও কিছু কিছু হক পূরণ করেছেন। যারা জমিতে চাষ করে, মাটির বুকে ফসল ফলায়, মাটির অধিকার তারা খানিকটা পাবে বৈ-কি! জমি দিয়েছেন তাদের। বিশাল বিস্তৃত মা-ধরণীর বুকে রেখা টেনে টেনে —এইটে তোর, এইটে ওর, এইটে অমুকের। তারা খুশি হয়েছে। রুক্ষ মাটিতে গায়ের রক্ত-ঘাম ঢেলে সোনার ফসল ফলিয়েছে। জীবজগতকে লালন করেছে, পালন করেছে। তাদের দেওয়া অন্নে একদল লোক পরিপুষ্ট হয়েছে —অঢেল শক্তি

জমেছে তাদের গায়ে। ক্রমশ সীমাহীন হয়ে উঠেছে তাদের লোভ। তারপর তারা প্রতিপালকদের হাত থেকেই আস্তে আস্তে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

বড় তাজ্জব ব্যাপার! অথচ দুনিয়া জুড়ে এই একই কাণ্ড চলেছে দিনরাত। ছিনিয়ে নাও। যেমন করে পারো, ছিনিয়ে নাও।

কেউ সরাসরি নেয়, কেউ কৌশলে নেয়। ব্যাপারটা কিন্তু একই।

তারপর এসেছে মহামারী, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ। বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা।

পাইক বরকন্দাজ মোসাহেব নায়েব গোমস্তা —তাদের পকেটে কাঁচা টাকা। যেসব মহাজনরা শুধু উপরিস্বত্ব ভোগ করে, তাদের পকেটেও কাঁচা টাকা। তারা সবাই সুযোগ পায়। আহা, খেতে পাসনে? আহা, ছেলেমেয়েগুলো উপোসে আছে? এই নে, টাকা নে। এখানে একটা সই দিয়ে যা। কিংবা বুড়ো আঙুলের একটা ছাপ। যা, ছেলেমেয়েগুলোকে খেতে দে, নিজে খা। খেয়ে বেঁচে থাক। তখন তাদের কথা-গুলো দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে। কিন্তু যখন দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটেছে, জেগে উঠে দেখেছে, পাঁচ টাকার জন্যে পাঁচ বিঘে জমি বেরিয়ে গেছে তার।

কেউ-বা অতটা নিষ্ঠুরতা করতে পারেনি, দরদাম করে জমি কিনেছে। মাথার ওপর ঈশ্বর বলে তো একজন আছেন, স্বর্গ-নরক বলে তো কিছু আছে! বেইমানী করা পাপ। সামনাসামনি দরদাম করে জমি কিনেছে তারা। তোমার দেড় বিঘে জমির জন্যে পনেরো টাকা দেবো বাপু, বড় জোর বিশ টাকা। ওর বেশি পারব না। দেখতেই পাচ্ছ দিনকাল! হয়তো আমি নিজেই না খেয়ে মরব কবে! কিন্তু তোমার কষ্ট দেখে—। দেড় বিঘে জমি দিয়ে গোটা বিশেক টাকা নিয়ে ছুটে গেছে সে ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে।

এসব আজকের কথা নয়, বহুদিনের পুরনো গল্প। বহুদিন থেকে চলে আসছে এ রকম।

এমনি করে করে নিঃস্ব হয়ে গেছে তারা। ফসল ফলিয়ে সকলকে লালন-পালন করেছে, এই তাদের পাপ। আর সেই পাপের প্রতিফল দিতে কেউ ছাড়েনি, যারা তাদের ফসলে দিনদিন পরিপুষ্ট হয়েছে, শক্তিমান হয়েছে, তারা —এমন কি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পর্যন্ত। কেউ ছাড়েনি তাদের। নইলে ওই সিতাবের বাবার জমি ছিল একদিন, শিবুর বাবার জমি ছিল, নিতাই চিপতি জগতকারুর কর্তাবাবার জমি ছিল —রাধার বাবা সুমাদিস, যে না খেতে পেয়ে মরে গেলো, তাদেরও এক কালে জমি ছিল।

অতএব, অনাবৃষ্টি হলে খরা হলে, অবস্থাপন্ন গেরস্থেরা নির্বিকার থাকে, তাদের কিছু যায় আসে না। তাদের লোভ কিছুটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেই মুহূর্তে। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে দিনমজুরেরা, ছোট চাষী যারা, তারা। তারা ঈশ্বরকে ডাকে, যত দেবতার নাম শুনেছে, সবাইকে ডাকে —বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও; হে ঈশ্বর, হে দেবতা, বৃষ্টি দাও।

ঘরে ঘরে মেয়েরা নানারকম ব্রত পালন করে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করে। সবাই মিলে ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তা হয় গৌরসুন্দরের বৌ বাসন্তী। তার বড মেয়ে সুধা বরের মা। রাধা সাজে কনের মা। গৌরসুন্দরের বাডির উঠোনে আয়োজন হয়। চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে ওপরে সামিয়ানার বদলে কাপড় টাঙানো হয়। আমের পাতা দিয়ে খুঁটিগুলো সাজানো। ভেতরে একটা ছোট জলচৌকি। পাশে আম্রপল্লবের ঘট। সামনে নিকোনো চত্বরে সুন্দর আলপনা। আইবুড়ো মেয়েরা ঢোল নিয়ে বসে। মিষ্টি সুরে গান গাইতে থাকে। ছোটরা বেরোয় ভিক্ষে করতে। ভিক্ষের চালে ব্যাঙের বিয়ে দিতে হয়। দল বেঁধে খালি গায়ে তারা ঘরে ঘরে যায়। এক মুঠো দু'মুঠো করে চাল যোগাড় করে সারা গাঁ ঘুরে ঘুরে।

বিকেলবেলা ছেলেমেয়েরা দু'টো বর-কনে ধরে নিয়ে আসে। দু'টো ছোট ছোট সোনা ব্যাঙ। পায়ে দড়ি বেঁধে মাচার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। প্রথমে পালানোর জন্যে খানিকটা ছটফট করে। তারপর নিরুপায় হয়ে যথার্থ বর-কনের মতো গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। ছেলেমেয়েরা ভারি মজা পায়। হাসাহাসি করে। হুল্লোড় করে।

তারপর যথারীতি 'থুবড়া' (আইবুড়-ভাত) খাওয়ানো, গাত্র-হরিদ্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠান। হলুদ মাখামাখি, রঙ মাখামখি। সুধা ও রাধাকে বেশি করে মাখানো হয়। ওরা একজন বরের মা, অন্যজন কনের মা। সারা গাঁয়ের মেয়েরা এসে ভিড় করে গৌরসুন্দরের বাড়ির উঠোনে। ঢোলের গুরু-গম্ভীর বাজনার সঙ্গে কয়েকজন একঘেয়ে সুরে গান গায়—

হলুদ মাখো রে কন্যা, হলুদ-রাঙা গায়ে,
হাতে হলুদ, মুখে হলুদ, হলুদ রাঙা পায়ে।

সন্ধ্যায় গৌরসুন্দর ছকু মোড়লের হ্যাজাক চেয়ে এনে জ্বেলে দেয়। ভিক্ষের চালে পায়েস রান্না হয়। বাতাসে ভুরভুর করে গন্ধ ছড়ায়। তারপর বিয়ে, উলুধ্বনি— সাদিনপুরের আকাশ-বাতাস উৎসবের গন্ধে ভারি হয়ে ওঠে।

বাইরে নিমতলায় পুরুষ মানুষের ভিড়। আলোচনা হয় চাষবাসের।

'এবার বছর ভালো লয় হে। আষাঢ় মাস শেষ হতে চলল—'

'কথায় আছে না, আমে ধান তেঁতুলে বান। তা এবার ছাখো, তুমার আমও নাই তেঁতুলও নাই।'

'কলিকাল হে, কলিকাল। মানুষ তো আর দেব্‌তার পরোয়া করে না। সারা দেশটা খাল কেটে কেটে ঝাঁজরা করে ফেললে। তা দে, জল দে এবার।'

'দেব্‌তা জল না দিলে গরমেণ্ট জল দিবে ক্যানেলে? জল তৈরি কৈর্‌বে না-কি?'

দেবু রামপুরহাট হাই স্কুলে পড়ে। সে বলে, 'জলও তৈরি কৈরছে মানুষ।'

সবাই হৈ হৈ করে ওঠে, 'জল তৈরি কৈর্‌ছে ? জল ?' তারপরই অবিশ্বাসের হাসি হাসতে থাকে তারা।

'তুমরা জানো না তাই।' প্রতিবাদ করে দেবু। বলে, 'কাঁচের ঘরে বৈজ্ঞানিকরা জল তৈরি কর্‌যাছে। আমাদের বইয়ে আছে।'

ছকু মোড়ল বলে, 'তা তুমার কাঁচের ঘরে জল তৈরি কৈর্‌লে তো মাঠে জল হবে না!'

একজন বলে, 'সে আর কট্টুকুন হবে! ব্যাঙের মুতে ঘোড়াবান!'

তারপর আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘোরে।

'এবার না-কি মানুষ চাঁদে যাবে ?'

'রাবণও সগ্‌গে যাবার সিঁড়ি বেঁধ্যাছিল হে। সোনার সিঁড়ি।'

দেবু চুপ করে যায়। তারও বিশ্বাস হয় না মানুষ চাঁদে যেতে পারে।

জগতকারু বলল, 'মন্মথদা বুলছিল, উ-মাসের গোড়ার দিকে ক্যানেলে জল দিবে।'

মন্মথ ক্যানেলের গেট্‌-কীপার।

'মন্মথর কথা ছাড। সবাই তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। দেব্‌তার জল হলে ওরাও জল ছাড়বে মাঠে।'

'তেলা মাথায় তেল ঢালা হে, তেলা মাথায় তেল ঢালা।'

'একরে দশ টাকা করে খাজনা। সময়ে যদি জলই না পেল্যাম, তবে লাভটা কি ? অমন ক্যানেলের দরকার নাই আমাদের।'

এলোমেলো কথা। বিচ্ছিন্ন আলোচনা। যার যা ভালো লাগে বলে। এমন সময় পায়েস আসে ভেতর থেকে। সবারই হাতের তালুতে একটু একটু করে পায়েস দিয়ে যায় রাধা। কনের মা সে। কাপড় রঙে রঙে ছয়লাপ। হাতে মুখে মাথার চুলে হলুদ। বয়স্করা ঠাট্টা করে, 'কে হে, কনের মা না-কি! ভালো ভালো। দাও দিকি এদিকে একটুকুন—দাও।'

জগতকারু আড়ষ্ট হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে দেখে রাধাকে। এ-রাধাকে সে চেনে না—এই রকম রাধা—কনের মা রাধা। পালিয়ে যাবে কি না ভাবতে থাকে জগতকারু। তার দৃষ্টি বিস্ময়ে বোবা। হঠাৎ রাধা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। খানিকটা লজ্জা, খানিকটা সঙ্কোচ। তারপর বলে, 'লাও, হাত পাতো।'

জগতকারু হাত পাতে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রাধার মুখের দিকে।

জগতকারুর হাতে পায়েস দিতে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেলে রাধা। তারপর সে ছুটে পালায় বাড়ির ভেতর।

অমৃত—অমৃত! এ রকম পায়েস জীবনে কখনও খায়নি জগতকারু। তার মনের ভেতর গুনগুন করে ওঠে ভোলাদাস—

সখি, পীরিতের কি উলট্যা রীতি
বুঝা বড় দায়,
'রাধা রাধা, বুলে কানাই
ঝাঁপ দ্যায় যমুনায়—
সখি, কানাই আমার
ঝাঁপ দ্যায় যমুনায়।

দিন দু'য়েক বাদে হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে এক চিলতে মেঘে খানিকটা বৃষ্টি হয়। তাতে ছেলেমেয়েরা খুব খুশি। তাদেরই চেষ্টায় সবকিছুর আয়োজন। বড়রাও খুশি, কিন্তু তাদের প্রত্যাশা শুধু ওইটুকু নয়। এক পশলা বৃষ্টি তৃষিত মৃত্তিকার বুকে এক গণ্ডুষ মাত্র। গলা ভেজে, তেষ্টা মেটে না। তারপর সেই আবার ধূধূ খরা। মাঠের ক্ষেতে ক্ষেতে বিচুনগুলো জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। অনেকের বাড়িতে আবার সেই অন্নাভাব। কাজ নেই। মাঠে জল না হলে ক্ষেতমজুরেরা কাজ পাবে কোথায়?

তারপর এক সময় মানুষের সমস্ত সংশয় দূর করে ক্যানেলে জল আসে। কানায় কানায় ভর্তি জল। সাদিনপুরের লোকেরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। শত শত আনন্দের ফুলঝুরি একসঙ্গে জ্বলতে থাকে প্রত্যেকের বুকের ভেতর। কোদাল হাতে নিয়ে মাঠের দিকে ছোটে তারা।

দুই

অনেকেরই আশঙ্কা, গাঁয়ে যখন মামলা ঢুকেছে, তখন লক্ষ্মীর আসন এবার টলল বলে। কিন্তু লক্ষ্মীর আসন অত সহজে টলে না। আসন যদি পাকাপোক্ত হয়, ফুরফুরে হাওয়ায় তার ভিত নড়বে কেন? সামের ঘরে ছকুর ঘরে লক্ষ্মী বসেছেন আসন গেড়ে। অত সহজে কি তাঁর আসন টলে?

সে যাই হোক, মামলা নিয়ে বিসংবাদটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। ছকু নিজের বাড়িতে বসে যেমন আস্ফালন করে, সামও তেমনি নিজের বাড়িতে বসে কম তড়পায় না। দু'জন দু'জনের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে।

গাঁয়ের লোক অধিকাংশই দু'দলে ভাগ হয়ে যায়। কেউ দাঁড়ায় ছকুর পক্ষে, কেউ দাঁড়ায় সামের পক্ষে। ছকুর জমি যারা ভাগচাষ করে, ছকুর কাছে অসময়ে যারা ধান পায়, তারা গিয়ে ছকুর বৈঠকখানায় সকাল-সন্ধ্যে হাজিরা দেয়। উৎসাহ দেয় ছকুকে। অন্যদিকে যারা সময়ে-অসময়ে সামের কাছে হাত পাতে, সামের কাছে যাদের টিকি বাঁধা, তারা সামকে সাহস যোগায়। কেউ কেউ নিরপেক্ষও থাকে। তাদের মধ্যে সিতাব মণ্ডল, গঙ্গাচরণ ঘোষ, গৌরসুন্দর পাল, মোংলা কামার। আর নিরপেক্ষ থাকেন গ্রামের পাঠশালার মাস্টার মশাই নিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী।

এই সময় সাম হঠাৎ একদিন বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন করে রীতিমতো আড়ম্বর সহকারে। গাঁয়ের লোকদেরও একবেলা খাওয়াবে। গৌরসুন্দরকে ডেকে পাঠাল সে। বাড়ির ভেতর গৌরকে নিয়ে গিয়ে খাতির করল। সামের বৌ চা তৈরি করে দিলো। তারপর এ-কথা সে-কথার পর সাম বলল, 'অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল হে, পেরে উঠছিল্যাম না। তা ফেলে থুলে পড়েই থাকে। তাই ভাবছি পূজ্যাটা সেরেই লিই। হাতও বড্ড টান। তুমাদের ভৈরবের পাল্লায় পড়ে আমার তো হাত একদম ফাঁকা। ধার-কজ্জও হৈল্ছে অনেক। তা হৈক্। আস্তে আস্তে না-হয় শোধ কৈর্বো। তাই বুলে ঠাকুরের পূজ্যা তো আর ফেলে থুতে পারি না। কি বোলো?'

গৌরসুন্দর সায় দিলো কথায়।

সাম বলল, 'বুলছিল্যাম কি, পূজ্যার দিন তুমাদের বাড়ি-সুদ্ধ নিমন্তন্ন, বুঝল্যা। যা হৈক্ চাট্টি মুখে কৈর্ব্যা এখ্যানে এসে। তুমাদের সাথে আজকের তো নতুন সম্বন্ধ লয়। তবে, ভৈরব কাজটা ভালো কৈর্লে না হে। কত মানা কৈর্ল্যাম, শুনলে না। দীঘির অংশটা তুমি নিজেই লিতে পারলে ভালো হতো।'

গৌরসুন্দর বলল, 'আমি কি করে লিবো সাম? আমার অবস্থা তো বুঝতেই পারছ!'

'তা তো পারছি হে। আমারও সাধ্যে কুল্যাছিল না। তা যখুন সবই লিছি, তখুন আর ওইটুকুন, ধারকজ্জ করেই লিল্যাম, বুঝল্যা। কিন্তু ছকু ব্যাটার মজা দ্যাখো, খামোখা আমার ওপরে মামলা ঠুকে দিলে হে। ল্যায্য পয়সা দিঞে কিন্যা জিনিস আমার। তুই পারলে লিলিনা ক্যানে? আমি তো বাগড়া দিতে যাইনি! তুই ফুট্যা পয়সা দিঞে লক্ষ্মী কিনতে চাস, লক্ষ্মী তোর ঘরে যাবে ক্যানে? তা ব্যাটা আমার ওপর রেগেমেগে মামলা কৈর্লে। করুক। তার বিচ্যার কোর্টেই হবে। তোর হক হলে তুই পাবি।'

গৌরসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরজা পর্যন্ত আসে সাম। বলে, 'পূজ্যার দিন তাহলে —মনে থাকে যেন গৌরদা। বৌদিকে বুলে দিও। ছেলেপিলে নি এখ্যানে এক বেলা, বুঝল্যা, যা হৈক্ সামান্য—'

সামের ব্যবহারে কৃতার্থ হয়ে যায় গৌরসুন্দর। বলে, 'ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে।'

তারপর হঠাৎ সাম বলে, 'একটা কথা গৌরদা, বুলতে ভুলে যেল্ছি, পূজ্যার দিন অনেক লোক খাবে-টাবে, একটুকুন মাছ হলে ভালো হতো। অবশ্যি তুমার যদি আপত্তি থাকে, আমি না-হয় বাজার থেকে কিনে এনেই কাজ সারব।'

গৌরসুন্দর আপত্তি করে বলে ওঠে, 'না না, তা কি হয় হে। তুমার নিজের পুষ্করণী থাকতে মাছ কিনতে যাবা ক্যানে? জমি-জিয়্যাত পুকুর-পুষ্করণী তো,

তুমার যেঞে, দরকারের লেগেই। তা ছকু মোড়লকেও এক কথা শুধাতে হয়। ওরও যখুন অংশ আছে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বুলবো বৈ-কি! আমি নিজে যেঞে বুলবো। আমার দরকারে আমি মাছ লিছি, তুমার যখন ডবল অংশ, তুমার দরকারে ডবল লিও। না-হয় মাথার ওপরেই নিজের ভাগ কেটে লেক্।'

কিন্তু গৌরসুন্দর রাজি হলেই ছকু মোড়ল যে রাজি হবে, তার কোনো মানে নেই। পরদিন দেখা করে সাম সবিনয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা বলেছিল। বলেছিল, 'তুমার আমার ঝগড়া করে লাভ নাই মোড়ল। কার ল্যায্য পাওনা, সেটা কোর্টে হবে।' কিন্তু ছকু মোড়ল ছেলেমানুষ নয়, সে জানে, কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সরাসরি আপত্তি জানাল সে। বলল, 'যদ্দিন ফায়সালা না হয়, তদ্দিন সতীদীঘিতে জাল পৈড়্‌বে না। কারোর দরকারেই পৈড়্‌বে না। আগে ফায়সালা হৈক্, তারপর। তুমার ল্যায্য পাওনা হলে তুমি লিও।'

সাম বলল, 'আমার যে আখুন মাথার ওপরে কাজ মোড়ল। কাজটা পার করে দাও। সারা গাঁয়ের লোক খাবে।'

'তুমার তো আরো পোখর আছে, সেথ্যানে ধরো।'

'উ-সব পোখরের মাছ খুব ছোট মোড়ল।'

'সতীদীঘিতেও খুব বড় মাছ নাই। তাছাড়া গাঁ-র লোকদেরও ছোট মাছ খাওয়া অভ্যাস আছে সাম। ছোট মাছের কাঁটা বেছে খেতে জানে ওরা। কুনু অসুবিধে হবে না।'

সাম উঠে আসার সময় বলল, 'তাহলে আমার কথাটা তুমি থুল্যা না মোড়ল?'

'কি করে থুই বোলো! তুমি যদি মাছের ব্যবস্থা না কৈরতে পারো, আমাকে খবর দিও। কত দরকার, খালি সেইটা জানায়ো। আমার নিজের পোখরের মাছ নি আমি নিমন্তন্ন খেতে যাবো।'

সাম সহজে রাগে না। সে জানে, সহজে যারা রাগে, তাদের প্রতি লক্ষ্মী বিমুখ। বলল, 'সাত বিঘ্যা জমি আর সতীদীঘির সিকি অংশ যখন এক থোকে কিনতে পেরয়াছি, তখন বাজার থেকে মাছ কিন্যার সামথ্যও আমার আছে মোড়ল। তাই হবে। সেই ব্যবস্থাই হবে। তাই বুলে রাগ করে তুমি আবার আমার বাড়িতে পা-র ধুল্যা দিব্যা না, সে-কথা শুনছি না। তুমাকে যেতেই হবে। তুমাদের বাড়ির সবাইকে। গাঁ-র মোড়ল বুলতে তুমি, ছোট থেকে মান্য করে এস্যাছি। আখুনো মান্য করি। মামলা-মোকদ্দমা, সে যা হয় কোর্টে হবে।'

ছকু মোড়ল তৃপ্তি সহকারে বলে, 'ইটা বিষয়ের কথা সাম। রাগ করিও না। তুমি আমাকে নিমন্তন্ন দিয়্যাছো, যাবো। যাবো বৈকি! ঠিক যাবো।'

ব্যস্, ওই পর্যন্ত। সবাই জানল ব্যাপারটা। কিন্তু তা নিয়ে আর উত্তেজনা

ছড়ালো না। সাম ঝগড়া-বিবাদ চায় না। ছকু মোড়লের যখন আপত্তি, তখন সতীদীঘির মাছ জলেই থাক কিছুদিন।

তারপর, লক্ষ্মীপুজোর দিন সকাল থেকেই বিরাট আয়োজন। গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে তার খামার বাড়িতে। সেখানে উনুন তৈরি হয়েছে সারি সারি। বড় বড় কাঠ কুড়ুল দিয়ে ফালি ফালি করা হচ্ছে। গাঁয়ের লোকেরাই নিজের নিজের কাজ ভাগ করে নিয়েছে। জল খাওয়ার বেলা হলে সাম নিজে গিয়ে ছকু মোড়লকে ডেকে এনেছে। বলেছে, 'তুমাকে রসুইঘরটা দেখাশুন্যা কৈরতে হবে মামা। উখ্যানে একজন ভালো লোকের দরকার। আর মামা, একজনকে বাজার যেতে হয়। পুজ্যার জিনিসপত্তর কিন্যা-কাটা বাকি। কাকে পাঠাই বোলো তো?'

সিতাব যেতে পারত। কিন্তু সে এখন ডিউটিতে। ফিরবে সেই সন্ধ্যেয়। গৌরসুন্দরকে পাঠানো যেতে পারে, কিন্তু সে রান্নার দিকে থাকবে। গঙ্গাচরণ বুড়ো মানুষ। নিকুঞ্জ চক্রবর্তী স্কুলের ছুটি দিয়ে তবে আসবেন। দেবু লেখাপড়া জানে, কিন্তু ছেলেমানুষ। দেখেশুনে কিনতে পারবে না। সাম বলল, 'রসুইঘর দেখাশুন্যার কাজ তো সেই উ-বেলায়। এক কাজ করো মোড়ল, তুমিই যাও। নাগাদ বিক্যাল হতে হতে ফিরতে পারব্যা। বেচু গাড়ি নি যেছে। একটুকুন কষ্ট করো। তুমি যেলে দেখেশুনে কিনে আনতে পারব্যা সব।'

ছকু মোড়ল খুশিই হলো। সামের মাহিন্দার বেচু ছইওলা গাড়িতে বলদ জুড়ল। ছকু মোড়ল সাজগোজ করে এসে গাড়িতে উঠল। গাড়ি নিয়ে গরু দু'টো যখন হাঁটতে শুরু করেছে, সাম এসে ছইয়ের পেছন দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ল্যাংড়াকে এক মণ মাছের লেগে বুলে থুয়্যাছি। যদি দেখা হয়, বুলে দিও মোড়ল, নাগাদ দুপুরবেলা যেন মাছটা পৌঁছে দ্যায়। দেরি করে না যেন।'

ছকু মোড়ল মনে মনে ভাবে, সাম তাকে বড় ভক্তি করে। বড় শ্রদ্ধা করে। একদিন সতীদীঘির মাছ ধরলে এমন কি ক্ষতি হতো! আপত্তি করে ভুলই করেছে। মনে মনে আপসোস হয় তার।

গাড়ি যখন রামপুরহাট ঢুকছে, তখন ছকু মোড়ল দেখল, ল্যাংড়া অন্য জেলেদের সঙ্গে নিয়ে রিকশা করে আসছে। দু'টো রিকশায় মাছ ধরার জাল। কাছে আসতেই ছকু মোড়ল চেঁচিয়ে বলল, 'একটুকুন তাড়াতাড়ি যা ল্যাংড়া। দুপুরের মধ্যে মাছ দরকার। সাম বুলে দিয়্যাছে।'

রিকশার গতি একটু মন্থর হয়। ল্যাংড়া বলে, 'আমরা এই যাচ্ছি মোড়ল। কতক্ষণ আর লাগবে!'

'হ্যাঁ বাপ, তাড়াতাড়ি যা একটুকুন।'

ল্যাংড়াদের রিকশার গতিবেগ দ্রুত হয়। ছকু মোড়ল জিজ্ঞেস করে, 'মাছ কুথা ধৈরবি রে ল্যাংড়া?'

ল্যাংড়ার কানে সে-কথা বুঝি আর পৌঁছয় না। কোনো জবাব দেয় না সে। রিকশা তখন অনেক দূরে।

কিন্তু এই সামান্য অসতর্কতায় এ রকম একটি ঘটনা ঘটবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ছকু মোড়ল।

বিকেলবেলা যখন সে পূজোর সামগ্রী কিনে গাঁয়ে ফিরল, দেখল, সামের খামার বাড়িতে এক মণেরও বেশি বড় বড় মাছ। আহা, কি সুন্দর মাছ! বলল, 'বেশ ভালোই মাছ পেয়্যাছো তো সাম। বাঃ, খাসা! চমৎকার!'

নেমন্তন্ন বাড়ির সবাই ছকু মোড়লের মুখের দিকে তাকায় সকৌতুকে।

দু'একজন ততক্ষণে গাড়ি থেকে পূজোর জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে আসে। ফল-মূল, এটা-সেটা। ছকু মোড়ল বলে, 'দেখে লাও সাম। সব ঠিক ঠিক আছে কি-না, দেখে লাও।'

সাম বলল, 'তুমি যখুন কিন্যাছো মোড়ল, তখুন কি আর ঠিক হবে না! সব ঠিক আছে।'

ওদিকে উনুনে ভাত চড়েছে, একপাশে তরকারি কোটা হচ্ছে। দু'জন ইয়া বড় বড় আঁশবঁটি নিয়ে মাছ কুটতে বসেছে।

ছকু মোড়ল জিজ্ঞেস করল, 'কুথাকার মাছ হে? একেবারে ঝকঝকে!'

দু'টো আঁশবঁটিতে দু'টো রুইমাছ কাটা পড়েছে, বঁটিতে মেঝেতে রক্ত। যারা মাছ কুটছিল, তাদের হাতও রক্তে লাল। তাদের জবাব দেওয়ার আগেই জবাব দিলো সাম, 'তুমি ঠিকই চিন্যাছো মোড়ল। এমন ঝকঝকে মাছ আর কুথা হবে?'

ছকু মোড়ল ভুরু কোঁচকায়, 'তার মানে?'

'কথা বুঝল্যা না?' হাসে সাম। হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, 'সতীদীঘির মাছ গো মোড়ল। সতীদীঘি থাকতে গাঁ-র লোক আদাড়ে পুষ্করণীর মাছ খেতে যাবে ক্যানে? তাই সতীদীঘিতেই জাল ফেল্যাছিল্যাম।'

ছকু মোড়ল এই দ্বিতীয়বার হেরে গেলো জীবনে। হেরে গেলো এই সেদিনের ছোকরা সামের কাছে। প্রথমবার হারতে হয়েছে সামের টাকার ক্ষমতার কাছে। দ্বিতীয়বার হারল তার বুদ্ধির কাছে। বিনা রক্তপাতে এত বড় জয়লাভ স্বপ্নেরও অগোচর।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। এমন সময় এক গেলাস সরবৎ নিয়ে আসে সামের ছেলে। অন্য হাতে সাদা জল। ভেতর থেকে সামের বৌ পাঠিয়ে দিয়েছে। সাম বলল, 'সারাদিন হয়রান হঞে এল্যা, একটুকুন জল খেঞে যাও মামা।'

ছকু মোড়ল পেছনে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে বলল, 'চামারের ঘরে জল খাই না আমি।'

তিন

সাম সতীদীঘিতে শুধু মাছই ধরেনি, গায়ের জোরও দেখিয়েছে। ছকু মোড়লের বড় ছেলে তিনকড়ি বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকে বেশ কিছু কিল-চড়-চাপড় মেরেছে সামের লোকেরা। বাড়িতে ফিরে এসে ছকু মোড়ল দেখল, বড়বৌ মালসায় আগুন নিয়ে ওকে সেঁকা-পোড়া করছে। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেলো ছকু মোড়লের। হারামজাদা, নেমকহারাম! তারই বাড়ির পুজোর জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে সে রামপুরহাট গেছে, আর তারই সর্বনাশ? এবার সুযোগ পেলেই হারামজাদাকে দেখে নেবে ছকু। আস্ত মাথা চিবিয়ে খাবে।

তিনুর মা তখনও সমানে সামকে, সামের চোদ্দ পুরুষকে গালাগালি দিয়ে চলেছে।

ছকু মোড়ল মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবে। সতীদীঘির মাছ খাওয়াব সামকে। ভালো করেই খাওয়াব। সতীদীঘিতে একটা পুঁটিও রাখব না। জাল ফেলে ছেঁকে নেবো সতীদীঘি। সাম বাধা দিতে এলে তার হাত পা ভেঙে দেবে সে। যদ্দিন মামলার ফয়সালা না হয়, তদ্দিন অনাবাদী হয়ে থাক সতীদীঘি।

কিন্তু মানুষ যা ইচ্ছে করে, তাই হয় না।

পরদিন দেখা করতে আসে আয়াশের নেয়ামত। মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় সাদা চুল। মামলা-মোকদ্দমায় পাকা। আইন-কানুন তার নখের ডগায়। তারই পরামর্শে ছকু মোড়লের প্রি-এম্প্‌শন স্যুট। সে এসে বলল, 'তুমার ভালোই হৈল্‌ছে হে ছকু। তুমার কপাল খুলে যেল্‌ছে। সাম শালা নিজের ফাঁদে নিজেই পা দিলে। সামের খেল্ খতম ছকু।'

ছকু অবাক হয়ে নেয়ামতের মুখের দিকে তাকায়, 'কিরকম?'

'মানে ফৌজদারি হে, ফৌজদারি। আজই তুমি এক নম্বর ঠুকে দাও, বুঝল্যা। পেরেমশ্সন স্যুটের নোটিস পেয়্যাছে সে। তা-সত্ত্বেও জবরদস্তি সতীদীঘিতে জাল ফেল্যাছে। মানা কৈর্‌তে যাওয়ায় তিনুর হাড়গোড় ভেঙে-চুরে দিয়্যাছে। ডাক্তোরের একটা সার্টিপিট দিতে হবে। ব্যস, সাম ব্যাটার হাতে দড়ি।'

ছকু মোড়লের চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু ডাক্তোরের সার্টিপিট?'

'তিনুকে যদি সাথে সাথে হাসপাতালে নি যেত্যা হে, খুবই ভালো হতো। যাক গে, তুমার যেঞে গোটা পাঁচেক টাকা দিলেই সার্টিপিট যোগাড় হঞে যাবে। সে আমি তুমার ব্যবস্থা করে দিবো। তুমি আজই থানায় যেঞে ডায়েরি করে দাও একটা।'

ফৌজদারি মামলা শুরু হয় গাঁয়ে। আসামীদের নামে ওয়ারেন্ট বেরোয়।

কিন্তু কাকে কাকে আসামী করেছে ছকু মোড়ল, কেউ জানে না। পুলিসের ভ্যান আসে গাঁয়ে। গাঁয়ের লোক যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালায়। যে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়ে। সামকে না পেয়ে সামের মাহিন্দার বেচুকে ধরে নিয়ে যায়। রাত্রেও ঘুমোতে পারে না গাঁয়ের লোকেরা। কখন পুলিস আসে ঠিক নেই। ছকু মোড়লের লোকেরা আরও বেশি করে ছকু মোড়লের বৈঠকখানায় আড্ডা জমায়। এদিকে সাম থানা থেকে জেনে নিয়েছে পুলিসের খাতায় কার কার নাম আছে। পাঁচজনকে আসামী করেছে ছকু। সাম কিন্তু গাঁয়ে এসে পনেরো জনের নাম শোনায়। বলে, 'খামোখা নিদ্দুষী লোকগুলিনকে জড়াল্ছে ছকু। এত পাপ ধম্মে সইবে না।'

যাদের নাম পুলিসের খাতায় আছে বলে গুজব ছড়ায়, তারা আরও বেশি করে ভিড়ে যায় সামের দিকে। সামই এখন তাদের ভরসা। টাকা-পয়সা দিয়ে সে-ই এখন বাঁচাতে পারে তাদের।

পুলিস ভ্যান এসে দু'দিন ঘুরে যায়। তারপর আর পুলিস আসে না। কয়েকদিন পর পাঁচজন আসামী কোর্টে গিয়ে জামিন হয়ে আসে। সাম বলে, 'বাকিগুলিনের নাম থানাতেই কাটিয়ে দিয়্যাছি হে। টাকা দিঞে।'

তা এ নিয়ে সিতাবেরও কম ভয় ছিল না। পুলিসের ভয়ে সে-ও ক'দিন গাঁয়ের ত্রিসীমানা মাড়ায়নি। রেলের কোয়ার্টারেই থাকত শিউপ্রসাদের কাছে। যেদিন আসামীরা জামিন নিয়ে ফিরল, সেইদিনই বাড়ি এলো সে।

সন্ধ্যেয় ছকু মোড়ল এলো সিতাবের কাছে। বলল, 'সিতু, আমার হঞে তোকে সাক্ষি দিতে হবে।'

সিতাব বলে, 'আমি আখুন বাপু গবূমেণ্টের লোক। আমার সাক্ষি দিয়্যা চৈল্বে না। বিস্তর ঝামেলা।'

'আমি উকিলকে শুধাল্ছি রে। চৈল্বে, বুঝলি। তোর সাক্ষির দাম বেশি।'

'আমি টিকিটবাবুকে শুধাবো মোড়ল। যদি বোলে, যাবো। আমার আবার ডিউটি আছে। ছুটি করাতে হবে।'

'তা বাপু, তুই একটুকুন চেষ্টা করে ছুটি করিয়ে লে।'

কিন্তু ভবতোষবাবু সিতাবকে সাক্ষী হতে নিষেধ করেন। কারণ, ঘটনার সময় সে ডিউটিতে ছিল। সব শুনে ছকু মোড়ল মুখ গোমড়া করে ফিরে যায়।

সিতাব সাক্ষি না দিলেও সাক্ষীর অভাব নেই গাঁয়ে। ছকু মোড়ল ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। শিবুর কাছে যায়, চিপতির কাছে যায়। আরও অনেকের কাছে। কাউকে ধান দিতে চায়, কাউকে টাকা। গাঁয়ের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা চলতে থাকে।

এদিকে ছকু মোড়ল কোমর বাঁধে। সামের সতীদীঘির মাছ খাওয়া জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবে সে। মিহি পাকিস্তানী জাল ফেলে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত ছেঁকে তুলে নেবে।

গৌরসুন্দরের সঙ্গে কথা বলে ছকু। গৌরসুন্দর বলে, 'শুধু শুধু মাছগুলিন লষ্টো কৈর‍্ব্যা মোড়ল? মামলা চৈল্‌ছে কোর্টে। তুমার যেঞে উথ্যানেই ঝগড়ার মীমাংসা হৈক্‌। আবার অনথ ক্যানে বাধাতে যেছো?'

ছকু মোড়ল বলে, 'আমি যখুন মাছ ধৈর‍্তে যাই, তখুন অনথ করি! আর সাম ব্যাটা যখুন দেড় মণ মাছ লষ্টো কৈর‍্লো, তখুন কথা নাই?'

'উ তো কাজের লেগে লিয়্যাছে। তুমার কাজ পৈড়্‌লে তুমিও লিও। তুমার যেঞে ডবল অংশের দরুণ ডবল লিও।'

'কাজের লেগে মাছ ধরেনি, মাছ ধরার লেগে কাজ ফেঁদ্যাছিল। আমি বুঝিনা?'

'বেশ তো, তুমিও কাজ ফাঁদো। তুমিও মাছ ধরো তুমার দরকার মতুন। সব মাছ ছেঁকে তুলে লিব্যা বুলছো, ই কিরকম কথা!'

'তুমিও সামের সাথে গাঁটছড়া বেঁধ্যাছো না-কি গৌর?'

'ছি ছি, অমন বাক্যি মুখে আনিও না মোড়ল। যেটা ল্যায্য, তুমার যেঞে সেটাই বুলছি।'

ছকু মোড়ল আস্ফালন করতে করতে ফিরে যায়। বলে, 'হুঁঃ, সবাই ল্যায্য কথা বলে! মাছ আমি ধৈর‍্বো গৌর। তুমার সামকে বুলিও, যদি পারে আটকাবে। সেদিন তিনুকে মের‍্যাছে, এই দিন বাধা দিতে যেলে সামের মাথা কেটে লিবো। বুলিও ওকে। ছকু মোড়ল চুরি করে কাজ করে না। সে বাপের ব্যাটা। সতীদীঘির মাথায় সামনাসামনি দেখা হবে।'

কথা রাষ্ট্র হয় গাঁয়ে। সামের কানেও কথা পৌছয়। সতীদীঘির মাথায় দাঙ্গা করবে ছকু। লেঠেল নিয়ে দাঙ্গা। ছকু মোড়লের লোকেরাও আস্ফালন করে। টাকা দিয়ে পাকা লেঠেল আনবে ছকু। পাঁচ শো লেঠেল।

সামের পক্ষের লোকেরা সাবধান করে সামকে। বলে, 'ছকু খেপ্যাছে সাম। আর ঘাঁটাতে যেও না। বিপদ হতে পারে।'

সাম হেসে বলে, 'ছকু খেপ্যাছে, তাই বুলে আমাকেও খেপ্‌তে হবে না-কি! তবে ছকু যদি জোর-জুলুম করে, তবে আমাকেও কিছু কৈর‍্তে হবে। অমনি অম্‌নি তো আর ছেড়ে দিয়্যা যায় না!'

তারপর সত্যিই একদিন সকালবেলা ছকু মোড়লের লোকেরা সতীদীঘির পাড়ে ভিড় জমায়। পাঁচ শো নয়, গোটা পঞ্চাশেক লেঠেল আসে বাইরে থেকে। ভাড়াটে লেঠেল। মাথায় পাগড়ি, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি। কারোর কারোর হাতে ঝকঝকে টাঙ্গি। তখনও রামপুরহাট থেকে জাল এসে পৌছয়নি। সবাই পথ চেয়ে আছে। সামের লোকেরা সামের খামার বাড়িতে। তারা সব খবর পাচ্ছে এর-ওর মুখে। তাদের গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক টিপটিপ করে। সাম হেসে বলে, 'জাল এলেই আমরা লাঠি নি বেরিয়ে পৈড়্‌বো, বুঝল্যা হে।'

'কিন্তু সাম, ওরা যে অনেক ? তার ওপরে অতগুলিন পাকা লেঠ্যাল !'

'দূর, ডর কিসের ? আমরা লাঠি ধৈরলে সব ভয়ে পালাবে।'

কারোর এতটুকু হিম্মত হয় না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। সামের পাল্লায় পড়ে হয়তো প্রাণটাই যাবে। সামের বৌ-এর মুখ একেবারে পাংশু। বলে, 'দরকার নাই আমার দীঘির, দরকার নাই তুমার মাছের। আমি আজ তুমাকে ঘর থেকে বেরাতে দিবো না।'

সাম হাসে, 'উ-কথা বুললে কি সম্পত্তি থুয়া যায় ? ছকু ব্যাটা হাসবে যে। বুলবে, ভয়ে বৌ-এর কাছে লুক্যালছে। যখুন যেমন তখুন তেমন।'

'যা বোলে বুলুক। তুমি যদি আজ ঘর থেকে বেরাও, আমি গলায় দড়ি দিবো। বুলে থুল্যাম।' সামের বৌ-এর মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ।

বেলা বাড়ে। ওদিকে সতীদীঘির পাড়ে সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে, এবার জাল এসে পড়বে। সামের লোকজনের কারোর টিকি দেখা যায় না। তারা জোট বেঁধে সামের ক্ষমতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে হাসাহাসি করে। জাল কিন্তু আসে না। ছকু মোড়ল অস্থিরভাবে সতীদীঘির পাড়ে লেঠেলদের মাঝখানে ঘোরাঘুরি করে।

এমন সময় একটা লোক আসে সাইকেলে চড়ে। পরনে খাকি জামা। কোর্টের পেয়াদা। ছকু মোড়লের হাতে একখানা নোটিস ধরিয়ে দেয়।

'কিসের নোটুস হে, কিসের নোটুস ?' সবাই পেয়াদা এবং ছকু মোড়লকে ঘিরে ধরে চারদিকে। পেয়াদাকে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের নোটুস হে ?'

পেয়াদা বলে, 'ইন্‌জাংশান। সতীদীঘির ওপর ইন্‌জাংশান। আজ থেকে সতীদীঘিতে কেউ মাছ ধরতে পারবে না। কোনো পক্ষই। কোর্টের হুকুম। হুকুম অমান্যি করলে পুলিস এসে বেঁধে নিয়ে যাবে। জেলের ঘানি টানতে হবে।'

ছকু মোড়লের মনের সাধ মনেই থেকে যায়। লেঠেলদের জন্যে শুধু তার এক গাদা টাকা খরচ হয়। পেয়াদাকে শুধায়, 'হুকুমটা কবে হৈল্‌ছে হে ?'

পেয়াদা বলে, 'পরশু।'

'তা আনোনি ক্যানে নোটুসটা ?'

'ভেতরে খেল্ আছে, বুঝলেন। কোর্টের বাবুকে হাত করেছে ও-পক্ষ। তাই নোটিসটা দু'দিন চেপে রেখেছে। মধ্যিখানে আপনার কিছু টাকা গলুক, এই আর কি ! তা যাক গে, আমার বখশিস !'

'তুমার বকশিস ? তুমার আবার বকশিস কিসের হে ? আমার সব্বোনাশ করে আমার কাছ থেকেই বকশিস ?'

'আমার দোষ কি বলুন ! আমি তো কাল বিকেল পাঁচটায় পেয়েছি। আজ সকালেই পৌঁছে দিলাম আপনাকে। আমরা হুকুমের চাকর। আপনার যেদিন দরকার পড়বে, সেদিনও ঠিক এমনি আসব।'

ছকু মোড়ল নিরুপায় হয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে চার আনা পয়সা বের করে দেয়। পেয়াদা বলে, 'চার আনা মোড়ল? মোটে চার আনা?'

ছকু মোড়ল আর চার আনা বের করে দেয়। পয়সাটা কপালে ছুঁইয়ে পকেটে রাখে সে। তারপর বলে, 'দেখি, গৌরসুন্দরের একখানা আছে। সামকেও দিতে হবে একখানা।'

তারপর সারা গাঁয়ে ঢোল বাজিয়ে কোর্টের হুকুমনামা জারি হয়।

রামপুরহাট থেকে জেলেরা এসে ফিরে যায়। যাতায়াতের রিক্‌শা খরচ, জলখাবারের পয়সা আদায় করে নিয়ে যায় ছকু মোড়লের কাছ থেকে। মনের দুঃখে বাড়ির ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ে ছকু মোড়ল। সামের বাড়িতে তখনও আসর জমজমাট। খুব খুশি সাম। আনন্দে আটখানা। বলে, 'দেখল্যা তো হে ব্যাপারখানা! সাম ছেড়ে দেওয়ার পাত্তর লয়। সামকে তো চিনে না! ছকু সামকে দেখায় টাকার গরম! বুলি, দেখছি কত দেখব আর, ছুঁচ্যার গলায় চন্দহার।'

গৌরসুন্দর নিজের নোটিসখানা নিয়ে দেখা করতে আসে সামকে। জিজ্ঞেস করে, 'ইটা তুমার যেঞে কিরকম হলো হে?'

সাম হাসতে হাসতে বলে, ওই রকমই, বুঝল্যা গৌরদা। ওই রকমই। সতীদীঘির মাছের এবার ডানা গজাবে। ছকুকে তিভুর্বুন দেখিয়ে ছাড়ব, দ্যাখো ক্যানে!'

ছকু মোড়ল সত্যিই মুষড়ে পড়ে। এই নিয়ে তিন-তিনবার হেরে যেতে হলো সামের কাছে। কালকের ছোকরা সাম, তার কাছে হেরে যেতে হয়েছে ছকু মোড়লকে! লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই তার।

চার

পৃথিবীটা বড় বিচিত্র জায়গা। সাম মোড়লে ছকু মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু সারা গাঁয়ের মানুষ দু'দলে ভাগ হয়ে যায়। এক দলের লোকজন অন্য দলের লোকজনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজের দলের লোকদেরই নেমন্তন্ন হয়, অন্য দলের কাউকে ডাকা হয় না। কারণ দুই মোড়লের একজন যেখানে যাবে, অন্যজন সেখানে পা দেবে না।

সাম মোড়ল ছকু মোড়লের বাড়িতে আসর বসে নিয়মিত —আলোচনা চলতে চলতে ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে থাকে। গানের দলও দু'ভাগ হয়ে যায়, সন্ধ্যেয় দু'জায়গায় গানের আসর বসে। ঢোল হারমোনিয়াম করতালের শব্দে রাতের সাদিনপুর গমগম করতে থাকে।

সিতাবের বড় মুশকিল। ভবতোষ বলেছেন, কোনো পক্ষে যোগ দিবিনে।

ওসব 'ভিলেজ পলিটিক্স্' বড় নোংরা জিনিস, ওসবে মাথা গলাবিনে। কিন্তু ভিলেজ পলিটিক্সে যোগ না দিলে কি করে গাঁয়ে বাস করবে সিতাব ? ডিউটি সেরে এসে কোথায় বসবে ? কার সঙ্গে গল্প করবে ? তাহলে তো তাকে চার দেয়ালের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় !

ডিউটি শেষ হলেই বাড়ি চলে আসে না সিতাব। কেবিনে বই মুখে নিয়ে বসে থাকে। দু'তিনটি ক্লাসের বই সে ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। হাই স্কুলের বই ধরেছে সে। অ্যালজেব্রা এরিথ্‌মেটিক জিওমেট্রি নিয়েই যত গণ্ডগোল। আগে বুধির কাছে এক-আধটু দেখিয়ে নিত। কিন্তু বুধির সময় কোথায় ? সে এখন কলেজে, নিজের পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত। তাই সিতাব রামপুরহাটে একজন মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন। মাসে দশ টাকা।

বলতে গেলে পড়াশোনার ভূতে পেয়েছে সিতাবকে। সব দিন বাড়ি আসা হয় না। পড়তে পড়তে খেয়ালই থাকে না রাত কখন গভীর হয়। তখন শিউপ্রসাদের কাছেই রাত কাটাতে হয় তাকে। শিউপ্রসাদের কাছেই খায়। অড়হরের ডালের সঙ্গে আটার মোটা মোটা রুটি। সিতাবের কিছুতেই আপত্তি নেই যেন।

ফুল্লরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, 'তুমার রাতদিন ডিউটি না-কি গো ?'

সিতাব বলে, 'রাত হয়ে যেল্‌ছিল ফুলি, তাই আর আসিনি।'

যেদিন সকাল সকাল ফেরে, সেদিনও মাথার কাছে আলো নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে থাকে সিতাব। ফুল্লরা পাশে শুয়ে ছটফট করে। একবার এ-পাশ ফেরে, একবার ও-পাশ ফেরে। কখনো অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'এবার ঘুমাও বাছা। আদ্দেক রাত পজ্যন্ত কি সব পড়ো ?'

সিতাব বলে, 'হ হ, এই যে থুই। আর একটুকুন—'

কিন্তু সেই 'একটুকুন' আর শেষ হয় না সিতাবের। ভুলে যায় তার পাশে ফুল্লরা শুয়ে আছে।

ফুল্লরার রাগ হয়। খানিকক্ষণ উসখুস করে সিতাবের হাত থেকে বই কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। সিতাব আপত্তি করে, 'উঁহু-উঁহু, ছাড় ছাড়। আর এইটুকুন দেখে লিয়েই—'

সব কিছু অগ্রাহ্য করে, সম্মুখে এক স্থির আলোকবর্তিকার দিকে যেন এগিয়ে যেতে চায় সিতাব। বেশ-ভূষায় চাল-চলনে সিতাব যেন আর সাদিনপুরের মানুষ নয়। যখন ডিউটি থাকে না, তখন তার পরনে সাবান দিয়ে কাচা পরিষ্কার জামা-পায়জামা। পায়ে চপ্পল। সাম মোড়ল ছকু মোড়ল এখন তার সঙ্গে কথা বলে কিছুটা সম্ভ্রমের সঙ্গে, কিন্তু বুকের মধ্যে জ্বালা বোধ করে। পরশ্রীকাতরতার জ্বালা।

বুধি বলে, 'সিতুদা, আমাদের কোয়ার্টারে তোমার সেই প্রথম মাছ নিয়ে আসার কথা মনে পড়ে ?'

সিতাব হেসে বলে, 'পৈড়্বে না ক্যানে ?'

'তখন তুমি কিরকম চাষাভুষোর মতো ছিলে, তাই না ?'

'আর আখুন ?'

'এখন বাবু। তোমার হবে সিতুদা।'

সিতাবের বুকে সুপ্ত বারুদে আগুন লাগে। তার সারা মন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে থামবে না, থামতে চায় না। কেবিনের ভেতর বসে বসে 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' প্রবন্ধের সেই লাইনগুলো আওড়ায় —'আই সীম্ টু মাইসেল্ফ্ লাইক এ চাইল্ড প্লেইং অন্ দ্য সী-শোর, অ্যাণ্ড পিকিং আপ হেয়ার অ্যাণ্ড দেয়ার এ কিউরিয়াস শেল অর এ প্রেটি পেব্ল্, হোয়াইল দ্য বাউণ্ড্লেস ওস্ন্ অব ট্রুথ লাইস আন্‌ডিস্‌কভার্ড বিফোর মি।'

গ্রামের সঙ্গে বাড়ির সঙ্গে তার যোগসূত্র ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। সেজন্যে ফুল্লরার কাছে কম কথা শুনতে হয় না। কথা শুনতে হয় মায়ের কাছেও। কিন্তু সিতাব নির্বিকার। কোনো কথাই যেন তার কানে ঢোকে না। আধ ঘণ্টা ধরে নানা গঞ্জনা শুনতে শুনতে এক সময় জবাব দেয়, 'হ হ, চুপ কর লে। পরীক্ষাটা দিঞে দেই। তারপর এই ঘর থেকে আর কুথাও লৈড়্বো (নড়ব) না। হুঁ, আখুন আমার পরীক্ষার পড়াশুন্যাটাই আসল।'

তা সিতাব তার চাকরি নিয়ে, পড়াশোনা নিয়ে থাক, তাতে সাদিনপুরের লোকজনের কিছু যায় আসে না। তারা থাকে নিজেদের ভাবনা নিয়ে, নিজেদের জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে। ছকু মোড়ল সাম মোড়ল ঝগড়া করে, তার ফল ভোগ করতে হয় গাঁয়ের মানুষকে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। তাই হয়েছে গাঁয়ের মানুষের অবস্থা। সামের দিকে ঝুঁকলে ছকু চোখ রাঙায়, ছকুর দিকে যোগ দিলে সাম জব্দ করার সুযোগ খোঁজে।

কিন্তু কুমারেশ কিংবা ভোলাদাস গাঁয়ে এলে এই বিভেদের দেয়াল ভেঙে একাকার হয়ে যায়। সামের দলের লোক আর ছকুর দলের লোক গা-ঘেষাঘেষি করে ভিড় জমায় গান শুনতে। একজন আধখানা বিড়ি টেনে আরেকজনের দিকে বাড়িয়ে দেয় নিজের অজান্তেই, 'লাও হে।' সেদিনও সকালবেলা ডিউটি থেকে ফেরার সময় সিতাব দেখল, সাদিনপুরের মানুষ নির্বিচারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কুমারেশের গান শুনছে। নটবরের মুদির দোকানের বারান্দায় বসে গান গাইছে কুমারেশ। কনকপুরে বাড়ি। হাতে-পায়ে কুষ্ঠব্যাধি। একতারা বাজিয়ে গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখে সব সময় হাসি। শরীরের ব্যাধি তার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি আদৌ।

নটবরের দোকানের সামনে রাস্তায় ভিড় জমেছে। বারান্দাতেও বেশ কিছু

লোক। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে। মাটি খুব ভেজা। লাঙলের কাজ বন্ধ। আচমকা কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছুটির আমেজ।

সিতাব ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

কুমারেশ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাত-পা নেড়ে গাইতে থাকে—

সুখ নামে এক পাখি আছে ভাই
দুঃখ নামে আরেক পাখি।
দুখ ধরা দ্যায় বারে বারে
সুখ যে কেবল দ্যায় রে ফাঁকি॥

গান যখন খুব জমে উঠেছে, তখন এলো ভোলাদাস গোঁসাই। কুমারেশের গানে সবাই তন্ময়। ভোলাদাসকে কেউ লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ তার গাবগুবোর তারে ঝঙ্কার ওঠে —গুব্-গুব্ —গুব্-গুব্ —গুব্-গুবা-গুব্ —গুব্-গুবা-গুব্ —। কুমারেশের গানের সঙ্গে বাজনায় তাল দিতে থাকে ভোলাদাস।

ভোলাদাসকে লক্ষ্য করে কুমারেশ। গান গাইতে গাইতে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। হঠাৎ সচকিত হয় জনতা —'গোঁসাই এস্যাছে। গোঁসাই এস্যাছে।'

'এবার তুমার একখান হৈক্ গোঁসাই বাবা।'

'বেশ জম্যাছে। শুরু করো গোঁসাইবাবা।'

ভোলাদাস ভিড় ঠেলে কুমারেশের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দাড়ি-গোঁফের আড়ালে এক ঝলক হাসি। মাথা নাড়তে থাকে সে। বলে, 'হলো না হে। ঠিক হলো না।'

কুমারেশ হেসে বলে, 'তাহলে তুমি গেয়ে শুনাও বাবা। আমাকে কেতাত্থ করো।'

ভোলাদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত। সারা মুখ থমথম করতে থাকে। চোখের দৃষ্টি হয়ে ওঠে অর্থহীন। শূন্য দৃষ্টিতে সুদূর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে সে। তারপর গাবগুবোর তারে আঙুলের ছোঁয়া লাগে। কথা কয়ে ওঠে যন্ত্র— গুব্-গুব্ —গুব্-গুবা-গুব্—

তারপর এক সময় যন্ত্রের অব্যক্ত সুরধ্বনি বাণী হয়ে ঝরে পড়ে—

জীবন বিরিক্ষে আছে রে ভাই
দুইটা পাখির বাসা,
সেই বাসাতে সুখ-দুঃখ
করেন যাওয়া-আসা।

ফুল্লরার দিকে চোখ পড়ে সিতাবের। একাগ্র হয়ে গান শুনছে। ফুল্লরার পাশেই রাধা। জগতকারু একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে রাধার দিকে। হঠাৎ সচকিত হয় রাধা, লক্ষ্য করে, জগতকারু তার দিকে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে তার। হয়তো এখনই জগতকারু তাকে পয়সা

দিতে চাইবে গোঁসাইবাবাকে দেওয়ার জন্যে। সন্ত্রস্ত হয়ে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে।

ভোলাদাস তন্ময় হয়ে গাইছে—

দুঃখ যখন আসে রে, ব্যাধ
ঘুমিয়ে তখন থাকে,
সুখ এলে ধনুক ল'য়ে
লক্ষ্য করেন তাকে।
সুখ উড়ে পালায় ওরে
ছেড়ে বাসার আশা ॥

গান শুনতে শুনতে জগতকারুর মন বিবাগী হয়ে যায়। ছন্নছাড়া খ্যাপা ছেলের মতো বেবশ হয়ে যায়। ভিড ঠেলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ায় সতীদীঘির পাড়ে। রোদ্দুর বেশ চড়া। আকাশ খাঁ খাঁ করছে। বহুদূর দিগন্ত জুড়ে ঘোলাটে আকাশ। কোথাও একটু স্বচ্ছতা নেই। সতীদীঘির কালো জলে শীতলতা। এখন দীঘির জল অনেক নিচে। শালুকফুল পদ্মফুল নেই কোথাও। বক নেই, পানকৌড়ি নেই। এক মুহূর্তে সব কিছু যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। জগতকারুর মনে এক অব্যক্ত ব্যথা। দিন-রাত শুধু একজনের কথাই তার মনে পড়ে —রাধা —রাধা! বড় দুঃখী মেয়েটি! শীর্ণ একহারা গড়ন। চোখ দু'টো সতীদীঘির জলের মতো টলটলে। জগতকারুর যদি সাধ্য থাকত, সব দিয়ে তার দুঃখ দূর করত সে। ভোলাদাস কি সব জানে? দুনিয়ার সব মানুষের কথা?—

জীবন বিরিক্ষে আছে রে ভাই
দুইটা পাখির বাসা,
সেই বাসাতে সুখ-দুঃখ
করেন যাওয়া-আসা।

হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে হাত দেয়। চমকে ফিরে তাকায় জগতকারু। অজস্র দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ভোলাদাসের মিটিমিটি হাসি। অবাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সে।

হাসতে হাসতে ভোলাদাস জিজ্ঞেস করে, 'তারপর? খবর কি?'

জগতকারু বুঝতে পারে না। নির্বাক চোখে চেয়ে থাকে সে।

'তুমার সেই রাধির কথা শুধাছি গো! বুলি, কদ্দূর?'

জগতকারু লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ভোলাদাস সব খবর রাখে। সবার মনের খবর।

'বোলি লজ্জা কিসের! সারা সংসার জুড়েই তো ইসব চৈলছে। যেখানে রাই, সেখানে কানাই। কামিনীকে দেখ্যাছিলি? মনে পড়ে তোর? আমি রে আমি —আমিও তোর মতুন—'

তারপরই হা-হা করে হেসে ওঠে সে। জগতকারুর মুখে রা নেই। হা-হা করে হাসতে হাসতে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে থাকে ভোলাদাস। জগতকারু বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সেই পথের দিকে, যে-পথে ভোলাদাস কাঁধে ঝুলি, হাতে একতারা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

পাঁচ

সারা দেশ জুড়ে ভোট। এ-ব্যাপারে সাদিনপুরেও উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব হয় না। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায় চারদিক। বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে, স্কুল আর স্টেশনের গায়ে রঙ-বেরঙের পোস্টার। অধিকাংশ পোস্টারেই জোড়া বলদ, জোড়হাতে হাসিমুখে নেহেরু। কদাচিৎ কাস্তে-ধানের শিষ, সিংহ, সাইকেল কিংবা গোলাপ ফুল চোখে পড়ে। সেগুলোর ছিরি-ছাঁদও তেমন কিছু না। কংগ্রেসের তেরঙা পোস্টারগুলোর এমনি জলুস যে প্রথমেই সকলের নজর কেড়ে নেয় সেগুলো।

একদিন সাইকেলে চেপে গাঁয়ে এলেন সুনীল মণ্ডল। ঘাড় অব্দি চুল, মোটা গোঁফ। সঙ্গে এসেছিলেন আরও দু'তিন জন। প্রত্যেকের সাইকেলের সামনে একটি করে পতাকা। হাওয়ায় হলুদ রঙের সিংহ উড়ছিল পত্‌পত্‌ করে।

সুনীল মণ্ডল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে গেলেন। বললেন, কংগ্রেস সরকার হলো পুঁজিপতিদের সরকার, জোতদারদের সরকার। গরিব মানুষের কথা তারা ভাবে না, তাদের জন্যে কাজ করার কথা চিন্তাও করে না। ধাপ্পাবাজি দিয়ে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের মানুষের মূল্যবান ভোটগুলি আত্মসাৎ করাই হলো তাদের লক্ষ্য, ছলে-বলে-কৌশলে গদি বজায় রাখাটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুনীল মণ্ডল বলেছিলেন, 'ওরা বলে, আমরা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছি, শিশু রাষ্ট্র আমাদের, দেশের উন্নতির জন্যে এখন আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা দরকার। তা আপনারা কি পরিশ্রম কম করেন? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আপনাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরে না? তার বদলে কি পেয়েছেন আপনারা? সেই পনেরো বছর আগে যে-অবস্থা ছিল, তা বিন্দুমাত্রও বদলেছে কি? একদিন একটু চেপে বৃষ্টি হলে আপনারা আর গাঁ থেকে বেরোতে পারেন না, রাস্তায় এক হাঁটু কাদা জমে। প্রতি বছর ঝড়ে আপনাদের স্কুলের খড়ের চাল উড়ে যায়, স্কুল-বাড়ি পাকা হওয়া তো দূরের কথা, মাথার ওপর টিনের চালও জুটল না আজও। গাঁয়ে একটা জলের কল বসল না, এখনো আপনারা অস্বাস্থ্যকর পুকুরের জল ব্যবহার করছেন, মুখ-খোলা পাতকুয়োর জল খাচ্ছেন। তাহলে কঠোর পরিশ্রমে দেশের উন্নতিটা হলো কি? ধান-কাটা ধান-রোয়ার সময় ছাড়া মানুষ কাজ পায় না, কাজ করতে চায়,

কাজ পায় না। বেশির ভাগ মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে ধুঁকতে থাকে! তারা তো এমন কিছু বেশি দাবি করে না, দয়া বা অনুগ্রহও চায় না, কাজের বদলে খাবার চায়, সেটুকুও তাদের জোটে না কেন? ওরা বলে, শিশু রাষ্ট্র। পনেরো বছর পরেও শিশু রাষ্ট্র! আর কত কাল শিশু রাষ্ট্র থাকবে, জিজ্ঞেস করুন ওদের। পাঁচ বছর আগে ভোট চাইতে এসে ওরা যে-সব কথা দিয়ে গিয়েছিল, সেগুলোর ক'টি কাজে পরিণত করেছে, প্রশ্ন করুন ওদের।'

সুনীল মণ্ডল আবেদন জানিয়েছিলেন, 'আমি আপনাদের কাছে এসেছি অনুরোধ করতে, আপনারা একবার মাহিন্দার বদল করুন। আপনারা মুনিব, আপনাদের ভোটে জিতে যারা সরকার গঠন করে, তারা আপনাদের মাহিন্দার, আপনাদের চাকর। মাহিন্দার যদি মুনিব সেজে বসে, মাহিন্দার যদি অবাধ্য হয়, অকর্মণ্য হয়, তাহলে কি করেন আপনারা? সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন মাহিন্দারটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নতুন মাহিন্দার রাখেন না কি? পনেরো বছর ধরে যাকে আপনারা ভোট দিচ্ছেন, কাজ করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন, তার কাছ থেকে আপনারা কোনো কাজই পাননি। আপনাদেরই ঘরে সিঁদ কেটে কিছু লোককে বড়লোক করে দিয়েছে মাত্র। এখন মাহিন্দার পালটানো দরকার। একবার মাহিন্দার বদল করে দেখুন, ভালো কাজ পান কি-না। কাজ না পেলে পাঁচ বছর পরে আবার বদলাবেন। আসল ক্ষমতা তো আপনাদের হাতেই।'

সুনীল মণ্ডল সাদিনপুরে যেন আগুন ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। ভোটের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। দেবু কলেজে পড়ে, কংগ্রেসের হয়ে খুব খাটছে। পরদিন সকালবেলা সে সাইকেল নিয়ে পার্টি-অফিসে ছুটে গেলো রিপোর্ট করতে। অবস্থা গুরুতর। সাদিনপুরের লোকগুলো আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। এখানে ওখানে কয়েকজন করে জটলা পাকিয়ে গল্প করে সকাল-সন্ধ্যে। সুনীল মণ্ডলের কথা তাদের মনে ধরেছে। সত্যিই তো, গাঁয়ে একটা জলের কল নেই কেন? স্কুলটার এ রকম দুর্দশা কেন? বর্ষায় তারা গরুর গাড়ি নিয়ে রামপুরহাটে যেতে পারে না কেন? সিকি মাইল দূরেই তো পাকা রাস্তা, অথচ এক-হাঁটু কাদার জন্যে গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি বার করাই দায় হয়ে ওঠে। ধান রোয়া ধান কাটার সময় ছাড়া তারা কাজ পায় না, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যের কাছে ছোটাছুটি করতে হয় চারটি ধানের জন্যে, ক'টা টাকার জন্যে। সেই অসময়ে কংগ্রেস সরকার তাদের কাজ দেয় না কেন? তারা ঠিক করে, এবার তারা মাহিন্দার বদল করবে, ভোট দিয়ে তারা নতুন মাহিন্দার পাঠাবে কাজ করার জন্যে। সুনীল মণ্ডলকে ভোট দেবে তারা।

ছকু মোড়ল গজগজ করে, 'ওই লেগেই বোলে, মুরুখ্যুর শত দোষ। আক্কেল থাকলে কি অমনি অমনি মানুষের কথায় ভুলে যায় সব! ভোটের লেগে আখুন কত জন মিষ্টি-মিষ্টি কথা বুলবে। মিষ্টি কথায় ভুলে যেলেই হলো!'

গাঁয়ের মানুষ জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কাকে ভোট দিব্যা মোড়ল ?'

ছকু মোড়ল তেরিয়া মেজাজে জবাব দেয়, 'ক্যানে, দেশের যে রাজা, তাকে ভোট দিবো। আমি কি নিমুখারাম, চামার ? দেশের রাজাকে ভোট দিবো না, ভোট দিবো রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, তাকে ? কি আছে ওর ? ল্যাজ নাই মুড়্যা নাই, ভোট নি-ই চম্পট দিবে। ধৈবৃবি কাকে শুনি ?'

কিন্তু সাম মোড়ল আশ্চর্য নির্বিকার। ভোট সম্বন্ধে একটি কথাও তার মুখে নেই। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জিজ্ঞেস করলে বলে, 'দাঁড়া, এখুনি তো ভোট দিতে যেছিস না, সবুর কর। ভোটের দিন আসুক, তখুন দেখা যাবে।' মোট কথা, সামের মতিগতি বড় রহস্যময়। এবং তার এই নীরবতার অপব্যাখ্যা হয়। লোকে মোটামুটি আন্দাজ করে, সাম সুনীল মণ্ডলকেই ভোট দেবে, সিংহ ছাপে ভোট দেবে। গাঁয়ের মধ্যে খবর ছড়াতে দেরি হয় না।

কয়েকদিন পরে এলো আয়াশের বশীর। কমিউনিস্ট পার্টি করে। পাশের গাঁয়ের লোক, এক মাঠে চাষাবাদ, চেনে সবাই। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। সঙ্গে পার্টির দু'তিন জন হোমরা-চোমরা নেতা। কমরেড আনন্দ রায় বক্তৃতা দিলেন, 'আমাদের পার্টি গরিব পার্টি। গরিব মানুষের পার্টি। আমাদের গাড়ি নেই, টাকা-পয়সাও নেই। তাই আমরা পায়ে হেঁটে হেঁটে প্রচার করে বেড়াচ্ছি। বার বার এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব, সে-সামর্থ্যও নেই আমাদের। বুঝতেই পারছেন, এত বড় নির্বাচন-কেন্দ্র, ভোটের আগে প্রতি গ্রামে একদিন করে যাওয়াটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওদিকে কংগ্রেসের নেতারা প্লেনে হেলিকপ্টারে মোটর গাড়িতে সারা দেশটা চষে বেড়াচ্ছেন, রেডিও-তে দিনরাত প্রচার করছেন। ওঁদের টাকা আছে, হাতে সরকারী ক্ষমতা আছে, সুতরাং ওঁদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। কোটিপতি কল-কারখানার মালিক আর জোতদারেরা লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা দিচ্ছে ওঁদের পার্টি-ফাণ্ডে। কারণ কংগ্রেস সরকার যতদিন গদিতে থাকবে, ততদিন তাদের পৌষ মাস। কল-কারখানার শ্রমিকদের, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের, গ্রাম-গঞ্জের চাষীদের জোঁকের মতো রক্ত চুষে তারা তাদের পুঁজিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলবে। দেশের উন্নতির নামে সরকার তাদের কোটি কোটি টাকা মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কৃষির উন্নতির নামে জোতদারেরা ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা পাবে। সুতরাং তারা সবাই মিলে চেষ্টা করবে, কংগ্রেস সরকার যাতে গদিচ্যুত না হয়। অপরদিকে, আমাদের অর্থবল নেই, সরকারী ক্ষমতাও নেই, আমাদের একমাত্র ভরসা আপনারা। এক বিশাল শক্তিশালী দৈত্যের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে, তার হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, কামান বন্দুক স্টেনগান মেশিনগান —এই সব। অপরদিকে আমাদের হাতে সেই সেকেলে দা-কাটারি তীরধনুক। কিন্তু যদি আপনারা একজোট হন, লক্ষ লক্ষ হাত তুলে একসঙ্গে রুখে দাঁড়ান, তাহলে দৈত্যটাকে পিছু হটতে হবেই।'

আরও অনেক কথা বললেন আনন্দ রায়, বক্তৃতার শেষে সমবেত কণ্ঠে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেওয়া হলো, কিন্তু বিশেষ সাড়া জাগলো না গাঁয়ের লোকগুলোর মধ্যে। সুনীল মণ্ডলের বক্তৃতা তাদের মন কেড়ে নিয়েছে। সুনীল মণ্ডলকেই ভোট দেবে তারা।

তারপর ভোটের কয়েকদিন আগে এলেন কংগ্রেসের লোকেরা। আচমকা নয়, নির্দিষ্ট দিন আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাঁয়ের লোকদের। সেদিন সকাল থেকেই দেবু দৌড়ঝাঁপ করতে লাগল। স্কুল-প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙানো হলো। স্কুলের বেঞ্চগুলো বার করে সামিয়ানার নিচে পেতে দেওয়া হলো। চেয়ার-টেবিল দিয়ে মঞ্চ তৈরি হলো। বিকেলের দিকে নেতারা এলেন। দু'খানা জিপ, একখানা ঝকঝকে বাদামী রঙের গাড়ি। প্রত্যেক গাড়ির সামনে তেরঙ্গা পতাকা। পতাকার মাঝখানে সাদা অংশে চরকা। গাড়িগুলো ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ। আগাগোড়া রঙ-বেরঙের ছবিতে মোড়া। কোনোটায় সহাস্য-মুখ নেহেরুর ছবি, কোনোটায় জোড়া বলদ। কোনো কোনো ছবিতে কংগ্রেস আমলে দেশের অসাধারণ অগ্রগতির নিদর্শন —বড় বড চিমনি বিশিষ্ট কল-কারখানা, মাঠভরা ফসলের মাঝখানে বলিষ্ঠ কৃষকের মুখে প্রাণখোলা হাসি, ইত্যাদি। একটি সুসজ্জিত জিপ নিয়ে কয়েকজন গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেলো জনসভার কথা ঘোষণা করতে। দেবু মাইক্রোফোনে মুখ লাগিয়ে সকলকে অনুরোধ করতে লাগল সভায় যোগদান করার জন্যে। গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। এতদিনে তাদের মালুম হলো দেশে কিরকম ভোটের কাজ চলছে। এই না হলে ভোট!

কংগ্রেস প্রার্থী রামলাল ভকত মান্যগন্য ব্যক্তি। অঢেল টাকা-পয়সা। সিমেণ্ট, লোহালক্কড়, রাসায়নিক সার, ধানের আড়ত প্রভৃতি নানারকম কারবার তাঁর। গতবারেও তিনি এ-অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান সহায়ক কমল হাজরা। অবসরপ্রাপ্ত দরিদ্র শিক্ষক। প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী। খাঁটি গান্ধীবাদী। এখনও তিনি খদ্দর ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। অবশ্য আজ পর্যন্ত একবারও নমিনেশন পাননি তিনি। বলতে গেলে এই সেদিন কংগ্রেসে যোগদান করেছেন ভকতজী, কিন্তু যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ওপর মহলে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। গত নির্বাচন থেকে তাঁকেই নমিনেশন দেওয়া হচ্ছে। তাতে কমল হাজরা মনে দুঃখ পেলেও মুখে কোনোদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেননি।

কমল হাজরাই সর্বপ্রথম সামের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করলেন। ভকতজীর কানে কানে কথাটা বললেন। ভকতজী অবাক! তিনি ছকু মোড়লকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন। ছকু মোড়ল আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা। বলল, 'আজ্ঞে, উ এথ্যানে আসবে না। আমার সাথে মামলা চৈলছে কিনা!'

ভকতজী বললেন, 'মামলা চলছে, তাতে কি হলো? এটা ভোটের ব্যাপার। সবাইকে মিলেজুলে কাজ করতে হবে, ঠিক কি-না?'

তৎক্ষণাৎ সামকে ডাকতে লোক পাঠানো হলো। কুণ্ঠিত পদক্ষেপে সাম কাছে আসতেই তার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরলেন ভকতজী। বললেন, 'আমি কি কোনো দোষ করেছি মোড়ল? দোষ হয়ে থাকলে মাফ করে দিন।'

সাম বিব্রত কণ্ঠে জবাব দিলো, 'না না ভকতজী। আমি তো আছিই।'

ভকতজী আশ্বস্ত হলেন। সভার কাজ শুরু করতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল গাঁয়ের শিক্ষক নিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তীর দিকে। ভিড়ের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ভকতজী তাঁকে কাছে ডেকে সসম্মানে নিজের চেয়ারে বসালেন। গাঁয়ের লোকগুলো বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল নিকুঞ্জবাবুর দিকে। তাঁর এই আকাশচুম্বী মর্যাদা তারা এতদিন পরিমাপ করতে পারেনি। নিকুঞ্জবাবু ও ভকতজী, উভয়ের প্রতিই এক অপরিসীম শ্রদ্ধা অনুভব করল তারা।

অতঃপর সভার কাজ শুরু হলো। সভাপতির জন্য কমল হাজরা গঙ্গাচরণ ঘোষের নাম প্রস্তাব করলেন। দেবু সমর্থন জানাল। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল সভায়।

সভাপতি আসন গ্রহণ করলে বক্তৃতা শুরু হলো। কমল হাজরা উঠে দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। কংগ্রেসের আত্মত্যাগ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের গৌরবময় ভূমিকা, দেশ-গঠনে নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের দেশজুড়ে এক বিপুল কর্মকাণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের নবরূপায়ণে ডঃ বিধান রায়ের কৃতিত্ব, ইত্যাদি। সবশেষে তিনি কয়েকটি প্রস্তাব রাখলেন —গাঁয়ে পানীয় জলের নিদারুণ কষ্ট, যত শীগ্‌গীর সম্ভব, এখানে একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করুন। স্কুলটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভালো নয়, ভকতজী নির্বাচিত হয়ে যেন এগুলো স্মরণ রাখেন, দেশ-সেবার পবিত্র কাজে আত্মোৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের এই ছোট ছোট অসুবিধাগুলির কথাও তিনি যেন মনে রাখেন।

ভকতজী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কমলবাবু যা বললেন, আমি সব মনে রাখব। গাঁয়ে একটা টিউবওয়েল অবশ্যই দরকার, আমি খুব তাড়াতাড়ি, ভোটের আগেই ব্যবস্থা করব। স্কুল এবং রাস্তাও ভালো করা দরকার, কিন্তু এখন আমরা ভোটের জন্যে খুব ব্যস্ত। ভোটের পর অবশ্যই এসব করা হবে। ঠিক কি-না?'

সভায় ভীষণ হাততালি পড়ল।

সন্ধ্যের আগেই দেবু পেট্রোম্যাক্স জেলে নিয়ে এলো। ভকতজী আসন গ্রহণ করে ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যে নিকুঞ্জ চক্রবর্তী, প্রত্যেককে একে একে অনুরোধ করলেন, 'বলুন, আপনারা কিছু বলুন।' নিকুঞ্জ চক্রবর্তী ছাড়া কারোরই কিছু বলতে সাহস হলো না। নিকুঞ্জবাবু উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বক্তৃতা শুরু করলেন। স্কুলের ইতিহাসে কংগ্রেস সম্পর্কে যেটুকু লেখা আছে, তাই গড়গড় করে মুখস্ত বলে গেলেন তিনি। তারপর মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল

নেহেরু থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী এবং সবশেষে সূর্য সেন অনন্ত সিংহতে এসে থামলেন। গাঁয়ের লোক এমন জোরালো বক্তৃতা শুনে প্রচণ্ড হাততালি দিলো।

রামলাল ভকতের জয়-জয়কার পড়ে গেলো। দিন তিন-চারেকের মধ্যেই খাকি উর্দি পরা কয়েকটি লোক এসে গাঁয়ে টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে গেলো। টিউবওয়েল বসল ছকু মোড়লের খামারের দোরগোড়ায়। কেউ কেউ আপত্তি করেছিল, সাম মোড়লও প্রতিবাদ জানিয়েছিল —টিউবওয়েল গাঁয়ের মাঝখানে বসানো হোক, পাঁচজনের সুবিধে হবে। কিন্তু উর্দি-পরা লোকগুলো কারোর কথায় কর্ণপাত করল না।

তাতে সাম মোড়ল ভীষণ ক্ষুব্ধ। কিন্তু একদিন ভকতজীর সঙ্গে দেখা করে আসতেই তার আর ক্ষোভ রইল না। ভকতজীর হয়ে খুব খাটাখাটনি শুরু করল সে। ছকু মোড়ল আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই ভেতরে কিছু টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে।

সিংহই বলো আর কাস্তে-ধানের শিষই বলো, এর পরেও কেউ কি অন্যকিছু আশা করতে পারে ?

বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন রামলাল ভকত। খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক উল্লাসে নাচানাচি করতে লাগল।

ছয়

সিতাবের সামনে টেস্ট পরীক্ষা, এমন সময় চীন ভারত আক্রমণ করল। রেডিও-তে আগেই খবর দিয়েছিল, এখন খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপানো হয়েছে। দুপুরে আসা খবরের কাগজে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন শঙ্করবাবু রজতবাবু দু'জনেই। ভবতোষের এখন নাইট ডিউটি। দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে আরাম করছিলেন। ডাউন বারৌণী প্যাসেঞ্জার চলে যেতেই দ্রুতপায়ে তিনিও স্টেশনে এলেন। শঙ্কর আর রজতের মাঝখানে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন কাগজ দেখার জন্যে। সিতাব হতভম্ব। শিউপ্রসাদ কেবিন থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'লড়াই শুরু হো গয়া বাবু ?'

খবরের কাগজের একপাশে ভারতের উত্তর সীমান্তের মানচিত্র। হিমালয় পর্বত। তারপরে চীন। সাড়ে চার ফুটের বেঁটে বেঁটে লোকগুলো হিমালয় ডিঙিয়ে ভারতে হামলা করেছে। তাজ্জব কী বাত্‌!

ভবতোষ বললেন, 'গেলো মশাই। জাত-ধর্ম সব গেলো। সবাইকে ধরে ধরে এখন আরশুলা ব্যাঙ খাওয়াবে।'

শঙ্কর বললেন, 'কি যে বলেন ভবদা! চীনারা ব্যাঙ খায় না।'

রজত সমর্থন করলেন ভবতোষকে। বললেন, 'যে আরশুলা খায়, সে ব্যাঙ খেতে কতক্ষণ!'

ভয়ে সিতাবের বুক দুরদুর করে।

প্রতিদিন যুদ্ধের খবর আসে। সিতাব সেইসব খবর গাঁয়ে পৌছে দেয়। আরও খানিকটা রঙ চড়ায় খবরের ওপর। গাঁয়ের লোকেরা অনুমান করে, চীনারা প্রায় তাদের দরজার কাছে এসে হাজির হয়েছে। আর দু'একদিনের মধ্যে সাদিনপুর গাঁ-খানাও দখল করে নেবে ওরা। তারপর রামপুরহাট —বর্ধমান —অবশেষে কলকাতা। মাঝে মাঝে দু'একখানা প্লেন উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে, লোকগুলো অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। জাহাজগুলো বোমা ফেলতে যাচ্ছে চীনাদের ওপর।

তারপর একদিন তারে খবর আসে, যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে গাড়ি আসছে। শঙ্কর রজত ছোটাছুটি করেন। শিউপ্রসাদকে বলেন থ্রু-পাস দিতে। পয়েন্ট্স্-ম্যানকে সতর্ক করে দেন। সিতাবকে বলেন টোক্ন্ নিয়ে রেডি থাকতে। একটু গোলমাল হলে, এক মিনিট ডিটেন্ হলে, সবার চাকরি খতম।

সিতাব ভেবেছিল, মিলিটারি আসবাব নিয়ে গাড়ি আসছে, দার্জিলিং মেলের মতো সাঁ করে বেরিয়ে যাবে। ও বাব্বাঃ, সে গরুর গাড়িরও অধম। ঝিকঝিক ঝিকঝিক করতে করতে গাড়িটা আসছে তো আসছেই। তারপর যখন কাছে এলো, সিতাব দেখে অবাক। ইঞ্জিনের কাছে দু'টো কামরায় মিলিটারি পোশাকে সৈন্যরা —যুদ্ধ করতে যচ্ছে। পরের বগিগুলো খোলা, সেগুলোর ওপরে সারি সারি ট্যাঙ্ক্, তাতে কামান লাগানো। শঙ্কর বললেন, 'রজতবাবু, দেখুন দেখুন, ট্যাঙ্ক্ দেখুন। সৈন্যরা ওর ভেতরে বসে যুদ্ধ করে। ঘড় ঘড় করে ট্যাঙ্ক্ চলে আর সৈন্যরা ভেতর থেকে কামান দাগে। পাহাড়-টাহাড় কিচ্ছু মানামানি নেই, বুঝলেন। আর ট্যাঙ্কের গায়ে আপনি যতই গোলাগুলি ছুঁড়ুন, কিস্সু হবে না। ঢালাই লোহার তৈরি।'

ভবতোষও স্টেশনে ছুটে এসেছেন দেখতে। এসেছে বুধি লখী বাবলু। তারকেশ্বরী কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

সাদিনপুরের লোকেরাও দূর থেকে দেখে ট্যাঙ্ক্গুলো।

খুব জোর যুদ্ধ চলছে তাহলে। চীনারা আর এগোতে পারবে না। ট্যাঙ্ক্গুলো একবার গিয়ে পৌছলেই—

শঙ্কর বলেন, 'আমাদের সৈন্যরা তৈরি ছিল না, বুঝলেন ভবদা। তাই প্রথম চোটেই ব্যাটারা আমাদের একটু কাবু করে ফেলেছে। এইসব মালপত্র গিয়ে পৌছলেই দেখবেন, পিঁপড়ের মতো পট্পট্ করে মেরে ফেলবে সব ক'টাকে।'

ভবতোষ আশান্বিত হতে পারেন না। বলেন, 'দেখুন মশাই, কি হয়!'

ক'দিন ছকু মোড়ল সাম মোড়লের ঝগড়াঝাঁটির খবর চাপা রইল। সব জায়গায় যুদ্ধের কথাই আলোচনা হয়। গাঁয়ের লোকেরাও ভাবে বৈ-কি! ভাবে একটু। যুদ্ধ বলে কথা। অনেকে তো যুদ্ধের শুধু নামই শুনেছে, দেখেনি।

বুড়োরা বলে, 'ই কি যুদ্ধ! তুমার ইংরেজ আমলে আমরা যা যুদ্ধ দেখ্যাছি, এই মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক জাহাজ উড়ে যেত —পাখ-পাখালির ঝাঁকের মতুন। তখুনি তো তুমার ওই সুঁড়িচুয়্যাতে জাহাজের ঘাঁটি হলো।'

একজন খবর দেয়, 'সুঁড়িচুয়্যাতে আবার জাহাজ নামছে গো। অনেক মিলিটারি এস্যাছে।'

রামপুরহাটের পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে সুঁড়িচুয়া। ব্রিটিশ আমলে সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। বর্তমানে সেটা সংস্কার করে ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছে। তাদের উত্তেজনার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

সিতাবের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। রোজকার খবরের কাগজ উলটে-পালটে পড়ে। অথচ সামনে টেস্ট পরীক্ষা।

সব স্টেশনের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার —গুজব রটাবেন না। গুজবে কান দেবেন না।

এখন দিনের বেলা ডিউটি না থাকলেও ভবতোষবাবু রোজ একটার সময় স্টেশনে আসেন। কাগজ পড়েন। কাগজ পড়তে পড়তে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়। ভারত যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে, অনেকগুলো ঘাঁটি চীনারা দখল করে নিয়েছে, তাতে উৎকণ্ঠিত হন সবাই। সেদিন কথায় কথায় ভবতোষ বলেন, 'শুনছি না-কি কম্যুনিস্ট নেতাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে!'

শঙ্কর বলেন, 'হুঁ, তাই তো শুনছি। এই কম্যুনিস্টগুলোই দেশটাকে জাহান্নামে দেবে, মশাই।'

রজত জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু ওদের দোষটা কি? কি এমন অপরাধ করেছে ওরা?'

'অপরাধ নয়? কি বলছেন আপনি? ভেতরে ভেতরে আপনিও কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেন না-কি মশাই? আসলে ওরাই তো গোপনে লোভ দেখিয়ে দুশমনদের ডেকে এনেছে। তোমরা বাইরে থেকে আক্রমণ করো, আমরা ভেতর থেকে তোমাদের সাহায্য করব। কি আস্পর্ধা দেখুন! গদির নাগাল পাচ্ছে না বলে পরের হাতে দেশটাকে তুলে দেবে? কত রক্তপাতের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা, আর নিজেদের স্বার্থে তাকে গঙ্গায় ডুবোচ্ছে!'

রজতকে কম্যুনিস্ট বলায় রজত ক্ষুব্ধ হন। বলেন, 'হুঁ, এই স্বাধীনতা হলো কংগ্রেসীদের স্বাধীনতা। তারা শোষণ ও তোষণ নীতি চালিয়ে দেশের এমন সর্বনাশ করতে চলেছে যে মানুষ আর সহ্য করতে চাইছে না। সারা দেশ-জুড়ে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এই সব মানুষের নেতৃত্ব দেওয়াটাই হলো অপরাধ। এদের জব্দ করা দরকার। যুদ্ধ একটা অজুহাত মাত্র। এমন মওকা তো সহজে জোটে না। অতএব ভারতরক্ষা আইন জারি করে ওদের আটক করো। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা যখন গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরে, তখন সংবিধান আদালত

বিচার-ব্যবস্থা সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এসবকে নস্যাৎ করে দিতে একটি অর্ডিন্যান্সই যথেষ্ট। এভাবেই কংগ্রেস সরকার দেশের মানুষকে বোঝাতে চায়, তোমাদের ভালো করার জন্যে বড় বড় কথা বলে যারা, তারা আসলে দেশদ্রোহী। অতএব, এদের সংস্পর্শ থেকে তোমরা দূরে থাকো। আর দেশের মানুষ যদি তাদের বর্জন করে, তাহলে কংগ্রেস-নেতাদের মোচ্ছব যেমন চলছে, তেমনি পুরোদমে চলতে থাকবে।'

শঙ্কর বলেন, 'বাজে কথা বলবেন না। নেহেরুর মতো নেতা হয় না। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নজির দেখাতে পারবেন না। সব জেনেশুনেও তিনি প্রথমে বাড়াবাড়ি কিছু করতে চাননি। বিরোধী দলের সমস্ত নেতাকে ডেকে মিটিং করলেন। দেশের এই বিপদে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। এই সঙ্কটে এখন আর বিরোধিতা নয়, নিজেদের মধ্যে ঝগডা বিবাদ নয়, সব ভুলে এখন শত্রুর মোকাবিলা দরকার। তা মশাই, উলটে কি-না নেহেরুকেই দোষারোপ! বলে কি-না, চীন আক্রমণ করেনি, চীনের কোনো দোষ নেই, ভারতই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে। আর অমনি, সব ক'টাকে ধরে জেলে ভরে রাখার হুকুম দিলেন নেহেরু। বললেন —জেলখানাটাই ওদের বাস করার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা।'

'তাহলে এটা কিরকম গণতন্ত্র হলো?'

'গণতন্ত্র বড, না দেশ বড মশাই?'

'দেশ বলতে তো আপনারা বোঝেন শুধু একটি ভৌগোলিক সীমারেখা। দেশের মানুষকে তো আপনারা ধর্তব্য বলে মনে করেন না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোনরকমে দখল করতে পারলেই দেশপ্রেমিক হওয়া যায়। দেশের উন্নতি, দেশের মঙ্গল, দেশের কল্যাণ প্রভৃতি গালভরা শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আপনারা দেশের নব্বুইভাগ মানুষের ওপর পেষণ-যন্ত্র চালান, আর মানুষ তার প্রতিবাদ করলেই আপনারা তাদের বলেন দেশদ্রোহী। তখন তাদের জব্দ করার জন্যে রাষ্ট্রপতির রাবার-সীলের ছাপ দেওয়া একটা হুকুমনামা বার করেন আপনারা —অর্ডিন্যান্স, যা দিয়ে, ন্যায়বিচারের ক্ষীণতম আশ্বাস পাওয়া যায় যার কাছে, সেই মহামান্য আদালতকেও ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায় সহজে।'

দু'জনের বাদানুবাদ চলতে থাকে।

তারপর হঠাৎ একদিন খবর আসে —সীজ্ ফায়ার। ইউনিলেটেরাল সীজ্ ফায়ার। চীন একতরফা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করেছে।

সবাই খুশি। শঙ্কর বলেন, 'দেখলেন তো রজতবাবু, গুঁতোর চোটে ব্যাটারা পালাবার পথ পায় না।'

রজত বললেন, 'আসলে ওরা লড়াই চায়নি।'

শঙ্করের মেজাজ গরম হয়। বলেন, 'কি বললেন? লড়াই চায়নি তো লড়াইটা হলো কি করে? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এবার শীত পড়বে। হিমালয়ের

পথঘাটগুলো বরফে ঢেকে যাবে। ব্যাটারা ফিরে যাওয়ার পথ পাবে না। ট্র্যাপে আটকা পড়ে যাবে সবাই। বরফে জমে যাবে একেবারে। দেখেননি পেপারে লিখেছিল —যুদ্ধ যদি ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে চীন বেকায়দায় পড়বে।'

ভবতোষ বলেন, 'কিন্তু চীন তো ভারতের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে। সেটা উদ্ধার করতে হলে ভারতকে তো ফের যুদ্ধ করতে হবে!'

শঙ্করের মুখ বিষণ্ন হয়। বলেন, 'হুঁ, এটা একটা ফ্যাক্টর।'

কিন্তু সে যাই হোক, মোট কথা, যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে সবাই খুশি।

সাত

সিতাব পাস করেছে। সেকেণ্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে সে। এমন এক বিস্ময়কর খবর দেখতে দেখতে সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যে-ছেলেটা আলকাপের গান করে বেড়াত, সারাদিন মুনিষ খেটে পেটের ভাত জোটাতে পারত না, সে-ছেলেটা নিজের চেষ্টায় মানুষের মতো মানুষ হলো। সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

তা এই গৌরব লাভ করতে গিয়ে সিতাবকে কি কম কষ্ট করতে হয়েছে? সাদিনপুরের জনজীবনে কত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে —দেশ জুড়ে ভোট, চীন-ভারত যুদ্ধ, এসবও গেছে —কখনো কখনো যে তার চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি, সে-কথা বলা যাবে না। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে, নিজের লক্ষ্যের প্রতি একাগ্র হয়েছে। গাঁয়ে আসা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। বাড়িতে তার মা আছে, ফুল্লরা নামে একটি মেয়ে তার পথ চেয়ে থাকে, এসব যেন তার ভাবনা-চিন্তার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করত না। কখনোও বাড়ি এলে মায়ের বকুনি খেতে হতো, ফুল্লরার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি হতো। ফুল্লরা অভিমান করে বলত, 'যাও না, ইস্টিশিনে তুমার বাপের ঘরবাড়ি আছে, উথ্যানে যাও। এথ্যানে আসার দরকার কি?' সিতাব রেগে গিয়ে বলত, 'হ, ইস্টিশিনে আমার বাপের ঘরবাড়ি আছে। থাকব উথ্যানে।' কখনো কখনো রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, বেশ কিছুদিন এদিকের পথ মাড়াত না।

তখন না-হয় সামনে পরীক্ষা ছিল, কিন্তু এখন? এখনও স্টেশন তার ঘরবাড়ি কেন?

সিতাব নাইট কলেজে ভর্তি হয়েছে। পড়াশোনা করছে বলে ডিউটি-রোস্টারে সুবিধে দেওয়া হয়েছে তাকে। সন্ধ্যের আগে কলেজে যায়। ফিরে এসে স্টেশনেই রাত কাটায়। কিন্তু কলেজ করছে বলে বাড়ি না আসার কারণ থাকতে পারে না। আসলে গাঁয়ে আর ফিরতেই ইচ্ছে করে না তার। ফুল্লরার কথা যেন মনেই থাকে না।

এখন তার সমগ্র চেতনা জুড়ে শুধু বুধি। এক আশ্চর্য মেয়ে বুধি। সে যেন জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক উজ্জ্বল প্রেরণা হয়ে আছে সিতাবের কাছে।

হ্যাঁ, তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে বুধি। বড় আনন্দ বড় বেদনার স্মৃতি হয়ে আছে সে।

ভবতোষ এখান থেকে বদলি হয়ে গেছেন শ্রীরামপুরে। নিজেই দরখাস্ত করেছিলেন বদলির জন্যে। ছেলেমেয়েরা বড হচ্ছে, উঁচু ক্লাসে উঠছে, তাদের পড়াশোনার যাতে সুবিধে হয়, সেজন্য কলকাতার কাছাকাছি বদলি চেয়েছিলেন তিনি। অর্ডার হতেই প্রথমে তিনি একা গিয়ে কাজে যোগ দিলেন। তারপর একদিন এসে গোটা সংসারটাকে গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

সিতাবের কাছে পৃথিবীটা এখন শূন্য মরুভূমির মতো। যেন এই পৃথিবীতে মা নেই, ফুল্লরা নেই, বুধি নেই —কেউ নেই তার।

সাদিনপুরের মানুষজন থেকে সিতাব দূরে সরে গেলেও সাদিনপুরের মানুষ তাকে সহজে ভোলে না। সিতাব তাদের গর্ব। কেউ কেউ বলে, 'সিতু ছোঁডাটা দেখিয়ে দিলো বটে!' কেউ আবার মন্তব্য করে, 'সিতু এবার টিকিটবাবু হঞে যাবে!' ছকু মোডল বলে, 'হুঁঃ, টিকিটবাবু হবে না কচু! অমন ম্যাট্রিক পাস কত আছে!' সিতাবের ওপর এক প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ আছে ছকু মোডলের। সামের সঙ্গে ফৌজদারি মামলায় সে ছকুর হয়ে সাক্ষি দিতে চায়নি। আগে যে-সিতাব তার খামারে এসে বস্তা হাতে নিয়ে দাঁডিয়ে থাকত চারটি ধানের জন্যে, সেই সিতাবকে সাক্ষি দিতে বললে সে এখন তার গরমেণ্টের চাকরি দেখায়। গাঁয়ে থাকলে একদিন না একদিন এই ছকু মোডলেরই কাছে এসে তাকে হাত জোড় করতে হতো। কিন্তু কি আর করা যাবে, সিতাব এখন তার নাগালের বাইরে। আর সিতাব তো শুধু একা নয়, ছকু মোডলের ক্ষোভ গাঁয়ের আরও অনেকের ওপর, সামের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে যারা, তাদের সকলের ওপর।

ক্ষোভের কারণ আছে বৈ-কি! ফৌজদারি মামলায় ছকু হেরে গেছে। আসামীরা বেকসুর খালাস পেয়েছে। সাম আদালতে স্বীকার করেছিল সব কথা। বাডিতে তার কাজ ছিল, সারা গাঁয়ের লোকের নেমন্তন্ন ছিল। মাছ ধরার সময় তাদের অনেকেই হাজির ছিল সতীদীঘির পাডে। তাদের হাতে বল্লম বর্শা লাঠি কিচ্ছু ছিল না। মাছ ধরা দেখতে গিয়েছিল তারা। হাঙ্গামার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মাছ ধরার আগে কোনো শরিকই আপত্তি করেনি। ছকু মোড়ল নিজে সেদিন তার পূজোর কেনাকাটা করার জন্যে রামপুরহাট গিয়েছিল। আর এক শরিক গৌরসুন্দর পাল হাজির ছিল ঘটনাস্থলেই।

উকিল বলেছিলেন, সামের সতীদীঘির অংশ ক্রয় বৈধ কি অবৈধ, সেটা আলাদা প্রশ্ন। তার মীমাংসার জন্য দেওয়ানী আদালতে কেস চলছে। সেখানেই স্বত্বের

মীমাংসা হবে। যতদিন তার মীমাংসা না হয়, ততদিন ভৈরবের স্বত্বে সামই স্বত্ববান, যেহেতু ভৈরবের বিক্রয়-কোবালা এখনও তার হাতে। এবং ততদিন সাম সতীদীঘির সর্বপ্রকার ভোগ-দখলে অংশীদার।

কোর্টের কাছে সামের মাছ ধরা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়নি। অন্যদিকে ছকু যে অভিযোগ এনেছিল, সাম এবং সামের লোকেরা লাঠি বর্শা বল্লম প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সতীদীঘির পাড়ে সমবেত হয়েছিল, তা-ও প্রমাণিত হয়নি। ছকুর সাক্ষীরাই সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। তার অন্যতম সাক্ষী শিবু উকিলের জেরায় বলেছিল, হ্যাঁ, সাম মোড়ল মাছ ধরেছিল, তবে তাদের কারোর হাতে ওই রকম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

অতএব, ছকু মোড়লকে আবার হারতে হলো। নেয়ামত বলল, 'তুমার সাক্ষীরাই সব মাটি করে দিলে হে মোড়ল। তুমি ঠিক মতুন সাক্ষীই যোগাড় কৈর্‌তে পারল্যা না।'

ছকু মোড়ল রাগে গজগজ করে। বলে, 'হারামজাদারা সব বেইমান নেয়ামত। সব শালা বেইমান। যার খায়, তারই বুকে বসে দাড়ি উপড্যায়, বুঝল্যা হে। নইলে তুমার ওই শিবুটা, হারামজাদার জন্যে আমি কি করিনি? ব্যাটা মাগ্‌-ছেলে নি না-খেয়ে মৈর্‌ছিল, এই ছকু ছিল বুলেই আখুনো বেঁচে আছে। আব ব্যাটা নিজ্জলা মিথ্যা বুললে হলফ করে?'

তা হলফনামা পড়ে শিবু যদি মিথ্যে কথা বলে থাকে, তার ফল সে নিজেই ভোগ করবে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভগবান তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই?

আর ভগবান শিবুকে প্রতিফল দিলো ছকু মোড়লের হাত দিয়েই। ব্যাটাকে উচ্ছন্ন করে ছেড়ে দিলো। এখনও ভগবান আছে, এখনও রাতদিন হয়।

বারো কাঠা দো-ফসলাতে গম ছিল শিবুর। সেই গমের শিষ পাকতে না পাকতেই ছকুর লোকেরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেটে নিয়ে এলো। অর্ধেক গমের দানা তখনও পুষ্ট হয়নি। বুকটা ফেটে যাচ্ছিল শিবুর। পনেরো-বিশ জনে গম কাটছে কাস্তে দিয়ে, ছকু জমির আলের ওপর ঘোরাঘুরি করছে। শিবু গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছকুর পা দু'টো চেপে ধরল —'আমাকে মাপ করো মোড়ল, তুমার পায়ে পড়ি। আমার সব্বোনাশ করিও না।'

ছকু মোড়ল কোনো জবাবই দিলো না। তাড়াতাড়ি হাত চালানোর জন্যে লোকগুলোকে হাঁকডাক শুরু করল সে। যারা গম কাটছে তারা গাঁয়েরই লোক, একসঙ্গে ওঠা-বসা গল্পগুজব করেছে কত, ক্ষেতে-খামারে একসঙ্গে কাজ করেছে, অথচ তারা একবার শিবুর দিকে ফিরেও তাকাল না। এখন ছকু মোড়ল যদি তাদের হুকুম করে —শিবুর পাঁজরাকাঠিগুলো একটা একটা করে উপড়ে নে, তাতেও তারা পিছপা হবে না।

গাঁয়ে ফিরে এসে সাম মোড়লকে ধরল শিবু। সাম বলল, 'আমি কি কৈর্‌বো শিবুকাকা? তুমি তো মোড়লেরই লোক, মোড়লের হঞে কোটে সাক্ষি দিল্যা। আখুন ভালো করে লোক চিনে লাও।'

শিবু বলল, 'আমি মিথ্যা বুলিনি সাম। আমি একটাও মিথ্যা কথা বুলিনি। তাতেই ছকু আমার সব্বোনাশ কৈর্‌লে।'

'ত্যাখো, গাঁয়ে আর পাঁচজনকে বোলো। তারা কি বোলে, জানো আগে।'

কেউ এগিয়ে এলো না শিবুর হয়ে। আইনের দিক দিয়ে ছকু মোড়লের কোনো অন্যায় হয়নি। শিবুর সবসুদ্ধ সাতাশ কাঠা জমিই এখন ছকুর, রীতিমতো রেজেস্ত্রি দলিল হয়ে গেছে। শিবু বুক চাপড়াতে থাকে বাড়িতে বসে, 'আমি ক্যানে সাদা কাগজে টিপ দিয়্যাছিল্যাম? আমার আখুনো মরণ হলো না ক্যানে। হে ভগবান, হে ঠাকুর, ছকু যেন নিব্বংশ হয়, ছকুর মাথায় যেন বাজ পড়ে!'

কিন্তু ভগবান বেচারা একসঙ্গে কত দিক সামলাবে! শিবুর কথাগুলো ভগবানের দরজা অব্দি পৌছয় না। শূন্যে পাক খেতে খেতে ফিরে আসে শিবুর কাছেই।

এই একটি ঘটনায় শিবুর বাড়ির সকলেই মুহ্যমান, যেন মৃত্যুশোকে পাথর হয়ে গেছে সবাই। শুধু শিবুর একটি অবোধ শিশু পটু, ইদানীং একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে আনমনে ঘুরে বেড়ায় আর বিড়বিড় করে বকে। তার শিশু-মনে কি ভাবের উদয় হয়, কেউ জানে না। কখনো কখনো আধ-ভাঙা পাঁচিলের ওপর সে তার কঞ্চি দিয়ে সপাসপ আঘাত করে আর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'শায়া, আর কৈব্বি, বোল্। শোধ মেরে ফেলব শায়াকে।'

কিন্তু সে যাই হোক, সংসারে এ-ঘটনার তেমন গুরুত্ব না থাকলেও শিবুর জীবনে ঘটনাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে এখন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। অভাবে-অনটনে কারোর কাছে ধার-বাকি পায় না সে। কাজের জন্যে এখানে-ওখানে ছুটে বেড়ায়। চাষের কাজ বন্ধ হলেই বেকার। ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাহারে ধুঁকতে থাকে।

একদিন সে সন্ধ্যেবেলা সিতাবের সঙ্গে দেখা করতে গেলো স্টেশনে। সেদিন রোববার। কলেজ বন্ধ। সিতাব স্টেশনেই ছিল। শিবু বলল, 'সিতু, তোর সাথে কথা ছিল।'

সিতাব তাকে সঙ্গে নিয়ে লাইন ধরে হেঁটে গেলো বেশ কিছুদূর। তারপর লাইনের ধারেই বসল দু'জনে। শিবু তার দুঃখের কথা সব জানাল সিতাবকে। তারপর বলল, 'তোদের রেলে আমাকে একটা কাজ দেখে দে না!'

সিতাব চোখ কপালে তোলে। বলে, 'রেলের কাজ? বাপ রে বাপ! রেলের কাজ কি অত সুজা শিবুকাকা? কত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে—'

'তবে তুই যে পেয়ে যেলি?'

'আমি কি আর পেয়্যাছি? আমার বাপেরও সাধ্যি ছিল না। টিকিটবাবুর দয়াতেই হৈল্‌ছিল।'

'তা টিকিটবাবুকেই বোল্ আমার লেগে। না খেঞে ছেলেগুলিন মৈর্‌ছে। যদি কিছু লেয়, বাড়িটুকুন বিচে-খুচে দিবো না-হয়।'

'হবে না শিব্‌কাকা। প্রথমে ধরো, টিকিটবাবু চলে যেল্‌ছে এখ্যান থেকে। আখুন উ শ্রীরামপুরে। তার ওপর, রেলের চাকরিতে বয়েসের ব্যাপার আছে। তুমার ই-বয়েসে আর গরমেণ্টের চাকরি হবে না শিবুকাকা।'

হতাশ হয় শিবু। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে বসে ভাবে। তারপর বলে, 'তুই তাহলে আমাকে কিছু টাকা দে সিতু। আমি কারবার কৈর্‌বো।'

'কিসের কারবার কৈর্‌ব্যা তুমি শিবুকাকা?'

'এই ধর, মাথায় করে মনিহারী জিনিস-টিনিস নি গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরি কৈর্‌বো সিতু। কিছু টাকা দে আমাকে।'

সিতাব ভাবে। টাকা কোথায় তার? যা মাইনে পায়, তা দিয়ে সংসারের খরচ চালিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা কলেজের মাইনে আর বইপত্তরেই চলে যায়। বলতে গেলে, হাতে থাকে না কিছুই। কোত্থেকে সে টাকা দেবে শিবুকে? বড় অসহায় বোধ করে সিতাব।

শিবু বলে, 'দে সিতু ক'টা টাকা। তুই মাসে মাসে মাহিন্যা পেছিস, তোর কষ্ট হবে না। আস্তে আস্তে শোধ করে দিবো তোকে।'

সিতাব বলে, 'আখুন তো নাই শিবুকাকা। মাহিন্যা পাই, তখুন দেখব।'

তারপর সত্যিই একদিন গ্রাম থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় শিবু। গাঁয়ের একজন মুনিষ কমে যায়। ঝাঁকায় নানারকম মনিহারী জিনিস সাজিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। সস্তা জিসিসপত্র। আলতা, সিঁদুর, নখপালিশ, স্নো, পাউডার, আয়না, চিরুণী, ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট খেলনা ইত্যাদি। এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় সে। মাঠের আল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশের জমি দেখে তার বুকটা অকস্মাৎ ছ্যাঁক করে ওঠে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে, মাখনের মতো মোলায়েম মাটিতে ধানের কচি কচি চারা রোপণ করছে সে, সবুজ গমের জমিতে জল দিচ্ছে, আখের লম্বা লম্বা পাতা ভেঙে গাছগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। সবুজ শস্যের মিষ্টি গন্ধে তার বুক তোলপাড় করে। সকালে উঠেই আবার ঝাঁকা নিয়ে তাকে বেরোতে হয়। রাতের স্বপ্নের কথা সারাদিন মনে করার ফুরসতই পায় না সে।

সাম বলে, 'ই তুমি কি কৈর্‌ছো শিবুকাকা? এতে কি তুমার পেট ভৈর্‌বে? উসব ছেড়ে দাও। ছকু না দিক, আমি জমি দিছি, ভাগচাষ করো। গরু-লাঙল করে দিবো তুমার। ছি-ছি, চাষার ছেলে হঞে কুলির মতুন মাথায় ঢাকি (ঝাঁকা) নি—'

গাঁ থেকে একজন মুনিষ চলে যাচ্ছে, কম ক্ষতি নয়, সে-হিসেব করে সাম। শিবুকে লোভ দেখায়। শিবু হাসে। বলে, 'আর খাটাখাটি কৈর্‌তে পারব না সাম। গায়ে-গতরে আর সে-বল নাই। এতেই দু'পয়সা হছে, কুনুরকমে সংসার চৈল্‌লেই হলো।'

ওদের কথার ফাঁদে আর পা দিবে না শিবু। ভাগচাষে জমি, গরু, লাঙল— তারপর সাদা কাগজে টিপসই —তারপর একদিন চোখ মেলে দেখবে শিবু, কখন তার মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও চলে গেছে। শিবু এবার সতর্ক। আর সে ভুল করবে না। মানুষ বারবার ভুল করে না।

আট

এখন গৌরসুন্দরের বড় কষ্ট। সাড়ে ছ'বিঘে জমি, নিজের হাতে চাষবাস করেও সংসার চলে না। পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে হিমসিম খায় সে। বছরে বছরে ধার-দেনা বাড়ে। শক্ত-সুঠাম শরীর এখন কিছুটা ভেঙে পড়েছে। আগের মতো আর বুক চিতিয়ে হাঁটতে পারে না, আপনা থেকেই পিঠ কুঁজো হয়ে যায়। বড় মেয়েটিও প্রায় বিয়ের যোগ্য, সে-ও এক দুশ্চিন্তা। অসময়ে ধান নিয়ে সামের কাছে বেশ কিছু কর্জ। শরীরের আর দোষ কি!

বাড়িতে একটা গরু ছিল। গরুটা সরিয়ে দিতে হয়েছে। জমির সামান্য খড়ে বছর যায় না। দু'টো বলদের খাবারেরই সাশ্রয় হয় না, সারা আশ্বিন মাসটা তো মাঠের ঘাস কেটে এনে চালাতে হয়। তার ওপর গরু পুষতে গেলে জমির খড়ে বছরের ছ'মাসও পেরোবে না। তাই গরুটা একদিন বিক্রি করে দিয়েছিল গৌরসুন্দর। ছেলেমেয়ের মুখের সামান্য দুধটুকুও বন্ধ।

এদিকে জমিজমা কমে যাওয়ার জন্যে মদনকেও ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে।

সংসারের ঝামেলা, চাষের কাজ —গৌরসুন্দর ভালো করে কথা বলার ফুরসতই পায় না বাসন্তীর সঙ্গে। ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকানোর সময় হয় না। গৌরসুন্দরের বড় ইচ্ছে ছিল, বাড়ির সব ছেলেমেয়েকে ভৈরবের মতো লেখাপড়া শেখাবে। পালদের বাড়ি বললেই অঞ্চলের লোকেরা যেন বুঝতে পারে, যে সে বাড়ি নয়, রীতিমতো শিক্ষিত বাড়ি। কিন্তু মানুষের সব সাধ পূর্ণ হয় না। বড় মেয়ে সুধাকে স্কুল ছাড়াতে হয়েছে, তার পরের ছেলেমেয়েগুলোও দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বখাটে ছেলের পালে মিশে গেছে ওরা।

এক-একদিন মাঠের কাজ সেরে সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরলে অভিযোগ শোনায় বাসন্তী। বলে, 'সুধার তো কিছু হলো না। ছেলেগুলিনের দিকে একটুকুন নজর দাও। সব যে ভেসে যেছে!'

কর্কশ হাত-পায়ে একটু সরষের তেল মালিশ করতে করতে গৌরসুন্দর জিজ্ঞেস করে, 'ইস্কুলে যায়নি আজ ?'

'আজ বুলে আজ ! ইস্কুলে যায় কবে ?'

গৌরসুন্দর চুপচাপ শোনে। কি করবে সে ? কি করতে পারে ? নিজে দেখাশোনা না করতে পারলে কি ছেলেপিলে মানুষ হয় ? মাঠের ফসল, তাই দু'দিন না দেখলে নষ্ট হতে বসে, এ তো সব হাত-পা ওয়ালা ছেলেমেয়ে !

'মেয়েটার কথাও ভাবো একটুকুন। দিন দিন ধিঙ্গী হঞে উঠছে। শেষে—'

গৌরসুন্দর সব চুপচাপ শুনে যায়। সুধাকে লেখাপড়া শেখানোর কত ইচ্ছে ছিল তার। লেখাপড়াতে ভালোও ছিল। কিন্তু যখন সে ভাবছে, ওকে ভৈরবের কাছে পাঠিয়ে দেবে, ওখানে ভালো স্কুলে লেখাপড়া শিখবে, ঠিক তখনই ভৈরব এসে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেলো।

সম্পর্ক ছিন্ন ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ! যেটুকু যোগাযোগ, তা শুধু চিঠিপত্রের মাধ্যমে। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে সেই যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে যায় ! বলতে গেলে, ও-পক্ষই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।

• এদিকে সংসার যেন আর কিছুতেই চলতে চায় না। ঋণে ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে গৌরসুন্দর। জমি চাষাবাদ করার খরচপত্রেরও সংস্থান করতে পারে না। বাসন্তী বড চুপচাপ। যেন কোথাও কোনো অবস্থান্তর ঘটেনি। কোনো অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মন দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় অস্থির। চোখ দু'টো কোটরে বসে গেছে, চোয়ালের হাড দেখা যায় বেশ উঁচু। গৌরসুন্দর চেয়ে দেখার সময় পায় না।

অবশেষে সামের কাছে যায় সে। বলে, 'একটুকুন জমি লাও ভাই সাম।'

সাম বলে, 'জমি ? তুমি জমি বিচব্যা গৌরদা ?'

'আর চলে না ভাই। তুমার কাছে অনেক ধার-দেনা। মাথার ওপর চাষ—'

'আমার কাছে ধার-দেনা, উ-কথা ছাডো। যখুন তুমি পারব্যা, দিও। কিন্তু আখুন যে আমার হাত একেবারে খালি। সতীদীঘির মামলা-মোকদ্দমায় কত যেছে, দেখতেই পেছো গৌরদা। তার ওপর, রাধার মা-র বাড়িটুকুনও লিতে হলো সেদিন।'

'রাধার মা বাড়ি বিক্রি কৈর‍্লে ? সবটুকুন ?'

'হ্যাঁ, বুলতে যেলে সবটুকুনই। মেলাই ধার-বাকি ছিল আমার কাছে, উসব তো আর শুধ্‌তে পারত না কুনুদিন। তা আধ কাঠা জায়গা থুঞে দিলাম, ধরো একটা ঘর থাকল। মেয়ে দু'ট্যার বিয়ে হলে তো আর ওর ঝামেলা নাই —একটা মানুষ, উখ্যানেই থাকতে পারবে।'

একটা ঘরে একটা মানুষ, বেঁচে থেকেও কবরের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে বাস করবে সুমাদিসের বউ। গৌরসুন্দর চুপচাপ ভাবে। তারপর বলে, 'তুমি না লিতে

পারলে অন্য কাউকে দেখতে হবে। তুমার যেঞে, আমার উ-ছাডা আর চারা নাই হে।'

সাম পরামর্শ দেয়, 'জমি বিচলে তুমি খুব অসুবিধ্যায় পৈড়্‌ব্যা হে। আমি বোলি, জমি আর ছাড়িও না। তার চেঞে এক কাজ করো, সতীদীঘির অংশটা দিঞে দাও। জানি, ছকু আমার ওপর আবার মামলা কৈর্‌বে, তা করুক। তবু তুমার জমি বিচ্যাটা ঠিক হবে না। বরং কিছু টাকা-পয়সা খর্চা করে, তুমাব যেটুকুন জমি আছে, ভালো করে চাষবাস করো। ওতেই সংসার চৈল্‌বে। ক্যানে চৈল্‌বে না?'

'দেখি। ভেবে দেখি।' সেদিন উঠে যায় গৌরসুন্দর।

বাড়িতে এসে বাসন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে। বাসন্তীর কোনো কিছুতেই 'না' নেই। গৌরসুন্দর যা ভালো বোঝে, তাতেই তার সম্মতি। তবু একটা দুঃখ একটা বেদনায় সারা মন চনচন করে ওঠে। সতীদীঘির মাছ ধরার সময় ছেলে-মেয়েদের কত খুশি—মাছ নিয়ে ছেলেমেয়েদের কত হৈ-চৈ! দু'দিন আগেও সতীদীঘির মাছ ধরার সময় 'আমাদের কত মাছ—আমাদের কত মাছ' বলে ছেলেমেয়েরা আনন্দে নাচানাচি করেছে। সতীদীঘি বিক্রি করে দিলে তারা আর সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দূর থেকে দেখবে, সতীদীঘির মাছ ধরা হচ্ছে, মাছ ভাগ-বাঁটোয়ারা হচ্ছে।

কিন্তু কি আর করা যাবে! অন্য কি আর উপায় আছে! লোকটা তো তার চোখের সামনেই দিনরাত খেটে খেটে বুড়িয়ে গেলো। এত বড় সংসার—সে-ই বা দু'হাতে আর কত করবে? যাক, সতীদীঘি যাক। কপালে থাকে, আবার হবে।

অবশেষে একদিন সতীদীঘির অংশ রেজেস্ট্রি করে দিয়ে এলো গৌরসুন্দর। ভৈরবকে যা দাম দিয়েছিল, সেই দামই তাকে দিলো সাম। কিন্তু এবার দলিলে দাম লেখা হলো আরও বেশি। দশ হাজার। পারলে ছকু মামলা করুক। প্রিএম্প্‌শন্‌ স্যুট। আরও দশ হাজার টাকা জমা দিক কোর্টে। সতীদীঘির জন্যে জমি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হোক ছকু।

সে-কথা ছকুর কানে উঠতে বেশি দেরি হয় না। সে বাড়িতে আস্ফালন করল অনেক। গৌরসুন্দরের বাড়িতে এসে গালাগালি দিয়ে গেলো। বলল, 'আমার পিছনে লেগ্যাছিস? আমাকে সব্বোস্বান্ত করার লেগে জোট বেঁধ্যাছিস? আমি কি তোর পাকা ধানে মই দিতে যেল্‌ছিল্যাম, অ্যাঁ? হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, নিমুখারাম!'

গৌরসুন্দর কোনো জবাব দেয়নি। সতীদীঘি বিক্রি করে তার মন এমনিতেই ভারাক্রান্ত। ছকু মোড়লের সব গালাগালি সে নীরবে সহ্য করল।

কিন্তু গৌরসুন্দর তখনও বুঝতে পারেনি, ছকু কতখানি হিংস্র হতে পারে।

কতখানি ভয়ঙ্কর! বুঝল আরও কিছুদিন পরে, নেহাত আকস্মিকভাবেই। ছকু যেন প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজছিল এতদিন। শুধু একটা অজুহাত মাত্র।

সেই সুযোগই সে পেয়ে গেলো চাষের সময়। শ্রাবণ মাসে।

বর্ষায় মাঠঘাট জলে থৈ-থৈ করছে। চাষ শুরু হয়েছে। সারা মাঠ জুড়ে লাঙল বওয়া, ধান রোয়ার কাজ চলছে। লোকজনের উৎসাহের সীমা নেই। গৌরসুন্দরের জমিতেও রোয়ার কাজ চলছে, সে ছাড়া আরও তিনজন মুনিষ আছে। জল খাওয়ার বেলা হলে মুড়ি আসে বাড়ি থেকে। খেতে বসেছে সবাই। গৌরসুন্দরও খাচ্ছে। এমন সময় তার বড় ছেলে নীলু এলো ছুটতে ছুটতে। বলল, 'বাবা, তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো। মা বুললে।'

গৌরসুন্দর উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যানে রে? কি হৈল্‌ছে?'

'তুমাকে তাড়াতাড়ি যেতে বুললে।'

গৌরসুন্দর খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চল চল। দেখি।'

দু'একজন বলল, 'খেঞে যাও গৌরদা।'

কিন্তু গৌরসুন্দর কোনো কথা শুনল না। নিশ্চয়ই কোনো আপদ-বিপদ, নইলে এভাবে কখনও ডেকে পাঠায় না বাসন্তী। সারা রাস্তা তার মন ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কি হতে পারে? কোনো খারাপ খবর এসেছে কি? শ্বশুরবাড়ি থেকে? কলকাতা থেকে? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল সে।

এসে দেখল, কালীপদ তাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে আছে। গৌরসুন্দর জিজ্ঞেস করল, 'কি রে? কি খবর?'

কালীপদ বলল, 'তুমার গোঁসাইডাঙার জমি নি লিলে যে কাকা। ছকু তুমার ভুঁইয়ের আল-টাল উড়িয়ে দিয়্যাছে।'

গোঁসাইডাঙার মাঠে ছকু মোড়লের জমি আর তার জমি পাশাপাশি। মধ্যে আল। জিজ্ঞেস করল, 'আল ভেঙে দিয়্যাছে? তারপর?'

'তারপর আর কি? তুমার ভুঁইয়ের মধ্যিখানে নতুন আল দিছে।'

তার মানে গৌরসুন্দরের জমির অর্ধেকটা নিজের জমির ভেতর ভরে নেওয়ার চেষ্টা। গৌরসুন্দর তখনই মাঠে ছুটল। বাসন্তী তার একটা হাত চেপে ধরেছিল। বাধা দিয়ে বলেছিল, 'যেও না। ওগো, একলা যেও না।' কিন্তু আটকাতে পারেনি গৌরসুন্দরকে। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিল সে। পেছনে পেছনে ছুটেছিল বাসন্তী, ছুটে গিয়েছিল ছেলেমেয়েগুলো। কিন্তু গোঁসাইডাঙার মাঠে তাদের পৌঁছতে না-পৌঁছতেই যা হওয়ার হয়ে গেলো। গৌরসুন্দরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে অতগুলো লোক। এলোপাতাড়ি কিল-চড-চাপড় পডছে। গৌরসুন্দরকে দেখা যাচ্ছে না। লোকগুলোর পায়ের তলায় পড়েছে হুমড়ি খেয়ে। একটু দূরে ছকু মোড়ল হাতে ছাতা নিয়ে লাফাচ্ছে, 'মার —মার শালাকে। মেরে ফ্যাল। মেরে পুঁতে দে উখ্যানে।'

বাসন্তী ছুটতে ছুটতে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল গৌরসুন্দরের ওপর। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে নিজের বুক দিয়ে আড়াল করল তাকে। মুখে কাতর আর্তনাদ, 'ওগো, মারিও না। ওগো, আর মারিও না। তুমাদের পায়ে পড়ি।'

গৌরসুন্দর পড়ে আছে প্রবল বর্ষণে ভেঙে পড়া মাটির দেয়ালের মতো। নিঃসাড় দেহ। নাক দিয়ে শুধু গলগল করে টকটকে লাল রক্ত বেরোচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েগুলো বিস্ময়-বোবা দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের বাবাকে। কাঁদতেও ভুলে গেছে তারা।

সিতাব কলেজ যাবে, স্টেশনের প্লাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছে। অস্তমান সূর্যের আলো ঝিলমিল করছে করবীর ঝাড়ে, জবাফুলের গাছটার গাঢ় সবুজ পাতায়। টেলিগ্রাফের খুঁটির ওপর বসে একটা কাক তখন থেকে এক নাগাড়ে কর্কশ স্বরে কা কা করে চিৎকার করে চলেছে। সিতাব একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ল। কাকটার পাশ দিয়ে চলে গেলো পাথরের টুকরোটা। কিন্তু কাকটা উড়ল না। একটুখানি ডানা ঝাপটিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। কয়েক মুহূর্তের বিরাম নিয়ে আবার চিৎকার করতে শুরু করল সে।

এমন সময় সিতাব লক্ষ্য করল, স্টেশনের ভেতরের রাস্তা দিয়ে জগতকারু বেরিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কুথা যেছিস রে কারু?'

জগতকারু সিতাবকে দেখে দাঁড়াল। বলল, 'তেজহাটী যেছি সিতুদা। ছকু মোড়লের লোকেরা পালদের বড় কর্তাকে খুব মেরাছে। গতিক ভালো লয়। তাই খবর দিতে যেছি।'

সিতাবকে ঘটনার কথা সব জানাল জগতকারু। তারপর লাইন পেরিয়ে তেজহাটীর পথ ধরল সে। তেজহাটীতে গৌরসুন্দরের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে খবর দিতে যাচ্ছে।

সিতাবের আর কলেজ যাওয়া হলো না। কোয়ার্টারে বইপত্র রেখে গৌরসুন্দরকে দেখতে গেলো। দেখল, দাওয়ায় মেঝেতে বিছানায় শুয়ে আছে গৌরসুন্দর। ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশে বাসন্তী বসে আছে হাঁটুতে চিবুক রেখে। চোখ দু'টো স্থির। ঘটনার আকস্মিকতায় সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সারাদিন কারোর সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি।

দুপুরের দিকে বিশু পরামাণিক এসেছিল। ইঞ্জেকশন দিয়েছে। সন্ধ্যেয় আবার এসেছে। বসে আছে একটা মোড়ায়। গাঁয়ের কয়েকজন তাকে ঘিরে আছে। এমন সময় সিতাব গিয়ে হাজির হলো। বিশু পরামাণিক বলছিল, 'আঘাতটা খুব জোর হৈল্ছে হে। ঘুমের ওষুধ দিয়্যাছি। ঘুমটা ওর দরকার। আজ আর ইঞ্জেকশন দিবো না। কাল সকালে দিবো। আর ভয় নাই। ফাঁড়া কেটে যেল্ছে মনে হছে।'

সিতাব দেখল, গৌরসুন্দর ঘুমিয়ে আছে। গলা অব্দি একটা চাদরে ঢাকা। মুখখানি অনাবৃত, কিন্তু বোঝা যায় না সেটা গৌরসুন্দরের মুখ কি-না। দু'টো চোয়ল ফুলে উঠে চোখ দু'টো প্রায় ঢেকে নিয়েছে। চিবুকটাও ফুলে উঠেছে ভীষণ।

বিশু পরামাণিক জিজ্ঞেস করল, 'কখুন ফিরলি রে ব্যাটা ডিউটি থেকে ?'

সিতাব বলল, 'এই একটুকুন আগে মামা।'

'তোকে ব্যাটা এখন পায় কে ? রেলের চাকরি ! চেহারাই আলাদা হঞে গেলো তোর। কথায় আছে না, যেমন-তেমন চাকরি ঘি-ভাত।'

সিতাব খুশি হয়, লজ্জাও পায়।

এক সময় ঘুম ভাঙে গৌরসুন্দরের। হাত-পা নাড়তে গিয়ে ককিয়ে ওঠে। বাসন্তী মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু চাইছ ? জল দিবো ?'

জল খেতে চায় গৌরসুন্দর। বাসন্তী কয়েক চামচ জল দেয় তার মুখে। তারপর নিজের আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে, 'ঠাকুরপোকে চিঠি দিবো ? আসতে বুলবো ওকে ?'

গৌরসুন্দর নিষেধ করে। বলে, 'না। ইসব কথা কিছু জানায়ো না। মিছা-মিছি মাথা গরম কৈর্‌বে।'

সিতাব জিজ্ঞাস করে, 'কেমন আছ গৌরদা ?'

গৌরসুন্দর বলে, 'কে ? সিতু এস্যাছিস ? দ্যাখ, তোদের মোড়লের অহঙ্কার দ্যাখ। হারামজাদা সাপের পাঁচ পা দেখ্যাছে রে। দুনিয়াকে দুনিয়া মনে করে না।'

গৌরসুন্দর যন্ত্রণায় ককিয়ে ককিয়ে কথা বলে।

একটু পরে বিশু পরামাণিক উঠে যায়। গাঁয়ের আরও দু'একজন আসে দেখতে। আসেন গঙ্গাচরণ। বলেন, 'গায়ে তো এখনো খুব ব্যথা দেখছি। ও হো, মুখটা যে ফুলে একেবারে হাঁড়ি হয়েছে। ওসব ইঞ্জেকশন-টিঞ্জেকশন মানে, তুমি যদি এক ডোজ আর্ণিকা টু হান্‌ড্রেড খেতে বাপু, শরীর ঠিক হয়ে যেত এতক্ষণ। গায়ের ব্যথা-টেথা কোথায় চলে যেত। এতক্ষণ উঠে বেড়াতে।'

কিন্তু গৌরসুন্দর কি করবে ? তখন তো তার হুঁশ ছিল না। বিশু কখন এসেছে, কখন ইঞ্জেকশন দিয়েছে, তাই মনে করতে পারে না সে। একেবারে যে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, তা নয়, কিন্তু কোনো কিছুই ভালো করে ঠাহর করতে পারছিল না।

সাম এসে মামলা করতে বলল গৌরসুন্দরকে। বলল, সে-ই মামলার খরচ যোগাবে। এক নম্বর পুলিস-কেস ঠুকে দিক কালই। ছকু ব্যাটার হাতে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাক। কিন্তু গৌরসুন্দর রাজি হলো না। ছকুর সঙ্গে সে কি পারে ? সাম নিজে যা করতে চায়, করুক। গৌরসুন্দর ওসবে নেই।

ছকুকে জব্দ করার এমন সুন্দর সুযোগ সামের কাজে লাগে না।

কিন্তু গৌরসুন্দরের আঘাত লোকে যতখানি অনুমান করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি। পরদিন থেকে দাস্তের সঙ্গে রক্ত যেতে শুরু হলো। আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেলো সকলের মুখ। কেউ কেউ বলল, 'উ বিশুর হাতে আর থুয়ো না। গতিক ভালো লয়। হাসপাতালে নি যাও।'

বিশু দু'বেলা আসে। ইঞ্জেকশন দেয়। বলে, 'কিস্সু দরকার নাই। সব ঠিক হঞে যাবে।'

তারপর রক্তভেদের সঙ্গে জ্বরও শুরু হয়। চোখ রক্তবর্ণ। বাসন্তী দু'চোখে অন্ধকার দেখে। অবশেষে গৌরসুন্দরকে না জানিয়েই চিঠি পাঠায় ভৈরবকে। সিতাবকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেয়। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে। চিঠি পাওয়া মাত্র ভৈরব নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

নয়

সতীদীঘির মামলা চলছে দেওয়ানী আদালতে। কিন্তু মামলা এখন অথৈ জলে। ছকু মোড়ল বেশ বেকায়দায় পড়েছে। আগে তার জয়লাভের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল, এখন সে-আশা নিতান্তই ক্ষীণ। কারণ গৌরসুন্দরের সিকি অংশ পুরোটাই কিনেছে সাম, দলিলে দাম ফেলেছে দশ হাজার টাকা। অথচ গাঁয়ের সবাই জানে, সাম ভৈরবকে যে-দাম দিয়েছিল, সেই দামই দিয়েছে গৌরসুন্দরকে। দলিলে বেশি দাম দেখানো হয়েছে। উকিলবাবু পরামর্শ দিয়েছেন গৌরসুন্দরের অংশের দরুন আরও দশ হাজার টাকা কোর্টে জমা দিতে। ছকু মোড়ল প্রমাদ গোনে। কোর্টে হেরে গেলেও সামের লাভ। দলিলে যে-দামের উল্লেখ আছে, সেই দামই সে পাবে। দু'জনের অংশ মিলিয়ে কম টাকাটা বাড়তি নয়। তাছাড়া আর্থিক সঙ্কুলানের কথাটাও ভাবতে হচ্ছে বৈ-কি! ফৌজদারি মামলায় কম খরচটা হয়নি। মাঝে মাঝে দেওয়ানী আদালতে দিন পড়ছে, তাতেও কিছু-না-কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে। শেষে সতীদীঘির জন্যে জমি বিক্রি করতে না হয়। সে-কাজ তো শক্রর মুখ হাসানো। সাম আগে থেকে বলেই রেখেছে, 'সতীদীঘির লেগে ছকু আথুন জমি বিক্রি করুক।' তা সামের সুদের পয়সা, ছকু কি তার সঙ্গে টাকার খেলায় পেরে ওঠে? কথায় আছে, সুদের টাকা জোয়ারের বান, ঘোড়ার আগে আগে যান।

সুতরাং ছকু বড় চিন্তিত। ইদানীং চিন্তার কারণ ঘটেছে আরও বেশি। ভোটের সময় রামলাল ভকত গাঁয়ে একটা টিউবওয়েল দিয়েছিলেন। সে টিউবওয়েল বলতে গেলে ছকু মোড়লের খামারেই বসেছে। ঠিক খামারে নয়, খামারের দোরগোড়ায়। তাতে সাম ভীষণ রেগে গিয়ে আস্ফালন করে বলেছিল, 'ঠিক আছে। বেশি পিয়ারের লোক ক'টা ভোট ছ্যায়,

দেখে লিবো।' গাঁয়ে দেবু থাকতে কথাটা চাপা থাকেনি, যথাসময়ে রামলাল ভকতের কানে উঠেছিল। রামলাল দেখা করতে বলেছিলেন সামকে। একদিন সে দেখা করতেও গেলো। গাঁয়ে খুব মেজাজ দেখিয়েই দেখা করতে গেলো সে। বলে গেলো, 'ঠ্যালার নাম বাবাজী, হুঁ বাব্বা! বুলে দিছি, সহজে চিঁড়ে ভিজছে না।' কিন্তু সাম ফিরে এলো হাসিমুখে। তারপর রামলালের হয়ে সমান উৎসাহে খাটতে শুরু করল। ছকু মোড়ল মোটামুটি আন্দাজ করেছিল, নিশ্চয়ই কিছু টাকা-পয়সার ব্যাপার। ব্যাটা অর্থপিশাচ, ক'টা টাকা-পয়সা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে কুকুর বানিয়েছে। টাকা পেয়ে পোষা কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করে আহ্লাদে লেজ নাড়ছে। মনে মনে হেসেছিল ছকু। কিন্তু সাম যে অমন করে তার ওপরে টেক্কা দেবে, ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি সে। একদিন সাম বেশ ঘটা করে কলকাতা গেলো। ফিরে এলো বন্দুক কিনে নিয়ে। রামলাল ভকত তাকে বন্দুকের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ছকু মোড়লের দুশ্চিন্তা কম নয়, সামের হাতে এখন বন্দুক। মানুষ মারা যন্তর।

বর্তমানে ছকু মোড়লের পক্ষে লোকজন বড় কম। সামের পাল্লা ভারি।

সাম এখন বন্দুক কাঁধে নিয়ে নিত্য-নতুন দিগ্বিজয়ে বের হয়। পাখি মেরে হাতের টিপ তৈরি করছে সে। খবর পেলেই হলো, অমুক মাঠে অমুক গাছে পাখি বসছে। সাম তক্ষুনি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। পেছনে পেছনে মোসাহেবের দল। সঙ্গে যাবে গাঁয়ের এক দঙ্গল ছেলে-বুড়ো। গা জ্বলে যায় ছকু মোড়লের। হারামজাদারা যেন কখনও বন্দুক দেখেনি! একদিন তার নিজের বাড়িতেই কাণ্ডটা ঘটল। দুপুরে ভাত খেয়ে বৈঠকখানায় বসে মাহিন্দারকে ডাকাডাকি করল সে। ভাত খেয়ে আরাম করে বসে বসে তামাক খাওয়া তার চিরদিনের অভ্যেস। কিন্তু সিধুর সাড়া পাওয়া গেলো না। বড়বৌ কুসুম এসে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যানে ডাকছ? সিধু ঘরে নাই।'

ছকু মোড়ল বলল, 'হারামজাদা গেলো কুথা?'

'কি জানি কুথা ঘেলছে! কিছু বুলব্যা?'

'একটুকুন তামুক সেজে দাও তো বৌমা।'

কল্কে নিয়ে গিয়ে বড়বৌ তামাক সেজে দিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ বসে বসে হুঁকো টানল ছকু মোড়ল। তারপর উঠে গোয়ালঘরের দিকে পা বাড়াল। গোয়ালের চালায় সারি সারি গরু। নাদা-ভর্তি কাটা বিচালি। কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। গরুগুলো খাচ্ছে না, মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সিধুর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। অবশেষে ছকু মোড়ল খবর পেলো, সিধু গেছে সামের পাখি শিকার দেখতে। শুধু সে একা যায়নি, ছকু মোড়লের ছোট ছেলে এককড়িকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। রাগে হাড়-পিত্তি জ্বলে গেলো তার।

ওরা ফিরল একেবারে সন্ধ্যেয়। তখন ছকু মোড়ল বৈঠকখানায় বসে বসে

রাগে ফুঁসছে। সিধু গুটি গুটি গোয়ালঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, ছকু মোড়ল হাঁকল, 'সিধ্যা, এদ্দিকে আয়।'

সিধু এসে সামনে দাঁড়াল। ছকু মোড়ল জিজ্ঞেস করল, 'কুথা যেল্‌ছিলি?'

সিধু ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো, 'পাখি মারা দেখতে।'

'পাখি মারা দেখতে! আর এদ্দিকে যে হারামজাদা গরুগুলিন তেষ্টায় ম'লো! নাদায় জল দিয়্যাছিলি?'

'হুঁ, দিয়্যাছিল্যাম তো।'

'এক চড় মারব হারামজাদার গালে। আমি কি কানা? বোলি, আমি কি চোখে দেখতে পাই না? নাদা খট্‌খট্‌ কোচ্ছে! ক'টা পাখি মেরে আনলি হারামজাদা? সাম তোকে পাখির মাংসের ভোজ খাওয়াবে? বোলি, ক'টা পাখি মেরে আনলি?'

হঠাৎ হি-হি করে হেসে উঠল সিধু। বলল, 'পাখি মৈর্‌বে কি গো, বন্ধুকের আওয়াজ শুনেই উড়ে পালাছে সব।'

ছকু মোড়লের মুখেও হাসি ফুটল। যাক, ব্যাটার লম্ফ-ঝম্ফ শুধু কাঁধে বন্দুক ঝোলানোতেই! এমন সময় নিবারণ বাঁড়ুজ্যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'কি কৈর্‌ছো মোড়ল?'

ছকু মোড়ল বলল, 'এই আপনাদের সামের পাখি শিকারের গল্প শুনছি। তা আপনিও যেল্‌ছিলেন না-কি গো?'

'হ্যাঁ, গেলাম একদিন দেখতে। তা বাপু, বন্দুক ধৈর্‌তেই শিখেনি, পাখি শিকার কৈর্‌বে কি!'

হেঁ-হেঁ করে হাসল ছকু মোড়ল। বলল, 'বন্দুক খালি কিনলেই হলো? আগে বন্দুক ধরা শিখতে হয়। আমি কি পারি না বন্দুক কিনতে, বোলেন? ভকতজীকে বুললে এক্ষুনি লাইসেন করে দিবে। তা শুধু তো কিনলেই হলো না, বন্দুক সামলাবার ক্ষ্যামতা চাই, তবেই তো!'

'তাই তো বুল্‌ল্যাম বাপু। বুল্‌ল্যাম, ইটা তুমি ভালো করোনি সাম। বেবশ জিনিস—'

'বুঝবে ঠ্যালা। ঘরে চোর-ডাকাত পৈড়্‌লে ওই বন্দুক কেড়ে নি-ই গুলি করে মারবে ব্যাটাকে।'

তা ছকু মোড়লের আত্মসন্তুষ্টি বেশি দিন বজায় রইল না। চোর-ডাকাত বাড়িতে পড়ার আগেই সাম একদিন পাখি শিকার করল। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। হঠাৎ সাদিনপুরের উপকণ্ঠে গুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। চমকে উঠল গাঁয়ের লোক। অনেকে ছুটে গেলো। একটু পরে ছকু মোড়ল বৈঠকখানায় বসে বসে দেখল, সাম ফিরছে, এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে একটা হরিয়াল। ডানায় ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে যাচ্ছে পাখিটাকে। পেছনে অনেক লোকজন। বৈঠকখানার সামনে দিয়ে বীরদর্পে চলে গেলো সাম। যাওয়ার সময় ছকু মোড়লকে

শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'বুঝল্যা হারু, ইসব ছোটখাটো পাখি মেরে লাভ নাই। এবার একটা বড় পাখি শিকার কৈর্‌তে হবে।'

গুম মেরে বৈঠকখানায় বসে রইল ছকু মোড়ল। সাম তাকে বন্দুক দেখিয়ে গেলো।

দশ

সাম গৌরসুন্দরের কাছ থেকে সতীদীঘির যে সিকি অংশ কিনেছে, তার জন্য ছকু মোড়লকে আদালতে আরও দশ হাজার টাকা জমা দিতে হতো। কিন্তু সে তা জমা দেয়নি। ফলে ছকু মোড়লের জয়লাভ সুদূরপরাহত হয়ে উঠেছে। এখন সতীদীঘিতে সাম ও ছকুর আধাআধি অংশ। যে মামলা চলছে, তারও নিষ্পত্তি হয় না। শুধু দিন পড়তে থাকে। চার মাস পাঁচ মাস অন্তর একটা করে দিন। আদালতে হাজির হয় উভয় পক্ষই। উকিলদের মধ্যে কি সব সলা-পরামর্শ হয়। সাহেব কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করেন। তারপর অন্য মামলার ডাক পড়ে। আবার একটা দিন জানিয়ে দেন উকিল।

ছকু মোড়ল বিরক্ত হয়।

এদিকে সতীদীঘিতে মাছ বড় হয়। মাছের ডানা গজায়। দীঘির জল তোলপাড় করে লাফালাফি করে। চেয়ে চেয়ে দেখে গাঁয়ের লোকেরা। আশ্চর্য ব্যাপার! শুধু একটা নোটিস। সতীদীঘিতে 'ইঞ্জিশিন'। ব্যস্‌, মাছ জল থেকে ডাঙায় লাফিয়ে পড়লেও কেউ ছুঁতে পারবে না। ছুঁলেই পুলিস এসে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিস ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।

গাঁয়ে এখন দুই দলে রেষারেষি। ছকু মোড়লের দল আর সাম মোড়লের দল। দু'পাড়ায় দু'টি দলের গানের আসর বসে। নিজেদের ভেতর চাঁদা তুলে বাইরে থেকে গানের দল নিয়ে আসে প্রতিযোগিতা করে। জগতকারু শীতল এখন আর এক দলে নেই। দু'জনে দু'দলে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। সিতাব নিরপেক্ষ। সে গরমেণ্টের চাকরি করে। শিক্ষিত। মান্যগণ্য ব্যক্তি। গাঁয়ে আসে খুবই কম। কচিৎ কখনও গাঁয়ে রাত্রিবাস করলে কোনোদিন ছকু মোড়লের গানের দলে গিয়ে বসে, কোনোদিন সাম মোড়লের গানের দলে। দোহারের দলে বসতে সাধ যায়, কিন্তু সম্মানে বাধে। একটু বসে থেকেই উঠে যায় সে।

মাঝে মাঝে গৌরসুন্দরকে দেখতে আসে সিতাব। গৌরসুন্দর সেরে উঠেছে, কিন্তু আর সে-গৌরসুন্দর নেই। অস্থিচর্মসার একটা মানুষ। গাঁয়ের লোকে মুনিষ দিয়ে তার জমি চাষাবাদ করে দিয়েছে, সে-জমি দু'বেলা দেখাশোনা করার ক্ষমতাও নেই তার।

বাসন্তী ভৈরবকে চিঠি দিয়েছিল, বড় প্রত্যাশা ছিল, এমন বিপদের খবর

পেয়ে ঠাকুরপো নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। কিন্তু কোথায় ভৈরব? একটা জবাবও এলো না তার কাছ থেকে। সিতাব দুঃখ করে, 'ভৈরবদা চিঠির একটা জুয়াবও দিলে না!'

বাসন্তী বলে, 'তাই তো ভাবছি সিতু ভাই। ঠাকুরপো চিঠি পেলে ঠিক আসত। মনে হয় চিঠি পায়নি।'

'চিঠি পাবে না ক্যানে? ওর অফিসের ঠিকানাতেই তো চিঠি দিয়্যাছি!'

গৌরসুন্দর মন্তব্য করে, 'হয়তো উথ্যানে নাই আখুন।'

সিতাব বলে, 'বেশ তো, রেজেস্ট্রীরি করে দাও। তাহলে তো আর 'না' বুলতে পারবে না।'

বাসন্তী বলে, 'তাই দাও সিতু ভাই। রেজেস্ট্রীরি করেই চিঠি দাও একখান।'

সিতাব কৃতার্থ হয়। তখনই চিঠি লিখতে বসে কাগজ-কলম নিয়ে। অনেক যত্ন করে চিঠি লেখা হয়। কি কি লিখতে হবে, গৌরসুন্দর বাসন্তী দু'জনে মিলে বলে যায় সিতাবকে। তারপর সেই চিঠি পাঠানো হয় রেজেস্ট্রী ডাকে।

কিন্তু কপাল যখন পোড়ে তখন সব দিক দিয়ে পোড়ে। অত যত্ন করে লেখা চিঠি, পয়সা খরচ করে রেজেস্ট্রী ডাকে পাঠানো, সে-চিঠি ভৈরবের হাতে গিয়ে পৌঁছল না। ফেরত এলো ক'দিন পরেই। খামের ওপর লাল কালিতে লেখা—Addressee not found. আবার এক দুর্ভাবনা চাপল বাসন্তীর মাথায়। ভৈরবের বাসার ঠিকানাতেই এবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তবে সে চিঠি পেলো না কেন? কোথায় গেলো ভৈরব?

একদিন সিতাব এলে তার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল বাসন্তী। গৌরসুন্দর বলল, 'আমিই একবার যাই না-হয় বড়বৌ!'

বাসন্তী অবাক হয়ে বলল, 'শুনো কথা! তুমি কেমন করে যাবা শুনি? হাঁটতেই পারছ না ভালো করে! কুথা ঢুঁড়ে বেড়াবা ওকে কলকাতায়?'

'ওর অফিসে যেলে ঠিক পাত্তা পাবো।'

হঠাৎ সিতাবের মাথায় এক নতুন বুদ্ধি আসে। বলে, 'তা অফিসের ঠিকানাতেই একটা চিঠি দাও রেজেস্ট্রীরি করে, কি বোলো?'

পরামর্শটা বাসন্তী ও গৌরসুন্দর উভয়েরই ভালো লাগে। রেজেস্ট্রী ডাকে আবার চিঠি পাঠায় ভৈরবকে।

কিন্তু ভৈরব পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর কোথাও নেই সে। আবার ফেরত আসে চিঠি। খামের ওপর লেখা—Addressee not found. দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে বাসন্তী ও গৌরসুন্দর। চিন্তিত হয় সিতাবও।

ঠিক এমন সময় সিতাবের জীবনে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। খুবই আকস্মিক। এবং মুহূর্তে বিরাট তাণ্ডবে সিতাবের সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়ে যায় যেন।

সেদিন সিতাব যথারীতি কলেজ থেকে ফিরেছে রাত্রে, শিউপ্রসাদের কাছে অড়হরের ডাল দিয়ে রুটি খেয়েছে, তারপর রোজকার মতোই মাথার কাছে রেলের

লণ্ঠনের আলো নিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়ছে। শিউপ্রসাদ পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় দরজায় ধাক্কা। হারুনের গলা, 'সিতু, কপাট খুল্।'

সিতাব উঠে দরজা খুলে দিলো। দরজা খুলেই দেখতে পেলো হারুনকে। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন, অন্ধকারে অস্পষ্ট। চেনা যায় না। জিজ্ঞেস করে, 'কি খবর হারুনদা ?'

হারুন বলে, 'তোদের গাঁয়ের লোক বে। তোকে ডাকতে এস্যাছে।'

শিবু সাড়া দেয়, 'আমি রে আমি। জগতকারু সাথে আছে সুদ্ধ।'

'ও, শিবুকাকা ! তা এত রাতে কুথা ?'

'তোর কাছেই এল্যাম। তোকে ডাকতে। তোর মা-র অসুখ।'

'মা-র অসুখ ? কি হৈল্ছে ?'

'পেটের অসুখ। সাঁজবেলা থেকেই। ঘন ঘন দাস্ত হছে।'

সিতাব আর দ্বিরুক্তি করে না। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সারা রাস্তা প্রায় ছুটতে ছুটতে আসে। বিশু পরামাণিককেও খবর পাঠানো হয়েছে। এতক্ষণ হয়তো সে-ও এসে পড়েছে।

বাড়ি এসে সিতাব দেখল, বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। পাড়ার প্রায় সকলেই এসে হাজির। বিশু পরামাণিকও এসে গেছে। ইঞ্জেকশন দিয়েছে ইতিমধ্যেই। উঠোনে বসে আছে মোড়ায়। অসুখ-বিসুখের গল্প করছে।

সিতাব গিয়ে মা-র কাছে দাঁড়াল। সাড়া পেয়েই চোখ মেলে তাকাল সিতাবের মা। বলল, 'সিতু এস্যাছিস ?' কথা ক'টি বলতে যেন বড় কষ্ট হলো তার। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ। দু'পাশে ছড়ানো দু'খানি হাত। কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার ইচ্ছে নেই যেন আর।

ফুল্লরা বসে হাতে তেল মালিশ করছে। আঙুলগুলো টেনে টেনে দিচ্ছে সে। চোখ ফুলো-ফুলো। যেন একটু আগেও কেঁদেছে।

সিতাব বিমূঢ়। নিস্পন্দ।

একটি রাত্রির দুর্যোগ শুধু। ঘন ঘন জলবৎ নিঃসাড় ভেদ। ঝাঁজালো আঁশটে গন্ধ। শিরা-উপশিরার তীব্র সঙ্কোচনে হাত-পা বেঁকে যাওয়া। তারপর চারদিক ফরসা হওয়ার আগেই সব শেষ। শান্ত স্তব্ধ বিশ্বচরাচর।

সিতাবের মনে হলো, তার আর কিছুই নেই। সে একেবারে নিঃস্ব। সারা পৃথিবীতে তার আপনার বলতে আর কেউ রইল না। অসহ্য যন্ত্রণায় সিতাবের কান্না ভেতরেই শুকিয়ে গেলো। কাঁদতেও পারল না সিতাব।

ফুল্লরা লুটোপুটি করছে মেঝেয়। এলো চুলে তার সারা মুখ আচ্ছন্ন।

দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতিপর্ব রচনা করতে করতে যখন মৃত্যু আসে, তখন তা অনেকটা সহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অতি সহজে, প্রায় নিঃশব্দ পদক্ষেপে যে মৃত্যু এসে প্রাণ

হরণ করে নিয়ে যায়, তা মানুষের কাছে বেশি ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক। এখন এক অজানা ভয়ে সিতাবের বুক সব সময় কাঁপে! কিসের ভয়, তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। রাত্রে ধড়াস করে ঘুম ভেঙে যায় কখনো কখনো। গলা থেকে বুক অব্দি শুকিয়ে কাঠ। হাত-পা কাঁপে থরথর করে। উঠে ঢক্‌ঢক্ করে ঠাণ্ডা জল খায়। স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে।

হঠাৎ-ই দিনের বেলা কখনো কখনো পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির করে কি যেন বয়ে যায়। সাপের শরীরের মতো ঠাণ্ডা হিম কি যেন একটা। সিতাব বুঝতে পারে না।

পড়তে পড়তে হঠাৎ বইয়ে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে থাকে সিতাব। ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে বইয়ের কালো কালো অক্ষরগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। অক্ষরগুলো তার মস্তিষ্কে কোনো শব্দ সৃষ্টি করে না, কোনো অর্থ বহন করে আনে না।

আগে মাঝে-মধ্যে দু'একদিন যদিও-বা বাড়ি যেত, এখন সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে তার বড় ভয়। যন্ত্রচালিতের মতো কলেজ যায়, কলেজ থেকে ফিরে এসে শিউপ্রসাদের হাতের প্রসাদ অড়হরের ডাল দিয়ে রুটি খায়, কোয়ার্টারেই ঘুমোয়। যখন মনের ভেতর এই রকম এক সীমাহীন শূন্যতা, তখন সে একদিন শ্রীরামপুর গেলো। এর আগেও সে বার কয়েক শ্রীরামপুর গেছে ভবতোষবাবুর বাসায়, তাদের সঙ্গে দেখা করতে, অবশ্যই মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকত বুধিকে দেখার আগ্রহটা। বিশ্বসংসারে কোথাও যখন এতটুকু সান্ত্বনার ঠাঁই পাচ্ছে না সিতাব, তখন সে ভাবল, বিশ্বের সমস্ত শান্তি ও সান্ত্বনা স্তূপীকৃত হয়ে আছে শ্রীরামপুরে, বুধির কাছে। সে-ই তার সমস্ত দুঃখটুকু নিমেষে মুছে দিতে পারে। কিন্তু ফিরে এলো হতাশা নিয়ে, প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে। মা তার সারা মনটাকে কিভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এর আগে কখনও কি বুঝতে পেরেছিল সিতাব?

এই রকম এক অবস্থার মধ্যেই সিতাব পরীক্ষা দিলো। পাস করল প্রথম বিভাগে। ঘৃণাক্ষরে সে ভাবতেই পারেনি এত ভালো ফল করবে। নতুন এক উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগল তার মনে। বি. কম. নিয়ে আবার ভর্তি হলো কলেজে।

সিতাব বাড়ি আসে কালেভদ্রে। সেদিন বাড়ি এসে শুনল, ভৈরবের চিঠি এসেছে। চাকরি-বাকরি নেই, বড় কষ্টে দিন কাটছে তার। খবরটা পেয়ে তখনই গৌরসুন্দরের বাড়ির দিকে পা বাড়ায় সিতাব।

বাসন্তী মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে সিতাবকে মোড়া এনে দেয় বসতে। গৌরসুন্দর জিজ্ঞেস করে, 'ডিউটি থেকে এই আসছ না-কি হে?'

সিতাব মোড়ায় বসে বলে, 'হ্যাঁ গৌরদা। শুনল্যাম, ভৈরবদার না-কি চিঠি এস্যাছে!'

'হ্যাঁ সিতু। এই ত্থাখ, চিঠি ত্থাখ।' বলে গৌরসুন্দর উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে চিঠি নিয়ে আসে। সিতাবকে দেয়। খামের ভেতর থেকে চিঠি বার করে পড়তে থাকে সিতাব। হ্যারিকেনটা একটু কাছে টেনে নেয়। বাসন্তী বসে পড়ে একপাশে। ব্যগ্র দু'টি চোখ মেলে চেয়ে থাকে সিতাবের মুখের দিকে। ভৈরব লিখেছে—

শ্রীহরি সহায়

শ্রীচরণেষু,

দাদা, পত্রে আমার শত কোটি প্রণাম জেনো। বহুদিন তোমাদের কোনো চিঠিপত্র পাইনি। তোমরা কেমন আছ, সেকথা জানার অবকাশও হয়নি অনেকদিন। বড় দুরবস্থায় এখন আমার দিন কাটছে। বেশ কিছুদিন হলো আমার চাকরি চলে গেছে। আমার একমাত্র অপরাধ, মালিকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, শ্রমিক-কর্মচারীদের জোট বাঁধতে সাহায্য করেছিলাম আমি। কারখানায় ধর্মঘট করেছিল তারা। কিন্তু পনেরো দিন যেতে না-যেতেই ধর্মঘট ভেঙে গেলো। মালিক পক্ষ তার ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল আমাদের ওপর। আমাকেও আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, হিংসাত্মক কার্যকলাপের মিথ্যা অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছিল। যাই হোক, মামলা বেশিদূর গড়ায়নি। কিন্তু আমার এবং আমার আরও দু'জন সহকর্মীর চাকরি গেলো। অন্যান্যরা সবাই কাজে যোগ দেয়। তাদের দোষ দেবো না। কারণ ক্ষুধার যন্ত্রণা বড় কষ্টকর, বিশেষ করে, ক্ষুধাতুর ব্যক্তির চোখের সামনে যখন কেউ টাকার থলে নাচায়, তখন তার ক্ষুধার যন্ত্রণা দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে, তার পক্ষে লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন আমি কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। অনেক জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেছি, কিন্তু চাকরি পাওয়া বড় কঠিন। আজ তোমাদের চিঠি লিখতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। আমি তোমাদের কারোর কোনো পরামর্শ নিইনি। কলকাতায় বাড়ি তৈরির আশা নিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে-বাড়ি তৈরি হয়নি, যে-জায়গাটুকু কিনেছিলাম, আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে সেটুকুও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছি। সেই টাকা খরচ করে এতদিন কোনোরকমে কেটেছে। এখন একেবারে কপর্দকশূন্য। শ্বশুরবাড়ির সাহায্য চেয়েছিলাম, সাহায্য পাইনি। অর্থাভাবে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়েছে। বর্তমানে এক বন্ধুর আশ্রয়ে আছি। তা-ও আর বেশি দিন

থাকা সম্ভব নয়। ছেলেটি অসুখ-বিসুখে ভুগছে, চিকিৎসা করাতে পারছি নে। তোমার বৌমার অবস্থাও খুব খারাপ। বৌদির চোখের জলের দিকেও ফিরে চাইনি, এমনি অপদার্থ আমি। বৌদিকে কিছু বলার মুখ নেই আমার, তাঁর অগাধ স্নেহের বিনিময়ে আমি তাঁকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে এসেছি। তাঁর কাছে আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকারটুকুও আর নেই।

তোমাদের কাছে কোনো কিছু সাহায্য চাওয়ার পথ আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়ে এসেছি চিরদিনের মতো। তবু একান্ত নিরুপায় হয়ে এই চিঠি লিখছি। চাকরির আশা আর করিনে। কোনো একটা কারবারে লেগে পড়ব ভাবছি। যদি পারো, শ' দু'য়েক টাকা আমাকে ধার হিসেবে পাঠিয়ে দিও। ইতি—

তোমার হতভাগ্য
ভৈরব

চিঠিখানা সম্পূর্ণ পড়া হতে না-হতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল বাসন্তী। গৌরসুন্দর ধমক দিয়ে উঠল, 'আঃ, তুমার স্বভাব গেলো না। কথায় কথায় কাঁদাকাটি। ইসব কি? অ্যাঁ, আমি কি মরে যেল্‌ছি? বোলি, আমি তো আখুনো চিত্যায় উঠিনি?'

বাসন্তী চোখ মুছে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি কি বুঝব্যা? আমার পর্‌থম ছেলে বুলতে ওই। নিজের হাতে মানুষ কর‍্যাছি। সব যখন বিচে-খুচে দিতে চাইল, কত মানা করল্যাম ঠাকুরপোকে। শুনলে কথা!'

গৌরসুন্দর বলল, 'বেশ তো, যা হবার হৈল্‌ছে। মানুষ ভুল করে। আর এমনি বিপদ হবে, তা কি উ জানত? তুমার যেক্রে জেনেশুনে মানুষ অমন করে না। তাতে সারাদিন কাঁদার কি আছে? অ্যাঁ, তুমিই বোলো সিতু।' তারপর গৌরসুন্দর জিজ্ঞেস করে, 'আখুন কি করি বোলো তো?'

সিতাবের কিছু বলার আগেই বাসন্তী বলল, 'তুমি কালই যাও। নি এসে ওদের। আহা, চাট্টি খাবারও জুটে না বুধহয়।'

সিতাব বলে, 'ওই লেগেই চিঠি ফেরত এস্যাছিল গৌরদা।'

'আমিও তাই ভাবি, ভৈরব আমার চিঠির জুয়াব দিবে না? তাই কি কখুনো বিশ্বেস হয়! চিঠিতে ওর ঠিকানা আছে, দ্যাখো তো। ভালো করে দ্যাখো।'

কলকাতার শহরতলির একটা ঠিকানা। পড়ে সিতাব।

ঠিক হয়, গৌরসুন্দর কালই কলকাতা যাবে। নিয়ে আসবে ওদের।

বড় দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরল সিতাব। ভৈরবের চাকরি নেই। আর একটা চাকরি কোথাও জুটিয়ে নিতে পারছে না সে। তাহলে অত লেখাপড়া

শেখার দাম কি ? অত লেখাপড়া শিখে কুলি খাটতে পারবে না তো, মুনিষও খাটতে পারবে না। চাকরি না থাকলে লেখাপড়ার কি দাম ?

সিতাব ভাবে। ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফেরে। ভৈরবের অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে ফুল্লরার কাছে। ফুল্লরা কোনো কথা বলে না। থমথম করতে থাকে তার চোখ-মুখ।

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'কি হলো ? কিছু বুলছিস না যে ?'

ফুল্লরা ঝাঁজালো কণ্ঠে জবাব দেয়, 'তুমার চাকরিটা যেলে আমার জান জুড়্যায়।'

'ক্যানে ? তোর জান জুড়্যায় ক্যানে ?'

'আমার না খেঞেই থাকা ভালো ছিল। অমন চাকরির মুখে ছাই।'

'ক্যানে ? কি হলো তোর ?'

ফুল্লরা কথা বলে না। বড় গম্ভীর।

সিতাব বলে, 'ই চাকরি হলো গরমেণ্টের চাকরি। জলেও ডুবে না, আগুনেও পুড়ে না। তুমার জান জুড়্যাবে কি করে ?'

খাওয়া-দাওয়ার পর হেঁসেল সামলায় ফুল্লরা। তারপর গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে বিছানায়। সিতাব ফুল্লরাকে কাছে টানার চেষ্টা করল। কিন্তু ফুল্লরা দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল। একটা কথাও তার মুখ থেকে বেরোলো না। কি আর বলার আছে ফুল্লরার ? সিতাবের কি চোখ নেই ? শাশুড়ীর মৃত্যুর পর এই বাড়িতে একা পড়ে থাকে ফুল্লরা, সিতাব কি সে-কথা কোনোদিন ভেবেছে ? দিনে দিনে ফুল্লরার শরীর শুকিয়ে কাঠি হয়েছে, রাত জেগে জেগে চোখের কোণে কালি জমেছে, কোনোদিন কি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেছে সিতাব ? শুধু সংসার খরচের কয়েকটি টাকা ফুল্লরার হাতে তুলে দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ ? একটা মানুষ কত সহ্য করতে পারে ?

ফুল্লরার মনের কথা বুঝতে পারে না সিতাব। বোঝার কথাও নয় তার। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় সে। জিজ্ঞেস করে, 'কি, হলো কি তোর ? কিল মেরে ভূত ছাড়াব। হ, বুলে দিল্যাম।'

ফুল্লরা পালটা মুখ ঝামটা দেয়, 'ক্যানে, আমার কথা শুনে তুমার দরকার কি ? যাও ক্যানে, ইস্টিশিনে তুমার বাপের ঘরবাড়ি আছে, উখ্যানে যাও। দিনরাত উখ্যানেই থাকো।'

সিতাব গোঁয়ারের মতো জবাব দেয়, 'হ, আমার বাপের ঘরবাড়ি। থাকব উখ্যানে। একশো বার থাকব।'

'থাকো গা ক্যানে! এখ্যানে আসার দরকার কি ?'

সিতাব লাফিয়ে ওঠে বিছানা থেকে। বলে, 'তাই লে, আর আসব না। থাক তুই হারামজাদী। কত দেমাক তোর, দেখব।'

জামাখানা টেনে নিয়ে সেই অন্ধকারে গট গট করে বেরিয়ে যায় সিতাব। আর ঠিক তখনই বালিশে মুখ গুঁজে হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ে ফুল্লরা।

সেদিন স্টেশনে ডিউটি করছে সিতাব। থ্রী টোয়েন্টি নাইন আপ বারৌণী প্যাসেঞ্জার চলে গেছে। প্লাটফর্মে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকগুলোর কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করছে সে। এমন সময় দেখল গৌরদাকে। কোলে বছর তিনেকের এক রোগা ছেলে। গৌরদা সঙ্গে না থাকলে ভৈরবকে সে চিনতেই পারত না। দু'তিন বছরেই সে যেন বুড়িয়ে গেছে। মাথায় লম্বা চুল, কটা বিবর্ণ। কিছু কিছু চুল ইতিমধ্যেই পেকে গেছে। সেই গোলগাল মুখ আর নেই। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। পরনে পাঞ্জাবি। গলার কণ্ঠী-হাড় দেখা যাচ্ছে। সকলের পেছনে নির্মলা। এ কি তার চেহারা! তার সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো রূপ কোথায়? সেই বেশ-বিন্যাস?

গৌরসুন্দরের মুখে হাসি। যেন রাজ্য জয় করে ফিরে এসেছে সে। বলল, 'নি এল্যাম সিতু। এই দ্যাখ, ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ঠিক জায়গাটা বার করে নি এল্যাম। তা কি আসতে চায়? পাগলের মতুন বোলে—আমি আর উ-গাঁয়ে ঢুকব না। উ-গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব না। ক্যানে, ই তোর যেঞে বাপের গাঁ। তোর চোদ্দ পুরুষের গাঁ। ঢুকবি না ক্যানে? নি এল্যাম জোর করে ধরে।'

সিতাব এগিয়ে গিয়ে ভৈরবের সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমি এখ্যানেই ডিউটি কৈর্‌ছি ভৈরবদা। তুমার কথা শুনে নি লিল্যাম চাকরিটা।'

ভৈরব বলল, 'খুব ভালো করেছিস। এ তোর ভালো চাকরি। উন্নতি হবে।'

নির্মলার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সিতাব। বলল, 'আমার নাম সিতাব। চিনতে পারছ বৌদি?'

নির্মালার মুখে পাংশু হাসি। একদিকে মাথা কাত করে জানায়, চিনতে পেরেছে সে। মুখ দিয়ে তার একটিও কথা বের হয় না।

গৌরসুন্দর ফতুয়ার পকেট হাতড়ায়। বলে, 'ও হে সিতু, তুমার টিকিট লাও হে। এই লাও—এই লাও তুমার টিকিট। তিনখানা। ই ছেলের টিকিট কিনিনি বাপু। ছোট ছেলে।'

সিতাবের হাতে তিনখানা টিকিট গুঁজে দেয় গৌরসুন্দর। তারপর গাঁয়ের পথে পা বাড়ায়। বলে, 'চলি হে। কুন সকালে বেরয়্যাল্‌ছি, বুঝল্যা। যাই আখুন।'

ভৈরব বলে, 'যাস সিতু। সময় করে একবার যাস।'

ওদের চলে যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে সিতাব। স্টেশন থেকে নেমে চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে সে।

ভৈরব তাহলে গাঁয়ে ফিরল। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরল আবার। দুঃখ না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারল না সিতাব।

চতুর্থ অধ্যায়

মা নেই, বুধিও চলে গেছে, সিতাবের চোখের সামনে এখন সারা পৃথিবীটা খাঁ খাঁ করে। দু'দণ্ড শান্তি পায় না কোথাও। পৃথিবীতে তার আপনার বলতে আর কেউ নেই। ফুল্লরা? হ্যাঁ, ফুল্লরা আছে বৈ-কি! কিন্তু তার কথা মনে পড়লেই সারা মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। ফুল্লরাই তার জীবনে শান্তির পথে যেন একমাত্র বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ফুল্লরার জন্যেই সে একদা মৃত্যুপণ করেছিল, নিজের সর্বস্ব দিয়ে ফুল্লরাকে পেতে চেয়েছিল, আজ সে-কথা নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে হয় তার কাছে।

ফুল্লরা বড় স্বার্থপর, বড় আত্মকেন্দ্রিক। সিতাবের দুঃখকষ্ট, পড়াশোনার জন্যে তার প্রাণপাত পরিশ্রম, এসব সে আদৌ চিন্তা করে না। বরং সিতাবের পড়াশোনায় বিরক্ত হয়। বলে, 'তুমি তো চাকরি পেয়্যাছো বাপু। কি হবে আর অত লেখা-পড়া করে?' অথচ পড়াশোনায় তার এই আগ্রহের জন্যেই তারকেশ্বরী ভবতোষ তাকে কত আদর করতেন, ভালোবাসতেন। তারকেশ্বরী বাড়িতে ভালোমন্দ কিছু খাবারের আয়োজন করলেই সেখানে সিতাবের নেমন্তন্ন বাঁধা ছিল। খুব যত্ন করে খাওয়াতেন তারকেশ্বরী। সেই রকমই একদিন উনুন থেকে একটু দূরে সিতাব আর বাবলু একসঙ্গে খেতে বসেছে। তারকেশ্বরী গরম গরম ফুলকো লুচি ছেঁকে তুলে দিচ্ছেন ওদের থালায়। হঠাৎ এক সময় বললেন, 'তুমি বাছা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। শরীর-স্বাস্থ্য আগে কত ভালো ছিল। অনেকে বাপু রাত জেগে জেগে পড়াশুনো করে ঠিক পরীক্ষার আগেই অসুখে পড়ে। সেরকমটি যেন না হয় আবার।'

সিতাব হাসে। তারকেশ্বরীর কথা গ্রাহ্য করে না। বলে, 'আমার যখন-তখন অসুখ হয় না কাকীমা।'

বুধি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেংচি কাটল সে, 'আহা, অসুখ হয় না! সেবারে অসুখে ভুগে তো বুকের পাঁজরাকাঠিগুলো বেরিয়ে পড়েছিল।'

সিতাবের মনে পড়ে না। বলে, 'কখন? কখন অসুখ হলো আমার?'

'কেন, সেবারে! সেই আমি আর বাবলু তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম! মনে নেই? ওমা, গিয়ে দেখি, মাথা নেড়া হয়ে বসে আছে। চিনতেই পারিনে।'

সিতাবের মনে পড়ে। বলে, 'উঃ, সে কি আজকের কথা! তারপর? তারপর আমার আর অসুখ করেছে?'

'বাপ রে বড়াই ! তা মশাই, অসুখ হতে কতক্ষণ ? অমনি একবার যদি অসুখে পড়ো—'

সিতাব তারকেশ্বরীর কাছে নালিশ জানায়, 'দেখছেন কাকীমা, কেমন শাপ দিচ্ছে !'

তারকেশ্বরী হাসেন। বুধি রেগে গিয়ে বলে, 'শাপ দিলাম ? এটা শাপ দেওয়া হলো ? বেশ, আমি আর কথাই বলব না তোমার সঙ্গে।' রাগে গজগজ করতে করতে সেখান থেকে চলে যায় বুধি।

তা এই বুধিই তো তার নিঃস্ব জীবনটাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। সে-ই তো তার সমস্ত উৎসাহ, প্রেরণা। সিতাব যখন সেই প্রথম বইপত্র নাড়াচাডা করতে শুরু করল, মনে মনে সংকল্প করেছে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে, সে-কথা শুনে বুধি বলেছিল, 'তুমি আবার পড়বে সিতুদা ? তোমার মাস্টার মশাই কোথায় ?'

সিতাব বলেছিল, 'তুমাদের কাছে একটুকুন করে দেখিয়ে লিবো দিদিমণি।'

'তা তুমি লখীর কাছে দেখিয়ে নিও। ওই তোমার মাস্টার মশাই।'

লখী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'ধ্যেৎ !'

'ধ্যেৎ কি রে ! মাইনে পাবি। ওকে কিন্তু মাইনে দিতে হবে সিতুদা। এই ধরো চকোলেট, চানাচুর—'

সিতাব হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'আমি রোজ এনে দিবো দিদিমণি।'

কিন্তু শিক্ষকতার দায়িত্বটি বুধি লখীকে ছেড়ে দেয়নি, নিজেই নিয়েছিল। পড়াশোনা ঠিকমতো না হওয়ার জন্যে কখনো সে রাগ করেছে, আবার পরক্ষণেই সিতাবকে প্রশংসা করেছে, উৎসাহ দিয়েছে। আজ বুধি যখন নেই, তখন সেইসব কথা বড় বেশি করে সিতাবের মনে পড়ছে। স্কুল ফাইনালের টেস্ট পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্যে কত খুশি হয়েছিল বুধি। বলেছিল, 'সিতুদা, তুমি দ্বিজ।'

সিতাব কথাটা বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল, 'দ্বিজ মানে ?'

'দ্বিজ মানে যার দু'বার জন্ম।'

'ঠিক বলেছ দিদিমণি। কাকাবাবু দয়া না করলে কিছুই হতো না আমার।'

'তা দ্বিতীয় জন্মে যার কাছে তোমার হাতে-খড়ি, পাস করলে তাকে কি দেবে বলো তো ?'

'যা চইবে।'

'ও বাব্বাঃ, তুমি যে দেখছি একেবারে হরিশ্চন্দ্র। যদি তোমার পুরো রাজ্যটাই চেয়ে বসি, দেবে তো ? দিতে পারবে সিতুদা ?'

'চেয়ে দেখো একদিন।'

'আচ্ছা আচ্ছা। সময়ে বোঝা যাবে।'

তা সিতাব তো পাস করেছে, পাস করার সেই সুসংবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল শ্রীরামপুরে। ভবতোষবাবুকে চিঠি দিয়েছিল, বুধিকেও আলাদা করে চিঠি

দিয়েছিল। বুধি তার চিঠির কোনো জবাব দেয়নি, ভবতোষবাবুও না, জবাব এসেছিল তারকেশ্বরীর কাছ থেকে। সিতাব পাস করায় তাঁরা যে সবাই খুব খুশি হয়েছেন, সে-কথা লিখেছিলেন চিঠিতে। আরও পড়াশোনা করার জন্যে উপদেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু বুধির কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে মনঃক্ষুন্ন হয়েছিল সিতাব। কয়েকদিন পর নিজেই গেলো একদিন শ্রীরামপুরে। কিন্তু কই, বুধি তার রাজ্যপাট চাইল না কেন? বুধি তার রাজ্যপাট চেয়ে নিলে ধন্য হতো সিতাব, তার সমস্ত অশান্তি দূর হতো। আসলে ফুল্লরা যে তাকে পেছনে টানছে। বুধি নিশ্চয়ই জানে, সিতাবের রাজ্যপাট এমন একজন শক্ত মুঠোয় ধরে আছে, সিতাবের নিজেরও সাধ্য নেই তা বিলিয়ে দিতে।

এখন পড়াশোনা করতে কিংবা কলেজ যেতে আদৌ ইচ্ছে করে না সিতাবের। মায়ের মৃত্যুর পরই সে থমকে গিয়েছিল, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তার সারা মন, কিন্তু সামনে পরীক্ষা ছিল বলে যন্ত্রচালিতের মতো পড়শোনা চালিয়ে গেছে। পরীক্ষার পরই তার দেহ-মন একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেলো। এখন সে মাঝে-মাঝেই কলেজ কামাই করে। হয়তো পরপর কয়েকদিন বইপত্র ছুঁয়েও দেখে না। আজও রামপুরহাট গিয়ে কলেজ যেতে ইচ্ছে করল না তার। পথে পথে ছন্নছাড়ার মতো খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। তারপর একসময় গান্ধী পার্কের দিকে পা বাড়াল সে।

গান্ধী পার্কে এগ্‌জিবিশনের মেলা চলছে। প্রচুর দোকানপাট বসেছে। খাবারের দোকান, মনোহারীর দোকান। নাগরদোলা ঘুরছে। এগ্‌জিবিশনের প্যাভিলিয়নে গিয়ে সে খানিকটা ঘুরে বেড়ালো। কৃষি-প্রদর্শনী। আখ, আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলো প্রভৃতি থরে থরে সাজানো আছে। এক জায়গায় সয়াবীনের প্রচার চলছে। সয়াবীনের দুধ, সয়াবীনের দুধ থেকে তৈরি নানারকম মিষ্টি দেখানো হচ্ছে, দর্শকদের টেস্ট্ করতে দেওয়া হচ্ছে। সিতাবের দিকেও একজন বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু হাত পেতে নিলো না সিতাব। মেলার সমস্ত আলো, ভিড়, কোলাহল ছাপিয়ে এক নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গেলো তার মন। সে হাঁটতে হাঁটতে মেলা ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে একখানা বেঞ্চে বসে পড়ল। সামনে গোলদীঘির কালো জলের ভেতর মেলার দোকানপাটের আলোর বর্ণ বৈচিত্র্য। জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সেই আলোর অদ্ভুত ঝিলিমিলি।

কিন্তু আলো নেই সিতাবের মনে। সেখানে শুধু অন্ধকার —নিঃসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সিগ্‌ন্যালের সবুজ আলোর মতো একটুখানি স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। বহুদিন আগে এই গান্ধী পার্কেরই এক মেলায় বুধিদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সিতাব। সেদিনকার মেলা এগ্‌জিবিশনের মেলা ছিল না, একটি সার্কাসকে উপলক্ষ্য করে মেলা বসেছিল। সিতাব বুধিদের সার্কাস দেখাতে নিয়ে এসেছিল। সেদিনই সে বুধির হৃদয়ের ভালোবাসার প্রথম স্পর্শ পেয়েছিল, বড়

সুস্বাদু, বড়ই প্রীতিকর। সেই অমৃতময় স্পর্শ আজও সিতাবের জীবনে অম্লান হয়ে আছে।…

…প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেট্ হিসেবে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে বলে সিতাবকে এফিডেবিট করতে হলো। ফটোও তুলতে হলো। স্টুডিও-র লোকটার পরামর্শে একটা ছবি এনলার্জ করিয়ে নিলো সে। নিজের ছবি দেখে সে নিজেই অবাক। তারকেশ্বরী ছবি দেখে খুব খুশি। বুধি বলল, 'নাইস্। আমায় ক'টা টাকা দিও মা। এমনি একটা ছবি করিয়ে নেবো আমি।'

তারকেশ্বরী বললেন, 'তোর তো অনেক ছবি আছে বাছা। খামোকা খরচ করে কি লাভ!'

'সে-সব তো কতকাল আগের ছবি। দু'তিন বছরের মধ্যে কোনো ফটো তুলেছি, বলো না?'

তারকেশ্বরী কিছু বলেন না। সাধ যায়, কিন্তু সংসারে অভাব-অনটন তো লেগেই রয়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, খরচ বাড়ছে। ভবতোষ যে ক্রমশ দিশেহারা হয়ে পড়ছেন, তা কি বোঝেন না তারকেশ্বরী? খুব বোঝেন। বাড়তি খরচ যতটুকু সম্ভব বাঁচিয়ে সংসার চালাবার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তাতে আর কতটুকু সুরাহা হয়! নিতান্ত প্রয়োজনটাকে তো আর ছেঁটে বাদ দিতে পারেন না। আর সেটুকু বজায় রাখতেই তারকেশ্বরী ভবতোষ দু'জনেই হিমসিম খেয়ে যান। ছেলেমেয়েদের এক-আধটু সাধ-আহ্লাদের কথা চিন্তা করা তো দূরের কথা। বুধি ফের বলল, 'ফটো তোলার টাকা দিতে হবে কিন্তু। আমি কোনো কথা শুনব না।'

তারকেশ্বরী বললেন, 'তা নিস। এখন না, সময় বুঝে দেবো।'

বুধি খুশি হলো না, মুখ গোঁজ করে বসে রইল। কারণ সে জানে, 'সময়' কোনোদিন হবে না, মা কখনও বলবেন না—বুধি, ফটো তোলার জন্যে টাকা দেবো বলেছিলাম, এই নে। যা, ফটো তুলে নিয়ে আয়, দেখি।

সিতাবের মনে বড় দুঃখ হয়। তার জন্যেই এ রকম এক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটে গেলো। বুধি চাইলে সে তার ফটো তোলার টাকা দিতে পারে। হ্যাঁ, এখন দু'চার টাকা খরচ করার সামর্থ্য রয়েছে তার। কিন্তু নিজে থেকে সে-কথা বলার সাহস হয় না। তারকেশ্বরী যদি কিছু মনে করেন।

কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেলো সিতাব।

সেদিন সে ডিউটিতে রয়েছে। সকালবেলা। কেবিনের ভেতর একপাশে বসে বইয়ে চোখ বোলাচ্ছে। কেবিনের সামনেটা অনেকখানি খোলা। গরাদহীন দীর্ঘ জানালার মতো। সেখানে কুনুই রেখে গালে হাত দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিউপ্রসাদ। সামনের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'সিতু, হাথী দেখো। হাথী।'

সিতাব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। স্টেশন থেকে একটু দূরেই রাস্তার ওপরে, ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে দু'চারটে গাছ যেখানে, সেখানে দু'টি বিশাল হাতি। শুঁড় তুলে গাছের ডাল ভাঙছে, ডাল থেকে পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে। সিতাব বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে হাতি দু'টোর দিকে চেয়ে বলল, 'আরে তাই তো, হাতি এলো কোত্থেকে ?'

শিউপ্রসাদ বলল, 'সার্কাসের হাতি মালুম হচ্ছে।'

তাহলে রামপুরহাটে সার্কাস এসেছে। গান্ধী পার্কে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। সার্কাসকে কেন্দ্র করে বেশ মেলা জমে ওঠে সেখানে।

সিতাব কেবিন থেকে বেরিয়ে করবীর ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'বাবলু! ও বাবলু!'

লখী বাবলু পড়তে বসেছিল। তখনও মাস্টার মশাই আসেননি। সিতাবের গলার আওয়াজ শুনে বাবলু কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো। সিতাব ডাকছে, 'হাতি এসেছে। হাতি দেখবে তো এসো।'

হাতির নাম শুনে বাবলু দৌড় দিলো। পেছনে পেছনে লখী বুধি। স্টেশন পেরিয়ে পুকুরটার পাড়ে গিয়ে হাজির হলো তারা। একজন মাহুত রয়েছে হাতি দু'টোর সঙ্গে। শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে গাছের পাতা খাচ্ছে হাতি দু'টো, মাঝে মাঝে ওপরে শুঁড় তুলে গাছের ডাল ভাঙছে। মাহুতটা গাছের ডালপালাগুলো দড়ি দিয়ে বোঝা বাঁধছে। হাতির পিঠে চড়িয়ে ওগুলো নিয়ে যাবে সে।

বাবলু লখী বুধি এমন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতি দেখেনি কখনও। অবাক চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতি দেখতে লাগল তারা। বুধি বলল, 'রামপুরহাটে সার্কাস এসেছে সিতুদা। খুব বড় সার্কাস।'

সিতাব বলল, 'হুঁ, ন্যাশনাল সার্কাস। অনেকদিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, দেখেছি।'

'আজ থেকে খেলা স্টার্ট হচ্ছে। কি চমৎকার চমৎকার খেলা আছে!'

বাবলু বলল, 'আমি সার্কাস দেখব।'

বুধি খিলখিল করে হেসে বাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো, 'হুঁ, একদিন যাবো দেখতে। সবাই মিলে যাবো।'

তারপর সত্যিই একদিন সার্কাস দেখতে গেলো ওরা। ভবতোষের নাইট ডিউটি। ডিউটি কামাই করে সার্কাস দেখতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তারকেশ্বরীও যেতে চাইলেন না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়ল সিতাবের ওপর। সেদিন থ্রী-থার্টি ডাউন বারৌণী প্যাসেঞ্জার ধরল তারা। রামপুরহাটে ট্রেন থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি, দু'দিকে রেলওয়ে কোয়ার্টার। কোনো কোনো কোয়ার্টারের সামনে একটু করে ফুলের বাগান, কেমন চমৎকার দেখতে। জায়গাটা বড় ভালো লাগে সিতাবের।

সে একটু ভালো চাকরি করলে এমনি সুন্দর কোয়ার্টার পেতো একখানা। সাজানো গোছানো ছবির মতো সংসার হতো তার।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে লখী ও বাবলুর প্রচণ্ড উত্তেজনা। অনবরত কি সব বক্‌বক্‌ করছে দু'জনে। মাঝে মাঝে দ্রুতপায়ে বেশ একটু এগিয়ে যাচ্ছে তারা। সিতাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল বুধি। পাশাপাশি। বড় চুপচাপ।

একসময় সিতাব বলল, 'তুমি ফটো তোলার কথা বলছিলে দিদিমণি, তুলবে আজ?'

বুধির চোখ-মুখ সহসা বেশ উজ্জল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'উঁহু, আজ থাক সিতুদা।'

'কেন?'

'আর একদিন এসে তুলব। আজ থাক।'

'আজই তোলো না। আমার কাছে টাকা আছে।'

'তোমার টাকায় ফটো তুললে মা বকবে।'

সিতাবের মুখখানা মুহূর্তে কালো হয়ে গেলো। আড়চোখে চেয়ে দেখল বুধি। বলল, 'অমনি রাগ হয়ে গেলো বুঝি! মিছিমিছি তোমার টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছি জানলে মা রাগ করবে না?'

বুধির কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হলো সিতাব। বলল, 'আমি কাকীমাকে বুঝিয়ে বলব, তোমার মত ছিল না, আমিই জোর করে ফটো তুলিয়েছি।'

'ওরা সঙ্গে আছে যে!' লখী আর বাবলুর দিকে ইশারা করে বলল বুধি। বলতে গিয়ে তার চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

সিতাব বলল, 'ওদেরও ফটো তুলব। ওদের দু'জনের একসঙ্গে।'

বুধি চোখ নামিয়ে পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। সিতাবের মনে এক অপূর্ব অনুভূতি। সে যেন বুধির প্রতি অঙ্গের কোমল সুরভিত স্পর্শ অনুভব করে। সাদিনপুরের ঘৃণ্য নোংরা জীবনটার কথা একেবারে ভুলে যায় সে। তার চোখের সামনে ঝলমল করে অতুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এক জীবন। শত শত সোপান বেয়ে সে ওপরে উঠে যাচ্ছে, অনেক ওপরে—সেখানে খড়ের চাল মাটির দেয়াল কুঁড়েঘর নেই, অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে ফুল্লরা নেই, তার পরিবর্তে রঙ-বেরঙের ফুলে আলোকিত পুষ্পোদ্যান, জলের ফোয়ারা, পুষ্পোদ্যানের মাঝখানে শ্বেত-মর্মরের প্রাসাদ, সেই প্রাসাদে ঝকঝকে পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত সিতাব আর বুধি।

সিতাব বলল, 'তাহলে আগে ফটো তুলে নিয়ে সার্কাস দেখতে যাবো দিদিমণি, ঠিক তো?'

বুধি চোখ তুলে কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে রইল সিতাবের চোখের দিকে। তারপর ফিক করে হেসে বলল, 'তুমি একটা বুদ্ধু। কিচ্ছু বোঝো না।'

সিতাব হাসল। কোনো জবাব দিলো না।

বেশ একটু বেলা ছিল। অতএব কথামতো আগে ফটো তোলা হলো। লখী আর বাবলুর একসঙ্গে। বুধির আলাদা। স্টুডিও-র লোকটা বলল, সার্কাস থেকে ফেরার সময়েই ফটো দিয়ে দেবে। মেলা চলছে বলে বেশ একটু রাত্রি পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে এখন। একটা করে কপি এনলার্জ করা হবে, সেটা দু'একদিন পরে দেবে।

তারপর গান্ধী পার্কে গেলো তারা। গোলদীঘির পাড়ে দারুণ মেলা জমেছে। অনেক দোকানপাট। নাগরদোলা এসেছে, চরকি এসেছে। অগ্নিকন্যার তাঁবুর সামনে উঁচু মঞ্চের ওপর একটা লোক। মুখে চুন মেখে নানারকম ভঙ্গি করে লোক জমানোর চেষ্টা করছে। ওরা নাগরদোলায় চড়ল। সিতাবের সামনের আসনে বসল বুধি। ওদিকে বুধির পাশে লখী, এদিকে সিতাবের পাশে বাবলু। ওপরে উঠে গিয়ে নিচে নামবার সময় গা শিরশির করে ওঠে। ক্রমশ জোরে ঘুরতে থাকে নাগরদোলা। বাবলু সিতাবকে জোরে আঁকড়ে ধরেছে। ওদিকে লখীও আঁকড়ে ধরেছে বুধিকে। সাঁই-সাঁই করে নাগরদোলা ঘুরছে। এক সময় হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে বুধি হাত বাড়িয়ে সিতাবের হাঁটুতে ভর দেয়। মুহূর্তের জন্য। কিন্তু সিতাবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন এক উষ্ণ লাভাস্রোত বয়ে গেলো।

নাগরদোলা থেকে নেমে ওরা সার্কাসে ঢুকল। বেশি দামের টিকিট। কাউণ্টারে বিশেষ ভিড় ছিল না। টিকিট কেটে ভেতরে গিয়ে বসল ওরা। বাবলুর টিকিট লাগেনি। সিতাবের একপাশে বসল বুধি, অন্যপাশে একখানা চেয়ারে লখী আর বাবলু। খেলা দেখতে দেখতে বুধি যেন সিতাবের বড় কাছে সরে আসে। ফিসফিস করে বলে, 'বাবা বদলির জন্যে দরখাস্ত করেছে, জানো?'

সিতাব বলল, 'হুঁ, শুনেছি। তোমরা তাহলে চলে যাবে এখান থেকে?'

'বাবার বদলি হলে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'কোথায় হয়, সেটা এখন জানব কি করে! তবে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও।'

সিতাব চুপ করে থাকে।

একটু থেমে বুধি বলে, 'আগে এখানে আমার ভালো লাগত না।'

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'এখন?'

'এখন! এখন তো এখান থেকে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না।'

'এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে মায়া বসে যায়।'

'দূর, সাদিনপুরে মায়া বসে যাওয়ার কি আছে!'

'তবে? যেতে ইচ্ছে করে না কেন?'

বুধি জবাব দেয় না। জবাব না দিলেও বুঝতে পারে সিতাব।

সার্কাসের খেলা চলছে। কয়েকটি মেয়ে সাইকেল চালাচ্ছে এখন। জোকার

আনাড়িভাবে সাইকেল চালাতে গিয়ে মজার মজার কাণ্ড করছে। দর্শকরা হাসছে। বাবলু লখীও হাসছে খুব। তারপর তারের ওপর সাইকেল চালানো। সাইকেলের খেলা শেষ হলে একটা লোক এসে জল খেতে শুরু করল। গেলাসের পর গেলাস জল খেয়ে যায় সে। জলের সঙ্গে ছোট ছোট মাছ। তারপর মাছ-সুদ্ধ সব জল উগরে দিলো আবার। তাই দেখে একটা জোকার জল আনতে হুকুম করল। কয়েক গেলাস জল খেয়ে তা উগরে দেওয়ার চেষ্টা করতেই তার নাভি থেকে, কপাল থেকে সজোরে জল বেরোতে লাগল। হাসিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা।

এর পর বাঘ-সিংহ হাতির খেলা। হাতি দেখেই বাবলু চিৎকার করে উঠল, 'আমাদের ওখানে গিয়েছিল সেই হাতিটা, তাই না দিদি ?'

লখী বলল, 'ইস্, হাতিটাকে কেমন সাজিয়েছে ছাখ !'

সবশেষে শুরু হলো ট্রাপিজের খেলা। নিচে দড়ির জাল টাঙানো হলো। দড়ির মই বেয়ে হালকা পায়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেলো সুশ্রী মেয়েরা। পাখির মতো দোল খাচ্ছে তারা। শূন্যে সাঁতার কেটে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে যাচ্ছে। এ যেন এক আশ্চর্য কল্পলোক, অশরীরী আত্মার মতো সেখানে লঘুছন্দে ঘুরে বেড়ায় সবাই, নির্ভার, সর্বত্রগামী। সমাজের রূঢ় প্রতিবন্ধকতা নেই সেখানে, দয়িত অবাধে গিয়ে দয়িতার হাত ধরে, দয়িতা পাখির মতো দয়িতকে দু'হাতে তুলে নেয়। ক্লেশ নেই দুঃখ নেই, শুধু এক অনির্বচনীয় আনন্দবিহার।

ঈষৎ অন্ধকারে হঠাৎ বুধির হাতের স্পর্শ অনুভব করে সিতাব। জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলছ ?'

বুধি তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, 'না। কিছু না।'

কথাটা বলতে গিয়ে বুধির গলার স্বর কি একটু কেঁপে উঠল ? সিতাব ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু তার চোখের সামনে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু হারিয়ে গেলো। চারপাশের লোকজন, তাঁবুর খুঁটিগুলো, ক্যাম্পাসের চড়া আলো— সবকিছু ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এক রহস্যময় কল্পলোকে ট্রাপিজের খেলা চলছে। শূন্যে ভাসমান দু'জন —সিতাব আর বুধি। সাঁতার কাটতে কাটতে তারা পরস্পরের দেহ ভেদ করছে বারবার। মর্ত্য থেকে বহুদূরে —অনেক ওপরে —নীল আকাশের গম্বুজের কাছাকাছি।

হঠাৎ ফিসফিস করে বুধি বলল, 'আঃ, ছাড়ো সিতুদা। লাগে।'

বুধির কথায় চমকে উঠল সিতাব। লক্ষ্য করল, কখন নিজের অজান্তেই সে বুধির একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, কঠোর নিষ্পেষণে হাতটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। সম্বিৎ ফিরে পেতেই হাত ছেড়ে দিলো সিতাব। লজ্জায় সঙ্কোচে মনে মনে ছি-ছি করে উঠল। বড় অন্যায় করেছে সে। ভীষণ অন্যায় করেছে।

তখন খেলা প্রায় শেষ। সার্কাসের সমস্ত লোকজন পতাকা হাতে মিছিল সহকারে ক্যাম্পাস পরিক্রমা করছে। বর্ণাঢ্য আলোর খেলা চলছে সারা ক্যাম্পাস জুড়ে। তারপর একসময় ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হলো। সমস্ত দর্শক উঠে দাঁড়াল নিজেদের আসন ছেড়ে। সিতাবও উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মাথা তুলে সামনের দিকে সে আর তাকাতে পারছিল না।

হঠাৎ সঙ্কোচের সমস্ত বিহ্বলতাকে নস্যাৎ করে দিলো বুধি। সিতাবের হাত ধরে বলল, 'চলো সিতুদা, আমরা এগিয়ে যাই।'

লখী আর বাবলুর হাত ধরে ওরা একটু একটু করে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।...

...সিতাবের মনে ভয় ছিল, অপরিমেয় গ্লানিও ছিল। ভেবেছিল, এর পর বুধি হয়তো তাকে কখনও ক্ষমা করবে না, তার সঙ্গে আর কখনও কথা বলবে না। কিন্তু তার সে-আশঙ্কা যে অমূলক, তা সে বুঝতে পেরেছিল দিন দু'য়েক পরেই। সেদিন বুধির বড় এনলার্জ করা ছবিটা এনেছিল সিতাব, এনে তারকেশ্বরীর হাতেই দিলো। তারকেশ্বরী ছবি দেখে খুশি। বললেন, 'তুমি বাছা অতগুলো টাকা-পয়সা খরচ করলে! টাকাটা দিতে চাইছি, তা-ও নেবে না বলছ।'

সিতাব বলল, 'থাক কাকীমা। সেরকম তো কিছু দিতে পারিনে, একটা ফটো তুলে দিয়েছি, এমন তো বেশি কিছু নয়!'

'ছেলের কথা শোনো!' তারকেশ্বরীর মুখে আর কথা যোগাল না।

সিতাব বলল, 'আপনাদের ঋণ কি শোধ করতে পারি কাকীমা? আশীর্বাদ করেন যেন পাস করতে পারি।'

বুধি তখন তারকেশ্বরীর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে দেখছিল। বলল, 'আমি তো তোমার মাস্টারমশাই সিতুদা। আমি আশীর্বাদ করছি—'

সঙ্গে সঙ্গে তারকেশ্বরী ধমক দিলেন, 'এই বুধি, দিন দিন তুই ভারি অসভ্য হয়ে যাচ্ছিস!'

সিতাব যখন ভবতোষের বাড়ি থেকে চলে আসছে, এক ফাঁকে বুধি সিতাবকে চুপিচুপি বলল, 'আজ তোমায় একটা জিনিস দেবো সিতুদা।'

সিতাব জানতে চাইল, 'কি দেবে?'

'সে একটা কিছু দেবো এখন। সন্ধ্যেয় —ওইখানটায়, কেমন!' বুধি হাতের ইশারায় শিউপ্রসাদের কোয়ার্টারের পেছন দিকটা দেখাল।

তারপর সিতাবের সে-কি সাগ্রহ প্রতীক্ষা! সময়টুকু যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। কি দেবে বুধি, কি দিতে পারে, ভেবে কোনও কূলকিনারা করতে পারে না সে। সন্ধ্যের ছায়া যতই ঘনীভূত হয়, সিতাবের মন ততই

উৎকণ্ঠিত হতে থাকে। অবশেষে, সেই পরম মুহূর্তটি এলো, কোয়ার্টারের পেছনে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বুধি জিজ্ঞেস করল, 'কি দেবো বলো তো?'

সিতাব বিমূঢ় স্বরে জবাব দিলো, 'কি করে বলব!'

'বুঝতে পারোনি তো! খুব ভেবেছ নিশ্চয়? ওই জন্যেই বলিনি।'

তারপর বুধি তার ব্লাউজের গলার কাছে হাত ঢুকিয়ে একখানা ফটো বার করল। সেটা সিতাবের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমরা তো চলে যাচ্ছি এখান থেকে। অন্তত আমার একখানা ফটো তোমার কাছে থাক, কেমন!'

একটা সবকিছু হারানোর দুঃখে সিতাবের মন হাহাকার করে উঠেছিল। ফটোখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সিতাব।

বুধি আবার বলেছিল, 'তোমার ফটো তো আমায় দেবে না! চেয়ে আর শুধু শুধু মুখ নষ্ট করব না।'

সিতাব তৎক্ষণাৎ বলেছিল, 'আমার ফটো তোমাকে দেবো দিদিমণি।'

'না দিলেও ক্ষতি নেই। সার্কাস দেখতে দেখতে আমার হাতটা যা জোরে মুচড়ে দিয়েছিলে তুমি, উঃ, এখনো ব্যথা করছে। ফটো না দিলেও তোমার কথা খুব মনে থাকবে।'

বুধি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই সিতাব খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরেছিল, 'আমার একটুও খেয়াল ছিল না দিদিমণি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

'বেশ, এবার থেকে যেন খেয়াল থাকে। ফের যদি অমনি হাত টিপে দাও, আমিও শোধ নিতে ছাড়ব না কিন্তু।' কথাগুলো বলেই আস্তে আস্তে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল বুধি। তারপর হঠাৎ সিতাবের হাতখানা জোরে টিপে দিয়ে দ্রুতপায়ে পালিয়ে গিয়েছিল।…

সে-সব কথা এখন স্বপ্নের মতো মনে হয় সিতাবের কাছে। তারপর বুধি আর ক'দিনই বা ছিল এখানে! ভবতোষের বদলির হুকুম এলো, তল্পিতল্পা গুটিয়ে শ্রীরামপুর চলে গেলেন তিনি। কয়েকদিন পরে এসে বুধিদেরও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। সিতাবের চোখের সামনে শূন্য হয়ে গেলো সারা পৃথিবীটা।

সেই উচ্ছল সিতাব, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর সিতাব, মৃত্যু হলো তার। যান্ত্রিক সভ্যতার সামান্যতম স্পর্শই তার সহজাত প্রকৃতিকে নিঃশেষ করে দিলো। তার সুখ, তার আনন্দ, তার সরল জীবন-যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিলো। বিনিময়ে কি পেয়েছে সিতাব? পেয়েছে সুগভীর বিষাদ, সমস্ত অন্তঃকরণ জুড়ে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মতো বিষাদ।

বেঞ্চে হেলান দিয়ে সে চুপচাপ বসে ছিল। মেলার কোলাহল ভেসে আসছে, মাইকে হিন্দী গান শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর আনন্দ-কোলাহল

থেকে সিতাব যেন বহুদূরে। এখন তার চোখের সামনে দীঘির অতল কালো জলে মেলার আলো ঝিলমিল করছে। স্তব্ধ নিস্পন্দ অন্ধকারে এখন শুধু রঙিন আলোর ঝিলিমিলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সিতাব।

দুই

সিতাবের কিছুই ভালো লাগে না। কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি হাতে ছুঁতেও ইচ্ছে করে না তার। কি হবে পড়াশুনো করে? সবই অর্থহীন বলে মনে হয় তার কাছে। সংসারের সমস্ত কিছুর ওপর এমন বিতৃষ্ণা সে আগে কখনও অনুভব করেনি। সেদিন কোয়ার্টারে চুপচাপ বসে ছিল সিতাব। একপাশে কলেজের বইপত্র ছড়ানো-ছিটোনো। ওপরে একখানা টকটকে লাল মলাটের বই —'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারা।' ভৈরব তাকে বইখানা পড়তে দিয়েছে। কিন্তু সে এখনও খুলে দেখেনি।

ভৈরব কলকাতা থেকে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। একদা যে সাদিনপুরের পালদের ভৈরব সারা অঞ্চলের গর্বের পাত্র হয়ে উঠেছিল, সেই ভৈরব তার সর্বস্ব হারিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। সম্প্রতি রামপুরহাটে দু'একটা টিউশনি যোগাড় করে নিয়েছে সে। টিউশনি করছে এখন। আয়াশের বশীরের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা। ছেলেবেলায় স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে। সেই সূত্রে আন্তরিক পরিচয় তো ছিলই, ইদানীং ভৈরব সি. পি. আই-এর কর্মী হিসেবে কাজ করছে। কাঁধে সাইড ব্যাগ ঝুলিয়ে বশীরের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, পার্টি অফিসে যায়। স্টেশনে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সিতাবের। একদিন ভৈরব তার সাইড ব্যাগ থেকে এই বইখানা বার করে দিয়ে বলেছিল, 'পড়ে দেখিস সিতু।'

সিতাবের পড়া হয়নি। কি হবে পড়ে? সিতাবের এখন যে কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই। তার নিজের পড়াশোনার বই, তাই সে ছুঁয়ে দেখে না, অন্য বইয়ে কি আগ্রহ আসে? বইখানা অমনি পড়ে রইল তার কলেজের বইয়ের স্তূপে।

কয়েকদিন পর আবার একদিন সন্ধ্যের দিকে ভৈরবের সঙ্গে দেখা হয়। এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞেস করে, 'বইখানা পড়েছিস সিতু?'

সিতাব সকুণ্ঠ জবাব দেয়, 'না ভৈরবদা, পড়া হয়নি।'

কথা বলতে বলতে ভৈরব ও সিতাব এগিয়ে যায় প্লাটফর্ম ধরে। কিছুদূরে গিয়ে একটা গাছের তলায় বসে। অনেকক্ষণ গল্প করে দু'জনে। সেদিনই ভৈরব তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা খুলে বলেছিল সিতাবের কাছে। তার চাকরি যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছিল। সে-কথা শুনতে শুনতে ভৈরবের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে

গিয়েছিল সিতাবের মন। সিতাবের চোখে ভৈরব আর পাঁচজন থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

উঠে যাওয়ার আগে ভৈরব বলেছিল, 'আমার কথা হয়তো সব বুঝতে পারিসনি তুই। হয়তো তোর মনে হবে, আমি খুব বোকা, নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছি। কিন্তু আমি যা করেছি, তাতে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই। আমি এখনো মনে করি, আমি ঠিক করেছিলাম, ঠিক পথেই এগিয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই আমি হেরে গেছি। যাই হোক, তোকে যে বইখানা দিয়েছি, পড়িস। পড়লে হয়তো আমার কথা কিছু কিছু বুঝতে পারবি।'

সিতাব লাল মলাটের বইখানার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে এক সময় হাত বাড়াল। প্রথম পাতা ওলটাতেই তার চোখে পড়ল, 'দুনিয়ার মজুর এক হও।'

সিতাব অবাক হলো। লাল ঝাণ্ডার লোকেরা যে-কথা উচ্চারণ করে, সে-কথা ছাপার অক্ষরে লেখা আছে বইখানায়। পাতা ওলটায় সিতাব :

> আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। ...এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে...

বইখানায় যথেষ্ট ফুট-নোট দেওয়া আছে। তাছাড়া মার্জিনের সাদা অংশে ছোট ছোট অক্ষরে হাতে লেখা আছে বহু দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ। ভৈরব লিখে দিয়েছে বুঝবার সুবিধের জন্যে। সিতাবের মনে হলো, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের সারবস্তু সম্ভবত এই দু'টি লাইনেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সিতাব পড়তে থাকে :

> গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে —বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।

'বুর্জোয়া' এবং 'প্রলেতারিয়েত' শব্দ দু'টির টীকা দেওয়া আছে। অতএব সিতাবের বুঝতে অসুবিধে হলো না। একদিকে পুঁজিপতি, অন্যদিকে শ্রমিক। একদিকে কারখানার মালিক, অন্যদিকে ভৈরব। একদিকে ছকু মোড়ল সাম মোড়ল, অন্যদিকে শিবু সুমাদিস জগতকারু। দু'টি শিবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে লড়াইয়ের জন্য।

তা সেই লড়াই করতে গিয়েই তো ভৈরব সর্বস্ব হারিয়েছে। চাকরি গিয়েছে তার। গৌরসুন্দর নিতান্ত ভালোমানুষ না হলে পৃথিবীতে তার দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। দাদার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে, চরম ঔদ্ধত্য দেখিয়ে নিজের অংশের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছিল সে। কিন্তু সিতাব জানে, সেজন্য ভৈরব দায়ী নয়। নির্মলার স্বার্থবুদ্ধিই তাকে বাধ্য করেছিল সম্পত্তি বিক্রি করতে। নির্মলার একান্ত ইচ্ছে ছিল, কলকাতার কাছাকাছি একটু জায়গা কিনে একটা ছোট-

খাটো বাড়ি তৈরি করা। কিন্তু তার সে-সাধ পূর্ণ হয়নি। মালিকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে চাকরি হারাল ভৈরব, পথের ভিখেরী হয়ে গেলো সে। ভৈরবের এই অসহায় অবস্থায় গৌরসুন্দর ও বাসন্তী সব ক্ষমা করেছে, যে বাৎসল্য স্নেহে ভৈরবকে ছেলে-বেলা থেকে মানুষ করেছে, সেই বাৎসল্য স্নেহের কাছে সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি পরাভূত হয়েছে। ভৈরব সপরিবারে ফিরে আসাতে গৌরসুন্দর খুশি হয়েছে, খুশি হয়েছে বাসন্তীও। গৌরসুন্দর বলে, 'সম্পত্তি যেল্‌ছে তো কি হলো, কপালে থাকলে আবার হবে।' বাসন্তী বলে, 'ঠিক সময়ে খবরটা পেয়্যাছিল্যাম বুলেই তো, নাহলে কি যে হতো, ভাবলেই আমার গা থরথর করে।' ভৈরবের কাছে এর চেয়ে বড় সম্পদ পৃথিবীতে আর কি আছে? একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সব কিছু বিস্মৃত হয়েছিল সে।

কিন্তু সত্যিই কি ভৈরব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, না নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল আরও বৃহৎ, আরও বিস্তৃত এক জগতের মধ্যে? সীমিত ক্ষমতা ও যোগ্যতার অভাবের জন্যেই সে তার মহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। অনভিজ্ঞতাই তাকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

গ্রামের ছেলে ভৈরব, সংবেদনশীল মন নিয়েই সে শহরে গিয়েছিল চাকরি করতে। শহরের আবহাওয়ায় তার মানবিক অনুভূতিগুলি নিঃসাড় হয়ে যায়নি। বরাবর পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে, সহজেই একটা ভালো চাকরি পেয়ে গিয়েছিল সে। অ্যাকাউন্ট্‌স্ ক্লার্ক। কাজকর্মে ভালো, নম্র ব্যবহার, কয়েক মাসের মধ্যেই সে অফিসারদের বড় প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। চাকরিতে উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু নিজের কাজের মধ্যেই সে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারল না। ভৈরব দেখল, কারখানায় যারা কাজ করে, কি নিদারুণ পরিশ্রম করে তারা। অথচ তাদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু নেই, উচ্চাশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, এমন কি তাদের চাকরির নিরাপত্তাটুকুও নেই। তারা যেন ফোরম্যানের বাড়ির চাকর, লেবার অফিসারের বাড়ির ঝাড়ুদার, ডিপার্টমেণ্ট ম্যানেজারের বাড়ির কুকুর। কার কখন চাকরি যায়, সবই তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। ভৈরব দেখে, মাঝে মাঝেই দু'চারজনের চাকরি চলে যায় কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশিতে। জিনিস-পত্রের দাম আকাশছোঁয়া হলেও তাদের পাওনা গণ্ডা বাড়ে না, উৎপাদন লাভজনক নয় —এই অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ বোনাসের নামে টালবাহানা করে, আর সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার, কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের শ্রম চুরি করে নানারকম কারচুপির মাধ্যমে। ভৈরব অ্যাকাউন্ট্‌স্ ক্লার্ক হিসেবে পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছিল কিছুদিনের মধ্যেই, কর্তৃপক্ষের সব রকম কারচুপি তার চোখে ধরা পড়ে।

ভৈরবের মনে একদিকে সহানুভূতি, অন্যদিকে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন একটি ছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ নয়। কর্তৃপক্ষের অবিচারের বিরুদ্ধে তারা কখনো কখনো আন্দোলন করে, গরম গরম বক্তৃতা দেয়,

তারপর দু'দিনেই তাদের সমস্ত উত্তেজনা চুপসে যায়। বাইরে থেকে দু'একজন শ্রমিক-নেতা মাঝে মাঝে এসে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অধিকাংশ শ্রমিকই ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করতে পারে না। কারণ তারা চোখের সামনে ইউনিয়ন করার ভয়ঙ্কর পরিণতি লক্ষ্য করেছে। একবার কারখানায় এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় একজন শ্রমিক পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। অল্পের জন্যেই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিল সে, কিন্তু তার কাজ করার ডান হাতখানি খোয়া গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরিতে আর বহাল রাখতে চায়নি। শুধু তার প্রাপ্য পাওনাগণ্ডাটুকু মিটিয়ে দিয়ে তাকে জবাব দেওয়া হলো। তখন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হলো, কিন্তু কোনো ফল হলো না। চাকরি তো সে পেলোই না, এমন কি কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে সে যে পঙ্গু হয়েছে, সেজন্য কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে চাইল না কর্তৃপক্ষ। অবশেষে শ্রমিকদের কাছে 'গো স্লো' কর্মসূচী সফল করতে আহ্বান জানানো হলো। দাবি ছিল, পঙ্গু শ্রমিকটিকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা, ডান হাতের প্রয়োজন নেই এমন একটি কাজ দেওয়া। কারখানায় সে-ধরনের কাজের অভাব নেই। প্রায় সমস্ত শ্রমিকই এই 'গো স্লো' আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। কারণ, পঙ্গু শ্রমিকটি তাদের দীর্ঘকালের সাথী, তাদের বন্ধু, কর্মক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়। তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে সমবেদনা উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আচমকা পাঁচজন নেতৃস্থানীয় শ্রমিককে বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, মুহূর্তে ভেঙে গেলো তাদের আন্দোলন। যেখানে শ্রমিকদের আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল, আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলা উচিত ছিল, সেখানে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল তারা।

শ্রমিকরা তাই এখন ইউনিয়নকে ভয় পায়। চাকরিতে তাদের এমনিতেই নিরাপত্তা নেই, তার ওপর ঝুঁকি নিতে সাহস হয় না। সমস্ত অত্যাচার অবিচার নিপীড়ন অপমান নীরবে হজম করে। সঙ্গী-সাথী কারোর চাকরি চলে গেলে নিজের চাকরি যাওয়ার পরোয়ানা কবে আসে, সেই ভেবে উৎকণ্ঠিত হয়। ভীত শঙ্কিত অবস্থায় ঘাড় গুঁজে কাজ করে। সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে, যেটুকু হাতে পাওয়া যাচ্ছে, অন্তত সেটুকু যেন খোয়া না যায়। কর্তৃপক্ষের এই তো সুযোগ। কর্তৃপক্ষ তো এই রকম একটা পরিবেশই তৈরি করতে চায়। তারা বাজারের জিনিসপত্রের বর্তমান মূল্য অনুযায়ী বেতন না দিয়ে শ্রমিকদের শ্রম চুরি করে, তাদের কাজের হিসেবে কারচুপি করে শ্রম চুরি করে, উৎপাদন-মূল্য ও বিনিময়মূল্যে তারতম্য ঘটিয়ে কারখানার উৎপাদন লাভজনক নয়—এই অজুহাতে যথোচিত বোনাস না দিয়ে তাদের শ্রম চুরি করে। সেসব কাজের জন্যে তারা হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়ে দেশের প্রতিভাবান মানুষদের পোষে—ইকনমিস্ট, কস্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, বিজনেস ম্যানেজমেণ্টের গোল্ড মেডালিস্ট

প্রভৃতিকে। আর তাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে আসে কলেজের মেধাবী ছাত্র ভৈরবেরা।

কিন্তু ভৈরবেরা সকলেই এই শোষণযন্ত্রের নাট-বল্টু হতে চায় না। কেউ কেউ যথাস্থান থেকে আলগা হয়ে গিয়ে সমগ্র যন্ত্রটাকে বিকল করে দিতে চায়।

ভৈরব সিতাবকে তার এক আশ্চর্য উপলব্ধির কথা বলেছিল, 'আমি তো গাঁয়েই মানুষ, আখ-মাড়াই কলে আখ মাড়াই হতে দেখেছি। বড় বড় বেলনগুলো ঘুরছে, বেলন ফাঁকে গোছা গোছা আখ চলে যাচ্ছে, আর টিনের পাত দিয়ে গড়-গড় করে রস বেরিয়ে আসছে। চাকরিতে ঢুকে শ্রমিকদের হাল-চাল দেখে আমার শুধু মনে হতো, কারখানাটা যেন এক বিরাট আখ-মাড়াই কল; এই ধর, বিরাট বিরাট বেলন ঘুরছে, বেলনের ফাঁকে গোছা গোছা মানুষ চলে যাচ্ছে, পেষাই হচ্ছে তারা, টিনের পাত দিয়ে গড়গড় করে রক্ত বেরিয়ে এসে বিশাল পাত্রে জমা হচ্ছে। কলটার অপরদিকে আখের ছিবড়ের মতো শ্রমিকের রক্তহীন ছিবড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আর একটি যন্ত্র আছে, পাত্র থেকে রক্ত তুলে নিয়ে গিয়ে তাতে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। নানারকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই রক্ত পরিশোধিত হয়ে চকচকে গোলাকার ধাতব মুদ্রা হয়ে বেরিয়ে আসছে। মেঝের ওপর গাদা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে টাকার পাহাড়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। আনন্দে আহ্লাদে, পরম তৃপ্তিতে পুঁজিপতির মুখে হাসি উছলে উঠছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য, বল দেখি!'

সত্যিই, সিতাবের কাছেও ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর বলেই মনে হয়েছে। দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে তারও হৃকম্প হয় বৈ-কি! তা সেই বিশাল যন্ত্রটার একটি নাট-বল্টু আলগা হয়ে খুলে পড়ে গেলো একদিন। তারপর বেলনগুলোর ভেতরে সেটা এমনভাবে আটকে গেলো যে গোটা যন্ত্রটাই বিকল হয়ে গেলো এক মুহূর্তে। ভৈরব সেই বেলনগুলোর মধ্যে আটকে যাওয়া নাট-বল্টু।

মালিকের তাঁবেদার কয়েকজন শ্রমিক ছাড়া অধিকাংশ শ্রমিকই তার নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ভৈরবের ডাকে তারা তীব্র আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে ইতস্তত করেনি। কারখানায় সফল ধর্মঘট করতে সক্ষম হয়েছিল ভৈরব। তাদের প্রধান প্রধান দাবি ছিল—চাকরির নিরাপত্তা, অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান। দাবিগুলির প্রত্যেকটিই উৎপাদন-মূলক, অর্থনীতির দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি দাবিই উৎপাদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু মালিক পক্ষ সে-কথা স্বীকার করতে রাজি নয়। পনেরো দিন ধরে সফল ধর্মঘট চালানোর ফলে কর্তৃপক্ষ আলোচনায় বসতে বাধ্য হলো, কিন্তু মূল দাবিগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারপর গোপনে ভৈরবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কারখানার ম্যানেজার। নানারকম লোভ দেখানো হলো

তাকে —উচ্চপদ, মোটা বেতন, নগদ টাকা। কিন্তু ভৈরবকে টলানো সম্ভব হলো না। অবশেষে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করল কর্তৃপক্ষ। মুষ্টিমেয় দালাল শ্রমিক ও বাইরের ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে তাদের ওপর একদিন অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হলো। পুলিস এসে শান্তিরক্ষার জন্য গুলি চালাল। কিন্তু গুলি চলল দালাল ও গুণ্ডাদের ওপর নয়, ধর্মঘটী-শ্রমিকদের ওপরই। গুণ্ডাদের আক্রমণে এবং পুলিসের গুলিতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হলো। ভৈরবের আঘাতও ছিল গুরুতর। সেরে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। শুধু তাই নয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার অভিযোগে তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। নেতৃত্বের অভাবে এবং কর্তৃপক্ষের সন্ত্রাসমূলক আচরণের ফলে শ্রমিকদের আন্দোলন ভেঙে গেলো। চাকরি গেলো ভৈরবের।

ভৈরব বলেছিল, 'তবে এখানেই শেষ নয়। মালিক আর শ্রমিক, সমাজে এই দু'টি শ্রেণী যতদিন থাকবে, ততদিন লড়াই চলবে। আমি যতদূর জানি, ওরা ভেতরে ভেতরে আবার সংগঠিত হচ্ছে, অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছে। আসলে শিশুরা যেমন আছাড় খেতে খেতে হাঁটতে শেখে, এবং হাঁটতে শিখলে যেমন সহজে আর আছাড় খায় না, তেমনি অতীতের আন্দোলনের ভুল ভ্রান্তি থেকেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই পরবর্তী আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলে, নির্ভুল পথে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ওরা জিতবেই।'

ভৈরবেব চাকরি যাওয়ার ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জানলে এই ইশতেহারের কিছুই বুঝতে পারত না সিতাব। কল-কারখানার শ্রমিকদের ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই ছিল না। সে জানত, চাকরি মানেই সুখ-শান্তি, তা সে-চাকরি যেখানেই হোক এবং যেরকমই হোক না কেন। কিন্তু ভৈরব বলে, 'শুধু কল-কারখানার শ্রমিক বলে নয়, এ-সমাজে বেঁচে থাকার জন্যে যে যেখানে মেহনত করছে, প্রত্যেকেই শোষিত হচ্ছে। এই যে তুই রেলে চাকরি করছিস, তোর যা পাওনা, তা সবটাই-দেওয়া হচ্ছে না তোকে। তোর কাছ থেকে যা শোষণ করা হচ্ছে, তা নানাভাবে নানা পথে পুঁজিপতিদের ঘরে গিয়ে জমা হচ্ছে, তাদের পুঁজি বাড়াচ্ছে।'

সিতাব ভাবতে থাকে। এভাবে কখনও ভেবে দেখেনি সে।

ভৈরব আরও বলেছিল, 'আসলে আমরা যে যেখানেই কাজ করিনে কেন, আমরা পুঁজিপতিদের পুঁজি বাড়াতে সাহায্য করছি। আমাদের দিয়ে যতক্ষণ পুঁজি বাড়ে, ততক্ষণই আমাদের প্রয়োজন বোধ করে তারা। আমাদের দিয়ে যখন আর পুঁজি বাড়ে না, তখন ছুটি দিয়ে দেয় আমাদের। আমাদের চাকরি যায়। অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ি আমরা। তাই কল-কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হয়, অফিস কাছারিতে কর্মচারী 'সারপ্লাস্' হয়ে যায় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। চাকরি যায় তাদের।'

সিতাব ইশতেহারের পাতা ওলটায় :

> যে পরিমাণে বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজি বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ পায় প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতীদের এ শ্রেণীটি বাঁচতে পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমে পুঁজি বাড়তে থাকে। এই মেহনতীদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়। বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মতোই তারা পণ্যদ্রব্যের সামিল।···

মানুষ পণ্যদ্রব্য? ক্রীতদাস প্রথার কথা মনে পড়ল সিতাবের। আজকাল যেমন ছাগল-গরু কেনা-বেচা হয়, তেমনি মানুষ কেনা-বেচা হতো এক সময়। মানুষের দর-দাম হতো তাকে দিয়ে কতখানি মেহনত করিয়ে নেওয়া যাবে, তার কাছ থেকে কতটুকু শ্রম আদায় করা যাবে, তার ওপর। ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও মেহনতী মানুষকে পণ্যদ্রব্যের মতো ব্যবহার করা হয়। বরং আরও বেশি করে।

> ···মজুরেরা কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস।···

সিতাবের চিন্তা-চেতনায় এক প্রচণ্ড ঘা লাগে। সে দাস? বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস? ভৈরবের ভাষায়, পুঁজিপতিদের শোষণযন্ত্রের নাট-বল্টু? উত্তেজিত হয় সিতাব।

বেলা পড়ে আসছে। ঘরের ভেতরটা একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে, ভালো করে পড়া যাচ্ছে না। সিতাব বইখানা হাতে নিয়ে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসে। স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়।

স্টেশনে আসতেই সিতাব লক্ষ্য করল, শঙ্করবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। সাদিনপুর স্টেশনে কাজকর্মের বিশেষ চাপ নেই। যথেষ্ট অবকাশ। সময় কাটতে চায় না। শঙ্করবাবু মাঝে মাঝে অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় পায়চারি করেন। কখনো কখনো সামনে সুবিস্তৃত মাঠের দিকে চেয়ে এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। আজও তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সিতাব সিগন্যাল-কেবিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ শঙ্করবাবুর নজর পড়ল সিতাবের হাতের বইখানার দিকে। স্থির চোখে চেয়ে রইলেন তিনি। বুঝবার চেষ্টা করলেন, কি বই হতে পারে। তারপর ডাকলেন, 'সিতু, কি বই দেখি।'

সিতাব কাছে আসতেই বুঝতে পারলেন শঙ্করবাবু। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বই কোথায় পেলে?'

সিতাব জবাব দিলো, 'ভৈরবদা দিয়েছে।'

'কে ভৈরব?'

'আমাদের গাঁয়ের। আগে কলকাতায় চাকরি করত।'

'হুঁ। কলকাতা থেকে আমদানি করেছে এসব!' ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শঙ্করবাবু। তারপর চড়া গলায় বললেন, 'চাকরির মায়া নেই বুঝি? জানো, ওটা কিসের বই?'

'না।' সিতাব ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

'তবে? তবে ও-বই হাতে নিয়েছ যে? দুনিয়াতে আর পড়ার বই নেই? এলেম দেওয়ার লোক জুটে গেছে?'

শিউপ্রসাদ কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো।

চেঁচামেচি শুনে রজতবাবুও বেরিয়ে আসেন অফিস-ঘর থেকে। বলেন, 'কি হলো শঙ্করবাবু? এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

শঙ্কর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রজতের দিকে একবার তাকান। তারপর এক টানে সিতাবের হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে সামনে ছুঁড়ে দেন। ফরফর করে উড়তে উড়তে সেটা রেল-লাইনের ওপর গিয়ে পড়ে।

রজত বলেন, 'আঃ, এত রেগে যাচ্ছেন কেন? পড়লে দোষ কি? পড়ুক না, ভালোমন্দ নিজেই বুঝবে।'

শঙ্কর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন, 'এই সব বুঝেই তো আপনি নিজের চাকরিটা খোয়াতে বসেছিলেন। শেষে নাকে খৎ দিয়ে—'

রাগে রজতের মুখখানা থমথম করতে থাকে। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রেখে বলেন, 'হ্যাঁ, সেরকম পরিস্থিতিতে আমি হয়তো আবার চাকরি খোয়াবার ঝুঁকি নেবো। সে-তর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজন পড়তে চাইছে, তাকে পড়তে দেবেন না কেন? আপনারা তো গণতন্ত্রের কথা বলেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেন!'

'রাশিয়াতে গিয়ে চীনে গিয়ে ও-প্রশ্ন করুন না?'

'ওরা না-কি ও-সব মানে না! ওদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু আপনারা তো মানেন! ব্যক্তিস্বাধীনতার ধ্বজাধারী আপনারা—আপনারা কেন বলছেন, এটা পড়া অন্যায়, ওটা পড়া অন্যায়? একজনের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন কেন?'

'তর্ক করবেন না। স্বাধীনতা কথাটার মানে শিখে আসুন আগে।'

'সে-তো হাড়ে হাড়ে শিখছি শঙ্করবাবু। আসলে আপনারা ভয় পান। কেউ জানতে চাইলে বুঝতে চাইলেই আপনাদের ভীষণ ভয়। আপনারা চান, সবাই চোখ বুজে থাক, বাইরের জগতের দিকে কেউ যেন উঁকি না মারে। তাইতো আপনারা মার্কস্-লেনিনের বই কেড়ে নিয়ে হাতে পর্নোগ্রাফি ধরিয়ে দেন, ছোট ছোট শিশুদের হাতে তুলে দেন ব্যক্তিস্বাধীনতার ল্যাবরেটরিতে তৈরি ক্রাইম্ আর ভায়োলেন্সের রোমাঞ্চ কাহিনী।'

কথাগুলি বলেই রজত আর দাঁড়ালেন না। দ্রুতপায়ে নেমে গিয়ে বইখানা কুড়িয়ে আনলেন। অফিস-ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'বেশ, থাক। এটা আমার কাছেই থাক।'

রাগে উত্তেজনায় শঙ্করের সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন, 'হুঁঃ, যত্তো সব!'

সিতাব বিমূঢ়, বিস্মিত। আগে সে কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল, বইখানা এমন বিপজ্জনক! ও বই হাতে নিলে চাকরিও চলে যেতে পারে! এক অজানা ভয়ে তার সারা শরীর শিউরে ওঠে।

কেবিনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিউপ্রসাদ হতবাক—একখানা মামুলী 'কিতাব' নিয়ে এমন লড়াই! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না সে।

তিন

সেদিন ডিউটি করছে সিতাব, হঠাৎ শিবুর সঙ্গে দেখা। বহুদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। কারণ সিতাব এখন গাঁয়ে ফেরে খুব কম। কখনো-সখনো এক-আধদিন গেলেও দেখা হয় না। হঠাৎ সেদিন সিতাব দেখল, শিবু মাথায় ঝাঁকা নিয়ে বাড়ি ফিরছে। জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি যেছো শিবু কাকা?'

শিবু এক গাল হেসে বলল, 'সিতু, কতদিন দেখিনি তোকে? ভালো আছিস?'

'হ্যাঁ কাকা, বেশ চলে যেছে।'

'ভালো ভালো। তোর সাথে কথা ছিল সিতু। আখুন সময় হবে তোর?'

'বোলো ক্যানে।'

'তাহলে চল। উদিকে বসি একটুকুন।'

স্টেশন থেকে দূরে একটু নিরিবিলিতে এলো ওরা। একটা গাছের তলায় এসে শিবুর মাথা থেকে ঝাঁকা নামাতে সাহায্য করল সিতাব। ঝাঁকা নিচে নামিয়ে রাখতে রাখতে সিতাব বলল, 'উঃ, ভারি কত শিবু কাকা? মালপত্তর তো কম নাই দেখছি!'

শিবু বলল, 'মালের অভাব নাই সিতু। তোর কাছে টাকা নি কারবার কৈবুতে লেগ্যাছিল্যাম, আখুন মাহাজন বোলে কি, তুমার যত টাকার মাল দরকার নি যাও—পাঁচশো, হাজার, যত টাকার খুশি। মালের অভাব নাই, অভাব হলো গতরের জোরের।'

'এত ভারি ঢাকি তুমি সারাদিন মাথায় করে নি বেড়াও?'

'কি কৈবুবো বোল্। পাঁচ জনে পাঁচ রকম মাল চায়, সবই দু'ট্যা চারট্যা করে থুতে হয়।'

'বিক্রি-টিক্রি কেমন হছে?'

'তা মন্দ হয় না। এই ধর, আজ ই-বেলা বারো-চোদ্দ টাকার মতুন বিক্রি হলো। কম-সে-কম তিন-চার টাকা তো লাভ থাকবেই।'

সিতাব ভাবে, কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে ভৈরবের যেমন চাকরি গেছে, তেমনি ছকু মোড়লের কথামতো না চলার জন্যে শিবু সর্বস্বান্ত হয়েছে। ছকু মোড়ল তার সমস্ত জমিটুকু গ্রাস করে নিয়েছে। শিবুর একমাত্র অপরাধ, আদালতে দাঁড়িয়ে সে মিথ্যে বলেনি। এখন সে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। কিন্তু ক্ষেতমজুরির কাজ সে ঘৃণায় প্রত্যাখান করেছে। ক্ষেতের কাজ করতে গেলেই তার বুকের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে। তাছাড়া যে-কাজে দু'বেলা অন্নেরই সংস্থান হয় না, সে-কাজ সে করবে কেন? তাই সিতাবের কাছে এসে ধরনা দিয়েছিল সে, 'আমাকে কিছু টাকা দে সিতু। আমি কারকার কৈর্‌বো।' সিতাব সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিতে পারেনি, মাইনে পেয়ে পঁচিশ টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে শিবু কারবার শুরু করে। মাথায় ঝাঁকা নিয়ে মনিহারী জিনিস-পত্র বিক্রি করে বেড়ায়। সস্তা তেল, স্নো, পাউডার, আলতা, সিঁদুর, আয়না, চিরুণী, খেলনা —এমনি সব টুকিটাকি জিনিস, যা গাঁয়ের মেয়েরা হাতের কাছে পেলে কেনে, শখের জিনিস নিজে কেনা-কাটা করার আনন্দ উপভোগ করে। নিজের হাতে কেনা-কাটা করার আনন্দ একটা ভিন্ন স্বাদের, একটা আলাদা তৃপ্তি আছে তাতে। তাই শিবুর জিনিসপত্র বিক্রি হয়। মেয়েদের সাজগোজের জিনিস বেশি রাখে সে —মাথার ফিতে, রোল্ড-গোল্ডের তৈরি কানের দুল, নাকের ফুল, —এসবও রাখে এখন। পুঁজি তার সামান্য, সিতাব তাকে যে পঁচিশ টাকা দিয়েছিল, তাই দিয়েই শুরু করেছিল ব্যবসা। কয়েক দফা মাল কেনা-কাটা করতেই মহাজনের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছে, শিবুর সততার ব্যাপরেও কোনো সংশয় নেই, তাই এখন ধারেও মাল দেয়। এমন কি, শিবু এখন যা মাল চাইবে, তাই দিয়ে দেবে। কিন্তু ঝাঁকায় করে তো বেশি মাল বয়ে নিয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাই যেসব জিনিসের চাহিদা বেশি, সেই সব জিনিসই বেশি করে রাখে। মাঝে মাঝে কিছু দামী জিনিসও বিক্রি হয়। যেমন নাম-করা কোম্পানীর স্নো, তেল প্রভৃতি। ওসব জিনিসে লাভ কম, শিবু রাখে না। মেয়েরা অর্ডার দেয়, পরের বারে সেটা এনে দেয় শিবু। এর ফলে আশপাশের গাঁয়ের মেয়েদের কাছে সে বড় পরিচিত হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে সে যেন আপনজন। এক-একজন এক-একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে, কেউ বলে দাদা, কেউ বলে কাকা। আনন্দে বুকটা ভরে যায় শিবুর। কিন্তু তবু জমির সঙ্গে তার যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক, সে-কথা সে মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝে তার মন হু-হু করে ওঠে।

শিবু বলে, 'ধর, আখুন সারাদিন মুনিষ খেটে দু'টাকা আড়াই টাকা মজুরি। এতগুলিন ছেলেপিলে নি আমার ঘর-সংসার, ওই টাকায় কি হতো

বোল্। বরঞ্চ এতেই দু'পয়সা হছে, চলে যেছে কুনুরকমে। তবে সবদিন তো সমান হয় না।'

'তা কি হয়! কুনুদিন দু'পয়সা বেশি লাভ হবে, কুনুদিন দু'পয়সা কম। কারবারের তো নিয়মই তাই।'

'তাছাড়া ধর, মানুষের শরীর, রোগ-বালাই আছে। দু'দিন অসুখে পড়ে থাকলে কারবার বন্ধ। এই তো গেলো মাসে একটুকুন জ্বরের মতুন হলো, পাঁচ ছ'দিন বেরুতেই পারল্যাম না। সংসারের খরচ চালাতে পুঁজির টাকাই কিছু ভাঙতে হলো। হ্যাঁ সিতু, একটা কথা বুলি, তোর টাকা ক'টা আখুন দিতে পারব না বাপু। আর ক'টা দিন সবুর কর।'

'টাকার কথা তুমাকে বুলিনি। যখুন পারব্যা, দিও তুমি।'

'ভাবছি, বাড়িটা বিচে দিবো। রামপুরহাটে একটা দোকান-টোকান কৈর্বো।'

'বাড়ি বিচে দিলে ছেলেপিলে নি কুথা থাকব্যা শিবুকাকা?'

'সব দিবো না। বাস করার মতুন একটুকুন থুবো। উখ্যানেই থাকব কুনুরকমে। ব্যবসা ভালো চৈল্লে তখুন বাজারেই একটা ঘরটর ভাড়া লিবো।'

সিতাব কিছু বলতে পারে না। কি বলবে সে? ব্যবসা-পত্তর সে একদম বোঝে না। চাষার ছেলে, চাষ করাই ভালো। সে নিজে না হয় একটা চাকরি পেয়েছে। বাড়ি-ঘর বিক্রি করে ব্যবসা করতে গেলে হয়তো তার এ-কূল ও-কূল দু'কূলই যেত।

সিতাব চুপচাপ বসে থাকে। আঙুল দিয়ে লাল মাটির ওপর আঁকিবুকি কাটে। তারপর এক সময় বলে, 'কিন্তু শিবুকাকা, দোকান যদি না চলে, তাহলে?'

শিবু বসে বসে ভাবে।

সিতাব বলে, 'তার চেঞে, এক কাজ করো না শিবুকাকা, ভাগে জমিজমা নি ভালো করে চাষ করো। ফসলকুট্যা লাগাও।'

শিবু গলায় এক অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বলে ওঠে, 'না সিতু, উ-পথে আর যাবো না। লোকের গুলামী কৈর্বো না। কারবারে যখুন নেম্যাছি, ভালো করেই দেখব। সবই তো যেল্ছে, আর কি লোকসান হবে আমার?'

সিতাব ভাবে, শিবুর জমি ছিল, এক বিঘে দেড় বিঘে যাই হোক না কেন, তবু জমি ছিল। এখন তার জমি নেই। ক্ষেতমজুরির কাজও করে না। তাই সে এখন বেপরোয়া।

হঠাৎ শিবু বলল, 'হ সিতু, যে-কথা বুলবো বুলছিল্যাম তোকে, কথায় কথায় সেটাই ভুলে যেল্ছি। তুই আর বাড়ি যাস না ক্যানে রে?'

সিতাব বড় সঙ্কোচ বোধ করল। দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলো, 'না, যাই তো।'

'আমি বাপু সেদিন মাল বিচতে বেরুয়াছি, তোর বাড়ির কাছ দিঞে যেতেই দেখি, বৌমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। শুধাল্যাম, সিতু আছে? তা বুললে,

উ তো আর বাড়িই আসে না। না সিতু, ইটা ভালো হছে না কিন্তু। শাশুড়ী নাই, বৌমা ছেলে মানুষ, বাড়িতে একলা পড়ে থাকে, ইটা কিরকম কথা?'

'বাড়ি যাওয়ার সময় হয় না শিবুকাকা। ডিউটি আছে, কলেজ আছে। সময় পেলেই যাই।'

'বেচারী খুব মন-মরা হঞে আছে সিতু। আজ তো নতুন দেখছি না। অভাবের সংসার ছিল, তা-ও কত হাসি-খুশি থাকত। আর আধুন, তুই চাকরি-বাকরি কৈর‍্ছিস, বৌমার তো সুখের দিন! অথচ দেখে মনে হয়, না খেঞে দিন কাটাছে।'

'আমি তো মাহিন্যা পেলেই টাকা-পয়সা সব দিঞে আসি শিবুকাকা!'

'খালি টাকা-পয়সা দিলেই হলো? না সিতু, তুই চাকরি পড়াশুন্যা যা কৈর‍্বি কর, বাড়ি যাস। এক ঘণ্টার লেগে হৈক্ দু'ঘণ্টার লেগে হৈক্, রোজ একবার করে যাস কিন্তু।'

সিতাব আর কথা বলে না। চুপ করে বসে থাকে।

শিবু উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'এবার যাই সিতু। অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছি।'

শিবুর মাথায় ঝাঁকা তুলে দেয় সিতাব।

রোববার দুপুরবেলা গাঁয়ে এলো সিতাব। গাঁয়ের ভেতর পা দিয়েই সে ভাবল, ভৈরবদা যদি বাড়িতে থাকে, তাহলে দেখা করে যাবে। তাই ভৈরবদের বাড়ির দিকেই পা বাড়াল সে। ভৈরব বাড়িতেই ছিল। সিতাবকে দেখে খুব খুশি। বারান্দায় মাদুর পেতে বসল দু'জনে। বাসন্তী ও নির্মলা উনুনের কাছে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। এক ফাঁকে নির্মলা কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ঠাকুরপো যে এদিকে আর আসতেই চায় না! মনে মনে ভাবি, ভুলে গেলো না-কি!'

সিতাব বলল, 'না বৌদি, আসার সময় পাই না।'

কি একটা কাজে বাসন্তী ভাঁড়ার ঘরে এসেছিল। কথাটা কানে গেলো তার। বেরিয়ে এসে বলল, 'কি এমন কাজে ব্যস্ত থাকো সিতু ভাই, বাড়ি আসারও সময় পাও না!'

সিতাব আমতা আমতা করে বলল, 'ডিউটি আছে, কলেজ যেতে হয়।'

'তা হৈক্। তাই বুলে মানুষ বাড়ি আসার সময় পায় না? বৌ-টা ঘরে একলা থাকে, শুনশান ঘর—কি করে থাকে বোলো তো! সারা গাঁ-র লোক তুমার নামে ছি-ছি কোচ্ছে।'

সিতাব আর কথা বলে না, মাথা নিচু করে বসে থাকে। মনে মনে বড় রাগ হয়। ভাবে, নিশ্চয় ফুল্লরাই তার নামে যা তা রটিয়েছে সারা গাঁয়ে।

বাসন্তী উনুনের কাছে যাবার আগে বলল, 'বৌমার পয়েই তুমার উন্নতি সিতু ভাই, ভুলে যেও না।'

সিতাব কোনো মন্তব্য করল না। নির্মলা চেয়ে চেয়ে দেখছিল সিতাবকে। বড় সঙ্কোচ বোধ করছিল। সে শহরের মেয়ে, শহরের আবহাওয়ায় মানুষ। অপরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে টুক করে মাথা গলানোটা তার ভদ্রতায় বাধে। বাসন্তী চলে গেলে সে বলল, 'ঠাকুরপো এতদিন পর এলো, কি খেতে দিই বলো তো!'

সিতাব বলল, 'না না বৌদি, আমি কিছু খাবো না।'

'তা বললে হয়!'

ভৈরব বলল, 'আচ্ছা, একটু চা দাও আমাদের।'

নির্মলা চা তৈরি করতে গেলো। ভৈরব মাদুরের ওপর শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলো একটু। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, কি খবর বল।'

সিতাব বলল, 'খবর আর কি! ভাবলাম, একটু দেখা করে যাই। আজ রামপুরহাট যাবে না?'

'না, আজ ছুটি। রোববারে পড়াইনে। বিকেলবেলা একটু আয়াশ যেতে হবে, বশীরের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। হ্যাঁ সিতু, সেই বইটা পড়েছিস?'

'না। পুরোটা পড়া হলো কৈ! ওই বই নিয়ে যা কাণ্ড!'

'কি কাণ্ড?'

সিতাব সমস্ত ঘটনা বলল। ভৈরব বেশ ক্ষুব্ধ, সোজা হয়ে উঠে বসল সে। জিজ্ঞেস করল, 'স্টেশন মাস্টার কে রে?'

'শঙ্করবাবু।'

'ওইভাবে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে?'

'হ্যাঁ, রেগে টং একেবারে।'

'হুঁ, বুঝেছি। এক নম্বরের চামচা।'

সিতাব 'চামচা' কথাটার মানে বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'ভৈরবদা, ও বই পড়া নিষেধ? পড়লে চাকরি যায়?'

ভৈরব তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'হ্যাঃ, ওদের কাছে সবই নিষেধ!'

'বইটা রজতবাবু রেখে দিয়েছে। চেয়ে নেবো একদিন।'

'নিবি নে কেন? চেয়ে নিস। পড়িস ভালো করে।'

এক সময় নির্মলা এসে চা দিয়ে গেলো দু'জনকে। চা খেতে খেতে ভৈরব অনেক আলোচনা করল সিতাবের সঙ্গে। কৃষক-ক্ষেতমজুরদের নিয়ে তার সংগঠন গড়ে তোলার কথাও বলল। এখানকার পার্টি-সংগঠন খুব মজবুত নয়, বশীর একা পেরে ওঠে না, ভৈরব আসাতে তার সুবিধে হয়েছে। এখন দু'জনে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজ করার জন্যে দু'একটা উৎসাহী ছেলেও জুটেছে। কাজ করছে তারা। কিছুদিন হলো গাঁয়ে একটা নাইট স্কুল খুলেছে ভৈরব, অনেকে পড়ে। দু'জন শিক্ষক —দেবু আর ভৈরব। কিন্তু ভৈরবের পক্ষে পুরোপুরি সময়

দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রামপুরহাটে টিউশনি সেরে ফিরতে একটু রাত হয়। যতটুকু পারে, সময় দেয় সে। ভৈরব বলল, 'তোকে পেলে খুব ভালো হতো রে। কিন্তু তোর যে আবার নাইট কলেজ! তবু ছুটি-ছাটার দিনে আসতে পারিস সিতু, এসে এক-আধটু সাহায্য করতে পারিস।'

সিতাব উঠে আসার সময় ভৈরব এলো তার সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ ভৈরব বলল, 'হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। রাধার হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে। সুঁধিপুরে। আমাদেরই পার্টির ছেলে। মোটামুটি ভালোই। তুই কিছু চাঁদা দে সিতু। যা পারিস।'

সিতাব জিজ্ঞেস করল, 'কি করে ছেলেটা?'

'কি আর করবে, নেই কিছুই, রামপুরহাটে বিড়ি বাঁধে।'

'ওরা কিছু দেবে না?'

'দেবে কি, আজকাল তো সবাই উলটে চায়। বামুন-কায়েতের রোগ ঢুকে পড়েছে এখন সবার মধ্যে। তা ছেলেটা ভালো, আমরা বলা-কওয়াতে কিছু দিতে রাজি হয়েছে। শো-খানেক টাকা। কিন্তু ওতে তো হয় না। এদিকে এদেরও কিছু খরচ করার সামর্থ্য নেই। খাবারই জোটে না। তুই তো সব জানিস। কি করা যায়! আমরাই, মানে গাঁয়ের পাঁচজনে মিলে বিয়েটা দিয়ে দিচ্ছি। সবাইকে ধরেছি। যে যা পারে।'

'আমাকে কত ধরেছ?'

'ধরিনি কিছুই! যা পারিস, দে না।'

সিতাব পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে দেয়। ভৈরব খুশি হয়। টাকাটা হাতে নিয়ে বলে, 'যথেষ্ট যথেষ্ট। এমনি করে লোকের কাছে পেলেই কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে।'

সিতাবের ভালো লাগল। পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে মনটা খুশি হলো তার।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তার মন আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। মা-র কথা মনে পড়ল। যে মা শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সেই মা এখন তার সারা মন জুড়ে। বিশেষ করে বাড়ি এলেই বড় বেশি করে মনে পড়ে। খোলা দরজার কাছে একটু দাঁড়াল সিতাব, তারপর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

সিতাব ভেবেছিল, ফুল্লরা এখন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেখল, মাটি দিয়ে নিকোনো উনুন, বেশ বোঝা যাচ্ছে, তাতে হাঁড়ি চড়েনি। দাওয়ায় একটা মাদুরে ফুল্লরা শুয়ে আছে আঁচলে মুখ ঢেকে।

শিবুর কথা মনে পড়ল সিতাবের, মনে পড়ল বাসন্তীর কথাও। মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। দাওয়ায় এসে জিজ্ঞেস করল, 'এই আবেলা শুয়ে আছিস। ভাত চড়াসনি?'

ফুল্লরা ঘুমোয়নি। মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে সিতাবের দিকে একবার তাকাল শুধু। কোনো জবাব দিলো না, চুপচাপ শুয়ে রইল।

সিতাব ফের বলল, 'রা কাড়িস না যে! ভাত চড়াসনি ক্যানে?'

ফুল্লরা বলল, 'তুমার উ খোঁজে দরকার কি! কার লেগে ভাত রেঁধে থুবো?'

'দিন দিন না খেঞে পাটকাঠি হছিস—'

'তা তুমার দেখার দরকার নাই।'

'হুঁ, দরকার নাই! সারা গাঁয়ে আমার নামে তো খুব রটাছিস।'

ফুল্লরা সটান উঠে বসল, ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফোঁস করে উঠল, 'কি রটাল্ছি তুমার নামে?'

'কি রটাল্ছি, উ-কথা তুই জানিস। খেতে পাস না, শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠি হছিস—'

'মিছা কথা বুলিও না।'

'মিছা কথা! দুনিয়ার লোক জানলে কি করে?'

'মাথার ওপর ঠাকুর আছে, আমি যদি উ-কথা বুলে থাকি, আমার মাথায় বাজ পৈড়্বে, জিভ খসে যাবে আমার।'

'লে লে, আর অত ঠাকুর দেখাতে হবে না। তোকে চিনতে আমার বাকি নাই।'

দু'চোখ রক্তাক্ত হয়ে উঠল ফুল্লরার। তারপর চোখ ছাপিয়ে জল বেরিয়ে এলো। স্থির অকম্প চোখে সিতাবের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'আমি আর এখ্যানে থাকব না। আমাকে বাপের বাড়িতে থুঞে এসো। এখ্যানে আমি তুমার শুশান আগলাতে পারব না।'

'যা ক্যানে, বাপের বাড়ি যা। তোর বাপের সাত মহলা দালান আছে, সুখে থাকবি।'

'সুখ আমার দরকার নাই। খুব সুখ পেয়্যাছি। আমি আর এখ্যানে একদিন থাকব না। তুমার ঘর কৈর্‌তে পারব না আমি। যদি আমাকে না পাঠিয়ে দাও, গলায় দড়ি দিবো।'

'তা দে ক্যানে, গলায় দড়ি দে। দিবো একগাছা দড়ি? লিবি? হুঁঃ, আমাকে দেমাক দেখাছে! সিতাব তোর কিন্যা গুলাম লয়। যা, যেথ্যানে তোর ভালো লাগে, যা।'

সিতাব আর দাঁড়াল না। হনহন করে দাওয়া থেকে নেমে গেলো। চমকে উঠল ফুল্লরা। নিজের ভুল বুঝতে পারল মুহূর্তে। আকুলি-বিকুলি করে সিতাবের পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত ছুটে গেলো সে, 'ওগো, কথা শুনো, যেও না। তুমার পায়ে পড়ি, যেও না।'

কিন্তু সিতব ফুল্লরার আর্তনাদে কর্ণপাত করল না, একবারও পেছন ফিরে তাকাল না সে।

চার

না, জীবনে আর ফুল্লরার মুখ দেখবে না সিতাব। মনে করবে, জীবনে ফুল্লরাকে কখনও দেখেনি, ফুল্লরার নাম শোনেনি কখনও। সাদিনপুর গাঁয়ে আর পা দিতেই ইচ্ছে করে না তার। কি আছে সেখানে? মা ছিল, মা নেই। এখন আছে শুধু একখানা কুঁড়েঘর, আর আছে ফুল্লরা। নরক আর নরকের কীট। ওই নরকে দিনযাপন করার জন্যেই কি তার এত পরিশ্রম, এত কৃচ্ছ্র সাধনা। কতদিন পড়তে পড়তে চোখ দু'টো ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, উঠে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এসে আবার পড়তে বসেছে। কতদিন শিউপ্রসাদ বলেছে, 'তোর দিমাগ খারাপ হয়ে যাবে, সিতু।' সিতাব ভ্রূক্ষেপ করেনি। তখন তার চোখের সামনে শুধু একটিই লক্ষ্য—সুখৈশ্বর্য, ঝলমলে জীবন। তা এতসব ভেবেই কি সিতাব চাকরির জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, পড়াশোনা শুরু করেছিল? না, তখন তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, দিনমজুরির অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি, উপোসে থাকার কষ্ট থেকে অব্যাহতি। কিন্তু তারপর? ক্রমে ক্রমে উচ্চাশা সীমাহীন হয়ে উঠেছে তার —সাজানো-গোছানো একটি কোয়ার্টার, সামনে একটুখানি ফুলের বাগান —সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর একটি সংসার। সেই পরিবেশে ফুল্লরাকে কল্পনাই করতে পারে না সে। ভৈরবকে সে শ্রদ্ধা করে, ভৈরবের দেওয়া বই পড়ে অন্য এক জীবনের কথা উপলব্ধিও করে, সুস্থ জীবন-যাপনের অধিকারের জন্যে যে সংগ্রাম, তারও মূল্য হয়তো কিছুটা বোঝে, কিন্তু তবুও সে নিজে ভৈরব হতে চায় না। সে ওপরে উঠতে চায়, আরও ওপরে, ছকু মোড়ল সাম মোড়লকে ছাড়িয়ে, যে-জীবনের কথা ওরা কল্পনাই করতে পারে না।

যেদিন সেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছবে সিতাব, সেদিন ওরা চোখ কপালে তুলে ভাববে, কি থেকে কি হয়! শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হওয়ার বিস্ময়কর কাহিনী তো ওরা শোনেইনি।

বুধি বলেছিল, 'সিতুদা, আমাদের কোয়ার্টারে তোমার সেই প্রথম মাছ নিয়ে আসার কথা মনে পড়ে?'

সিতাব হেসে বলেছিল, 'পৈড়্‌বে না ক্যানে?'

'তখন তুমি কিরকম চাষাভুষোর মতো ছিলে, তাই না?'

'আর আখুন?'

'এখন বাবু। তোমার হবে সিতুদা।'

কিন্তু তার সবকিছুই তো বুধিকে কেন্দ্র করে। বুধিই কি তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্ফুলিঙ্গ জ্বালায়নি? বুধিই তো তাকে সেই স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে সে এক অনাস্বাদিত ভালোবাসার প্রথম স্পর্শ অনুভব করেছে।

সিতাব তার গতানুগতিক ডিউটি করে। কখনো কলেজ যায়, কখনো

যায় না। পড়াশোনা একদম বন্ধ। খাওয়া-দাওয়ার দিকেও লক্ষ্য নেই। শিউপ্রসাদের ডাল-রুটি প্রায়ই বেঁচে যায়। তাই নিয়ে গজগজ করে সে।

ঠিক এমন সময় সিতাবের বদলির অর্ডার হলো। সাদিনপুর থেকে বাতাসপুরে বদলি করা হয়েছে তাকে। শীগ্গীর জয়েন করতে হবে। সিতাব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। বদলির জন্যে নয়, এখন তাকে ভূ-ভারতে যেখানেই পাঠানো হোক, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই তার। সব জায়গাই সমান তার কাছে। কিন্তু বদলি যখন হলোই, তখন শ্রীরামপুরে হলে ক্ষতি কি ছিল ? কিংবা শ্রীরামপুরের কাছাকাছি ? আজ তার এই দুঃখ-যন্ত্রণায় অন্তত বুধির স্নেহ-শীতল সাহচর্য লাভ করতে পারত।

দিন দু'য়েক পরে সে বাতাসপুরে গিয়ে জয়েন করল। ঝামেলা কিছু নেই, একটি টিনের তোরঙ্গ, তাতে কাপড়-চোপড আর কয়েকখানা বই। বিছানাপত্র বলতে একটা কম্বল আর বালিশ। সুতরাং নির্ঝঞ্ঝাট হাত-পা নিয়ে চলে গেলো সে। যাওয়ার আগে রজতবাবুর কাছ থেকে বইখানা চেয়ে নিয়েছিল। রজতবাবু বলেছিলেন, 'তোর পড়াশোনার ক্ষতি হবে সিতু। তুই দরখাস্ত কর। আমি লিখে দিচ্ছি।'

কিন্তু সিতাব রাজি হয়নি। সে আর এখানে থাকতে চায় না, দূরে চলে যেতে চায়, অনেক দূরে। তাই সে অর্ডার পাওয়ার দু'দিন পরেই চলে গেলো। সেদিন শিউপ্রসাদ হারুন তাকে খুব খাতির করে খাওয়ালো। হারুন তার সঙ্গে রামপুরহাট পর্যন্ত এলো একই গাড়িতে। মনের ভেতর একটা তীব্র বেদনা বোধ করছিল সিতাব। বুধি তারকেশ্বরীর স্মৃতি জড়িয়ে ছিল যে জায়গাটা, সেটা ছেড়ে যেতে বড কষ্ট হচ্ছিল। রামপুরহাট স্টেশনে যখন গাড়ি ছাড়ল, হারুন তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাল, তখন আর অশ্রুবেগ সংবরণ করতে পারল না সিতাব। চোখের পাতা জলে ভারি হয়ে উঠল, জানালার বাইরে মুখ বাড়াল সে।

কিন্তু বাতাসপুরে এসেও কি সিতাব শান্তি পেলো এতটুকু ! সাদিনপুরের মতোই ছোট স্টেশন, কাজের চাপ বিশেষ নেই। অখণ্ড অবকাশ। কলেজ যাওয়ারও বালাই নেই। নতুন জায়গা, কলেজ যাওয়ার জন্যে ডিউটির বিশেষ বন্দোবস্ত করে নিতে সময় লাগবে। কিন্তু এই নির্জন বিদেশ-বিভুঁইয়ে তার যন্ত্রণাময় দিন-রাত্রি কাটবে কি করে ?

বাতাসপুরের কেবিনম্যান জাবেদ আলি আর যুগল। জাবেদ আলির সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হলো সিতাবের। কাছাকাছি একটি গ্রামে বাড়ি। সেখান থেকে যাওয়া-আসা করে। সে-ই তার একার সংসারটিকে গুছিয়ে দিলো। দরকারী জিনিসপত্র যোগাড় করে দিলো। সিতাবকে এখন রান্না করে খেতে হয়।

জাবেদ আলি লোকটি ভালো। গ্রাম থেকে এটা-ওটা এনে দেয় সিতাবকে। নিজের ক্ষেতের তরি-তরকারি এনে দেয়। দাম নিতে চায় না। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। বছর পাঁচেক আগে স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেমেয়ে আছে। বড়

ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ এনেছে ঘরে। বেশ খানিকটা জমি আছে। এদিকে চাকরি, মাস গেলেই কাঁচা পয়সা হাতে আসে। সুখের সংসার। তবু শান্তি নেই। আবার বিয়ে করবে কি-না, এই নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে টানা-পোড়েন চলছে মনের মধ্যে। সিতাবের কাছে সে তার সুখ-দুঃখের গল্প করে।

যুগল খুব শৌখিন ছোকরা। যেমন চটপটে, তেমনি মেজাজ। জাবেদ আলির সঙ্গে আদৌ বনিবনা হয় না। ডিউটি নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হয় দু'জনের। রামপুরহাট থেকে যাতায়াত করে। রামপুরহাটের রেল-কলোনীতে বাড়ি। ওদের গুষ্টিসুদ্ধ সবাই রেলে কাজ করে। তাই ভীষণ বেপরোয়া। খুব সিনেমা দেখে। মুখে সিনেমার গল্প লেগেই আছে। ওর সঙ্গে কথা বলে সুখ পায় না সিতাব। তবু অবসর সময়ে ওরই সঙ্গে বসে এক-আধটু আড্ডা দেয়। যুগল বিড়ি খায় না, সিগারেট খায়। নাম্বার টেন সিগারেট। সিনেমার গল্প করতে করতে মাঝে মাঝে সিতাবকেও সিগারেট খাওয়ায়।

আর আছে খুবলাল। বাতাসপুরের আর একজন খালাসী। বয়স হয়েছে। দু'চার বছরের মধ্যে রিটায়ার করবে। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে আরও বেশি বৃদ্ধ বলে মনে হয়। কালো কুচকুচে চেহারা। মাথা জোড়া টাক। চারপাশে কিছু কিছু চুল অবশিষ্ট আছে, ধবধবে সাদা। চোখে পুরু কাঁচের নিকেলের চশমা। তাকে দেখে যন্ত্রচালিত মানুষ বলে মনে হয় সিতাবের। মুখে কথা নেই। স্টেশনে কুঁজোয় জল দেওয়া, ঘর ঝাড়-পোঁছ করা, সবই করে। কিন্তু মুখ থেকে কদাচিৎ কথা শোনা যায়। স্টেশন মাস্টার যোগেশবাবুর ধারণা, খুবলাল কানেও কম শোনে। তাই তিনি বেশির ভাগই কথা বলেন ইশারা-ইঙ্গিতে। টিকিটের কিংবা ট্রেন আসার ঘণ্টা দেওয়া, টোকন ধরা, চা কিংবা সিগারেট আনতে বলা, সবই তিনি হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেন। খুবলালের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না। তক্ষুনি সে উঠে গিয়ে আদেশ পালন করে।

খুবলাল সপরিবারে থাকে। থাকার জন্যে সিতাব যে-কোয়ার্টারে ঘর নিয়েছে, সেই কোয়ার্টারেরই আর একদিকে খুবলালের পরিবার। পরিবার বলতে চারজন। মেয়ে, ছেলে, আর ওরা স্বামী-স্ত্রী। মেয়েটির নাম চুমকি। বয়স একুশ-বাইশ। দেশে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু স্বামীর ঘর করেনি বেশি দিন। বিয়ের পর এক বছর কাটতে না-কাটতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল, তারপর এই চার বছর ধরে এখানেই রয়েছে। খুবলালের মেয়ে বলে তাকে মনেই হয় না। গায়ের রঙ বাদামী, তীক্ষ্ণ মুখ-চোখের গড়ন। সারা দেহে উদ্ধত যৌবন। চাল-চলনে কেমন যেন বেপরোয়া। সিতাব যেদিন প্রথম এলো, জাবেদ আলি তার ঘর গুছিয়ে দিচ্ছিল একটু, মেয়েটি অসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সিতাবকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'নতুন খালাসীবাবু না-কি গো?' তারপর চুমকি কতবার সময়ে-অসময়ে তার ঘরে এসেছে, রান্নার সময় সিতাবের

আনাজপত্র কুটে দেওয়ার জন্যে বসে পড়েছে। কখনো-কখনো বলে, 'তা বহুটাকে (বউটাকে) আনলেই পারো। এত তকলিফ করে রেঁধে খেতে হয় না।' সিতাবের মনে সঙ্কোচ থাকে, ভয়ও হয়।

ছেলেটির নাম নেমুয়া, বারো-তেরো বছর বয়স। বাপের মতোই তার গায়ের রঙ। এ-ছাড়া খুবলালের আরও দু'টি ছেলে আছে, তারা বড়, দেশে থাকে। জমিজেরাত দেখাশোনা করে। এখানে চাকরি করে দেশে জমি কিনেছে খুবলাল। বেশ কিছু জমিজমার মালিক সে। বড় ছেলেরা কালে-ভদ্রে এখানে আসে। দোলে-দেওয়ালিতে খুবলাল সপরিবারে দেশে যায়।

সিতাব এখানে এসে খুবলালের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল। ডিউটির একটু সুযোগ-সুবিধে করে নিতে হলে তার সহযোগিতা দরকার। কিন্তু সে যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। লোকটার মধ্যে কোনো পদার্থ আছে কি-না, তাই সন্দেহ। কি করে সংসার চালায়, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। অথচ বিষয়-বুদ্ধি কম নয়। এই অল্প মাইনের চাকরি করেও সংসার চালিয়ে দেশে জমিজমা করে নিয়েছে তো। ভবিষ্যতের নিরাপত্তাটুকু গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সে-কৃতিত্ব খুবলালের নয়। জাবেদ আলি সব জানে। আসল কৃতিত্ব খুবলালের স্ত্রীর। জাহাবাজ মেয়ে। চাকরি করে খুবলাল, কড়ি গোনে তার স্ত্রী রামতুলসী। সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব রামতুলসীর হাতে।

তা জাবেদ আলির কথায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই। দেখছে তো সিতাব নিজের চোখে। খুবলালকে দেখলে সত্তর বছরের বুড়ো বলে মনে হয়, কিন্তু রামতুলসী এখনো বেশ শক্ত-সমর্থ। চেহারায় চটক আছে। মুখ থেকে বাক্যবাণ ছুটছে দিনরাত। কখনো খুবলালকে উদ্দেশ করে, কখনো-বা নেমুয়া-চুমকিকে উদ্দেশ করে। অশ্লীল গালাগালিও তার জিভে আটকায় না। নিজের ঘরে বসে বসে সিতাব সব শোনে। ছেলে-বাপ দু'জনেই রামতুলসীর ভয়ে তটস্থ, হাজারটা কথা শোনার পর হয়তো একটা জবাব দেয়, তা-ও সম্পূর্ণ উচ্চারণ করার ক্ষমতা থাকে না। চুমকি এর উলটো। মায়ের মতো সে-ও কম মুখরা নয়। এখানেই খুব সুবিধে করতে পারে না রামতুলসী। দেশোয়ালী ভাষায় মা-মেয়ের মধ্যে তরজা লড়াই শুরু হয়ে যায় যখন-তখন। সিতাব অধিকাংশ কথাই বুঝতে পারে না।

অথচ অন্য সময় ওরা পরিষ্কার বাংলা বলে। নেমুয়া কিংবা চুমকি যখন সিতাবের সঙ্গে কথা বলে, তখন ভাবাই যায় না যে ওরা বিহারী। কথাবার্তার মধ্যে এক-আধটা হিন্দী শব্দ হয়তো থাকে, যেমন বউকে 'বহু' বলে, স্বামীকে 'মরদ'। তা কথার মধ্যে ওরকম দু'চারটে শব্দ তো গাঁ-ঘরের লোকেও বলে থাকে। সাদিনপুরের আশপাশের মুসলমান গ্রামগুলির কথাবার্তায় ওরকম শব্দ আকছার ব্যবহার হয়। সিতাব তা শুনতে অভ্যস্ত। তাই নেমুয়া-চুমকির কথাবার্তা সিতাবের কানে অস্বাভাবিক ঠেকে না।

এখন এদের নিয়েই সিতাবের জগত। নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যাদের

সঙ্গে, তাদের সকলের কাছ থেকেই এখন সে বিচ্ছিন্ন। নতুন লোকজনের সঙ্গে আবার নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এক জাবেদ আলি ছাড়া আর কারোর সঙ্গেই এ-যাবৎ তার অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেনি। স্টেশন মাস্টার, টিকিটবাবু এখানে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন, সাদিনপুরের ভবতোষবাবু, রজতবাবু বা শঙ্করবাবুর মতো নন এঁরা, শামুকের মতো একটা শক্ত খোলসের মধ্যে যেন সব সময় নিজেদের গুটিয়ে রাখেন।

লোকালয় থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বাতাসপুরের এই কয়টি মানুষ যেন পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের রেশটুকু এখানেও ধরে রেখেছে পালাক্রমে। যাত্রী-সংখ্যা খুবই নগণ্য। সন্ধ্যে হতে না-হতেই চারদিক গভীর অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ল্যাম্প-পোস্টগুলোতে কেরোসিনের বাতি জ্বলে না সব দিন। স্টেশনে টিমটিম করে ল্যাম্প জ্বলে। একটু দূরে খুবলালের বাড়ির দরজা-জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসা ক্ষীণ আলোর ছটা চারদিকের জমাট অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করে তোলে। আর তখন সিতাব যদি ডিউটিতে থাকে, স্টেশনে, মাঝে মাঝে রামতুলসীর খনখনে গলার আওয়াজ শোনা যায়, মনে হয়, নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে অন্ধকারের কঠিন শিলায় এক-একখানি কাঁসার থালা আছড়ে পড়ে সশব্দে ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। আর তাতে, কি জানি কেন, সিতাবের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, বিষণ্ণতায় হতাশায় হাহাকার করে ওঠে সারা মন। মাঝে মাঝে মনে হয়, সম্মুখের ওই লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে ঝমঝম করে তীব্রবেগে ছুটে যাওয়া ধাতব দানবের চাকার তলায় ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে সে, আবার কখনো বা প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে —যদি তার ক্ষমতা থাকত, তাহলে সমগ্র বিশ্বটাকে যেন নিমেষে মাটির পাত্রের মতো এক আছাড় ভেঙে চুরমার করে দিত।

পাঁচ

কিছু ভালো লাগে না সিতাবের। বইগুলো কখনো নাড়াচাড়া করে, পড়তে ইচ্ছে করে না। কি হবে পড়ে? এবার তো আর পরীক্ষায় বসতে পারছে না সে। এখানে আসা প্রায় দু'মাস হয়ে গেলো, একদিনও কলেজ যাওয়া হয়নি। এখন আর চেষ্টাচরিত্র করেও লাভ নেই। পড়াশোনা আর চালানো যাবে কি-না, তাই সন্দেহ। কারণ ডিউটির ব্যাপারে খুবলালের সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না সিতাব। সাদিনপুরে শঙ্করবাবু ভবতোষবাবু রজতবাবু সকলেই সিতাবের পড়াশোনার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন, ডিউটির সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে স্টেশন মাস্টার টিকিটবাবুরা একেবারেই নিস্পৃহ, তাঁরা সহানুভূতিশীল হলে সিতাবের পড়াশোনার অসুবিধে হতো না।

একদিকে যেমন পড়াশোনা নেই, তেমনি বাতাসপুরে কজকর্মও নেই সেরকম। বলতে গেলে সারাদিন বসে বসে ঝিমোনো। তা-সত্ত্বেও এখানে এমন কিছু কিছু কাজ তাকে করতে হয়, যাতে সিতাব অভ্যস্ত নয়। সাদিনপুরে সবাই তাকে আলাদা চোখে দেখত, সেখানে যথেষ্ট মান-সম্মান ছিল তার। কখনো কখনো ফাই-ফরমাশ যে খাটতে হতো না, তা নয়, কিন্তু তা বাড়ির লোকজনের মতো, কাজ করার মধ্যে কোনো গ্লানি ছিল না। তারকেশ্বরী কিংবা ভবতোষাবাবুই তো কতদিন তাকে হাট-বাজার করতে রামপুরহাট পাঠিয়েছেন, কিন্তু তেমনি আবার বাড়ির ছেলের মতো কাছে বসিয়ে আদর করে খাওয়াতেন। অথচ এখানে বাবুরা তাকে বাড়ির চাকর-বাকর ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। কুঁজোয় জল ভরতে হয়, টেবিল-চেয়ার ঝাড়-পোঁছ করতে হয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় দোকান থেকে চা এনে দিতে হয়, পান-সিগারেট এনে দিতে হয়। অর্থাৎ সিতাব এখানে শুধু রেলের খালাসী নয়, স্টেশনের বাবুদের ভৃত্য।

সিতাবের আত্মসম্মানে বড় লাগে, সারা মন গ্লানিতে ভরে যায়। বুধি বলেছিল, 'তুমি এখন বাবু।' এই কি বুধির সেই বাবু? হায় রে, যে চাকরির জন্যে সিতাবের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ত না, সেই চাকরিই এখন তার কাছে অপমানের বোঝা! এটাই কি ভৈরবের দেওয়া সেই লাল মলাট বইখানার চরম সত্যবাণী: '…মজুরেরা কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস, পরিদর্শকের দাস, সর্বোপরি খাস বুর্জোয়া মালিকটির দাস।…'

এখানকার স্টেশনের বাবুরা কি সেই পরিদর্শক, না খাস বুর্জোয়া মালিক?

তা সিতাব আর খুবলাল খালাসী বলেই শুধু স্টেশনের বাবুদের চোখে দাস নয়, জাবেদ আলি যুগলকেও একই চোখে দেখেন তাঁরা। কেবল যুগলকেই পেরে ওঠেন না, অনেক সময় মুখে মুখে জবাব দেয়। বাবুরা চোখ রাঙান, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারেন না। এক-আধ সময় সিতাবেরও রাগ হয়, হয়তো আগেকার সেই সিতাব হলে সে-ও প্রতিবাদে গর্জে উঠত, বিক্ষোভে ফেটে পড়ত, কিন্তু এখন সে যেন দিনদিন কিরকম নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে না। সমস্ত অপমান নীরবে হজম করে।

এই তো সেদিন রাত্রে কেবিনে বসে বসে জাবেদ আলির সঙ্গে গল্প করছিল সিতাব। রাত্রে বিশেষ কাজ থাকে না। গাড়ি খুব কম। স্টেশন মাস্টার টিকিটবাবু দু'জনে পালা করে ঘুমিয়ে নেন। দু'টো টেবিল পাশাপাশি জুড়ে রাখা হয়েছে, তার ওপর বিছানা পেতে ঘুমিয়ে নেন একজন, তিনি উঠলে অন্যজন ঘুমোতে চলে যান। বিছানা পেতে দিতে হয় সিতাবকে কিংবা খুবলালকে, যখন যার ডিউটি থাকে। আবার সকালে বিছানা গুটিয়ে দেওয়াও তাদের কাজ। রোজকার মতো সেদিনও সিতাব যথারীতি বিছানা পেতে দিয়ে এসেছিল, তারপর

কেবিনে বসে বসে গল্প করছিল যুগলের সঙ্গে, টিকিটবাবু সনাতন দাস বারান্দায় বেরিয়ে এসে ক্ষুব্ধকণ্ঠে হাঁকলেন, 'সিতাব !'

কেবিন থেকে সিতাব সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলো। সনাতনবাবু রাগে ফুঁসছেন। বললেন, 'তোমার ডিউটি কেবিনে নয়, এখানে এই বেঞ্চে বসে থাকবে। দশবার ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। তোমাকে ডাকার জন্যে আর একজন লোক রাখতে হবে ?'

সিতাব কোনো জবাব দিলো না। রাগে-অপমানে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে সনাতনবাবু বললেন, 'যাও, দোকানটা খোলা আছে কি-না দেখো। এক প্যাকেট সিগারেট আর চা এনে দাও।'

সিতাব কোনো প্রতিবাদ করেনি, নীরবে হুকুম তামিল করেছিল। চা সিগারেট এনে দিলে চায়ে চুমুক দিয়ে সনাতনবাবু বললেন, 'কিছু না হোক চার পাঁচবার ডেকেছি, কোনো সাড়া নেই। কাজ না থাকলে গল্প-গুজব করবে ঠিকই, কিন্তু এদিকেও তো একটু নজর রাখতে হবে। যাও, এখন আর দরকার হবে না। দরকার হলে ডেকে নেবো।'

সিতাব বুঝতে পারে, সনাতনবাবুর কথাগুলি তাঁর নিজের দুর্ব্যবহারের অনুশোচনা ছাড়া কিছু নয়। এ রকম কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত সিতাব। ছকু মোড়ল সাম মোড়লের কথা মনে পড়ে তার। আঘাত করার পর মধুর কণ্ঠস্বরে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়াটা তাদের চিরকালের অভ্যেস। এ যেন কাজের সময় গরুর পিঠে পাচনের বাড়ি মারা, আর তারপর কাজ উদ্ধার হলে পিঠে হাত বুলিয়ে ঘাস-বিচালি খাওয়ানো। হাজার হলেও একদিনেই তো আর দরকার ফুরিয়ে যাচ্ছে না !

বাতাসপুরে এসে এই রকম এক গ্লানিময় জীবন মেনে নিতে হলো সিতাবকে। এ রকম জীবনের কথা সে ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। এতটুকু স্নেহ-শীতল স্পর্শ নেই কোথাও। এতটুকু ছায়া নেই, মেঘ নেই। শুধু ধূ-ধূ রুক্ষ প্রান্তর।

অথচ এরই মাঝে নেনুয়া আছে, চুমকি আছে। একটা পাঁচিলের ওপাশে ওরা থাকে। নেনুয়া মাঝে মাঝে এসে সিতাবের কাছে বসে থাকে। সিতাব তার কাছে তাদের দেশের গল্প শোনে। মাঝে মাঝে চুমকি এসে খোঁজ নেয়, 'আজ কি রান্না হলো গো নতুনবাবু ?'

সিতাব আপ্যায়ন জানায়, 'আয় চুমকি। বস।'

চুমকি দাওয়ার একপাশে বসে পড়ে। সিতাবের বাড়ির খোঁজ-খবর নেয়। দেশ-ঘরের কথা বলে। তাছাড়া সংসারে যখন যা হয়, এসে সব কথা খুলে বলে সিতাবকে। মা-র নামে তার প্রচুর অভিযোগ।

সেদিন চুমকি কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঘর যাও না কেন নতুনবাবু ?'

সিতাব দায়সারা গোছের জবাব দিলো, 'যেতে ইচ্ছে করে না।'

'ঘরে বহু আছে, একলা থাকে, ঘর যেতে ইচ্ছে করবে না কেন? মনপসন্দ্ নয়?' কেমন তেরছা চোখে তাকায় চুমকি।

সিতাব ধমকের সুরে জবাব দেয়, 'তোর অত খোঁজে দরকার কি?'

'কেন, খোঁজ নেবো না কেন? কতদিন হলো এসেছ, একবারও তো ঘর যাওনি! খোঁজ নিলে দোষ হলো? হুঁ-হুঁ, আমি ঠিক বুঝেছি।' মাথা নেড়ে নেড়ে জবাব দেয় চুমকি।

সিতাব জিজ্ঞেস করে, 'কি বুঝেছিস?'

'কি আবার! বহু মনপসন্দ্ নয়।'

'ছাই বুঝেছিস!'

খিলখিল করে হেসে ওঠে চুমকি। হাসির সঙ্গে সারা দেহে তরঙ্গ ওঠে। বলে, 'হুঁ-হুঁ, ধরা পড়ে গেছো নতুনবাবু। তা বহু মনপসন্দ্ নয় তো আর একটা বহু আনো। মনের মতন।'

চুমকি দু'হাত তুলে মাথার এলো খোঁপা ঠিক করে। আর ঠিক তখন তার গুরুভার সুডৌল বুকের অফুরন্ত সৌন্দর্য সিতাবের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সিতাব। বুধিকে মনে পড়ে। কি জানি কেন, এই মেয়েটিকে দেখলেই বুধির কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে তার। প্রাণ আনচান করে ওঠে।

মুচকি মুচকি হাসতে থাকে চুমকি। বলে, 'কি গো নতুনবাবু, কথাটা মনে ধরল?' মাথার চুলে একটা পাক দিয়ে গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করে নেয় চুমকি। সিতাব বলে, 'দেখি, তাই করতে হবে হয়তো।'

কোনোদিন চুমকি কথা বলতে বলতে ডান পায়ের শাড়ি একটু ওপরে তোলে। সুঠাম পায়ের গোছা অনাবৃত হয়। গোড়ালির একটু ওপরে হাত দিয়ে চুলকোতে থাকে সে। আর ঠিক তখন ফুল্লরার কথা মনে পড়ে সিতাবের। খানিকটা ফুল্লরা, খানিকটা বুধিকে নিয়ে যেন এই চুমকি। বুধির মতো উচ্ছল উদ্দাম, আর ফুল্লরার মতো তার কথা বলার ভঙ্গিটি। বুধির মতো উদ্ধত সুডৌল বুক, ফুল্লরার মতো সুঠাম পায়ের গোছা। কিন্তু সমস্ত ছাড়িয়ে বুধির কি যেন এক গোপন ঐশ্বর্য ছিল, যা চুমকির মধ্যে নেই। সেটা কি, সিতাব নিজেও জানে না। বিশ্ব-ভুবনে আর কারোর মধ্যে তা খুঁজে পায়নি সিতাব।

বাতাসপুরে এই ক'দিন থাকতেই সিতাব বুঝেছে, তার প্রতি চুমকির একটা আকর্ষণ আছে। সিতাব এখানে আসাতে সে যে যথেষ্ট খুশি হয়েছে, আনন্দ পেয়েছে, তা বুঝতে দেরি হয়নি তার। চুমকির দেহে এত রূপ-লাবণ্য, কিন্তু কই, সিতাবের মনকে সে নাড়া দিতে পারে না তো। মেয়েটিকে ভালো লাগে সিতাবের। কিন্তু সে ভালো লাগা মনে ভালোবাসা জাগায় না। চুমকির অসামান্য রূপ-লাবণ্য চোখের সামনে ঝলমল করে, কিন্তু সিতাবকে পাগল করে তুলতে পারে না।

সিতাবের নিভৃত ঘরে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য নিজেকে অনাবৃত করে তুলে ধরে, আদিম লালসার অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে হাতছানি দেয়, কিন্তু সিতাব এতটুকু আগ্রহ বোধ করে না। বুঝি কি তার যৌবনের সমস্ত প্রাণরসটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে চলে গেছে ?

তা চুমকির সঙ্গে সিতাবের এত যে অন্তরঙ্গতা, সিতাবের সঙ্গে কথা বলে এত যে আনন্দ পায় চুমকি, সে-ও সেদিন সিতাবের একটি কথায় দারুণ রেগে গিয়েছিল। চুমকির সেই ক্রুদ্ধ মূর্তি এখানে আসা অবধি কোনোদিন দেখেনি সিতাব। সে ভাবতেই পারেনি, তার ওই কথাটাতে চুমকি এত রেগে যাবে। নিতান্তই কথায় কথায় সিতাব বলেছিল, 'তুই তোর মরদের কাছে যাসনে কেন চুমকি ? মরদের ঘর করিসনে কেন ?'

কথাটা কানে যেতেই চুমকি তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল দাওয়া থেকে। ক্রুদ্ধ বেড়ালের মতো তার চোখ দু'টো ধক ধক করে জ্বলে উঠেছিল। ফোঁস ফোঁস করতে করতে বলেছিল, 'আমি মরদের ঘর করি না করি, তাতে তোমাব কি ?'

সিতাব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, দু'এক মুহূর্ত সে কোনো জবাবই দিতে পারেনি। তারপর মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বলেছিল, 'এমনি শুধালাম। তা তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন ?'

তেমনি হিস্‌হিস্ করে জবাব দিয়েছিল চুমকি, 'রাগব না! আমার মরদের কথা তুলছ, ওর সম্বন্ধে কি জানো তুমি ? বড়লোক আছে, আপনার ঘরে আছে। 'আয় তু-তু' বলে চাট্টি ভাত ছিটিয়ে দেবে, আর তাই খাওয়ার লেগে আমি তার পায়ের কাছে পড়ে থাকব ? না-মরদের ঘর করব ?'

রাগে দুমদুম করে পা ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

সিতাব পেছন থেকে ডেকেছিল, 'শোন চুমকি, কথা শোন।' কিন্তু সিতাবের কথা সে কানেই তোলেনি।

তারপর দিন তিন-চারেক আর এদিকটা মাড়ায়নি চুমকি। চোখেও পড়েনি সিতাবের। হয়তো সিতাবকে দেখলেই সে আগেভাগেই তার চোখের আড়ালে সরে যায়। কিন্তু সেদিন একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সিতাবের সামনে পড়ে গেলো সে। নেমুয়া আর চুমকি ঘাস কেটে ফিরছিল। বাড়িতে একটা গরু আর কয়েকটি ছাগল আছে। যখন মাঠ-ভরা ফসল থাকে, তখন চরে বেড়াবার জন্যে ওগুলোকে মাঠে ছেড়ে দেওয়া যায় না, বেঁধে রাখতে হয়। মাঠ থেকে ক্ষেতের আলের ঘাস কেটে এনে খাওয়াতে হয়। একটু বেলা হলে নেমুয়া আর চুমকি দু'জনেই ঘাস কাটতে যায় মাঠে। রোজকার মতো সেদিনও ওরা ঘাস কেটে ফিরছিল। দু'জনের কাছে ঝুড়ি-ভরা ঘাস। নেমুয়া ঝুড়িটা মাথায় নিয়েছে, চুমকি কাঁখে করে নিয়ে আসছে। সিতাবকে সামনে দেখেই থমকে দাঁড়াল চুমকি। এক মুহূর্ত। তারপরই ফিক করে হেসে ফেলল সে।

সিতাব বলল, 'তুই আর আসিস নে কেন চুমকি? আমার ওপর রাগ করেছিস?'

চুমকি বলল, 'হুঁ, সেদিন আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল নতুনবাবু। কেউ আমার মরদের কথা তুললে আমার মাথার ঠিক থাকে না। একদম দিমাগ খারাপ হয়ে যায়।'

'তা আমি কি করে জানব বল! আমার দোষ কি?'

'না, তোমার কিছু দোষ নাই। কিন্তু তুমি বলো নতুনবাবু, চাট্টি ভাতের লেগে কোনো মেয়ে না-মরদের ঘর করতে পারে? যার হাত-পা আছে, সে দুনিয়াতে আপনার পেটের ভাত যোগাড় করতে পারবে না? জানো নতুনবাবু, আমাকে নিয়ে ওর তিনটে বহু হলো। আগের দুটোও পালিয়েছে।'

'আগে তোদের কেউ জানত না সে-কথা?'

'সব্বাই জানত। দোষ না থাকলে তিনটে সাদি হয়? কিন্তু টাকার জোর। আমাকে দেখে গিয়ে এক হাজার টাকা দিতে চাইলে, ব্যস, ভুলে গেলো সবাই। আমার মা-কে চেনো না তো তুমি, মাগী টাকার পয়দাইশ্। আর কিছু খোঁজ-খবর করলে না। বড়লোক দামাদ হবে, আর কি?'

চুমকি কেন স্বামীর ঘর করে না, সেদিনই বুঝতে পেরেছিল সিতাব। দেহে যৌবনের বাঁধ-ভাঙা বন্যা, কিন্তু সে আজও কুমারী।

ছয়

এখন সিতাবের নাইট ডিউটি। স্টেশন মাস্টার যোগেশবাবুকে বলে একদিনের ছুটি নিলো সিতাব। ছুটি নেওয়ার জন্যে অনেক কারণ দর্শাতে হলো। অথচ সাদিনপুরে ছুটির জন্যে কখনও দরবার করতে হয়নি। কামাই করলে তেমন কিছু কৈফিয়তও দিতে হতো না। এখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি।

সকালবেলা রামপুরহাট লোকাল ধরে শ্রীরামপুর গেলো সিতাব। ভবতোষবাবুর ডিউটি ছিল। স্টেশনেই ছিলেন। সিতাবকে দেখে খুব খুশি। ডেকে নিয়ে অফিস-ঘরে চেয়ারে বসালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'বল সিতু, কেমন আছিস? সবাই ভালো আছে তো? শঙ্করবাবু রজতবাবুর খবর কি?'

সিতাব বলল, 'আমি তো এখন আর সাদিনপুরে নেই কাকাবাবু। বদলি হয়ে গেছি।'

'সে কি! বদলি হয়ে গেছিস? কোথায়?'

'বাতাসপুরে।'

'বাতাসপুরে? তা বাড়ি থেকে তো একটু দূর হয়ে গেলো! পড়াশুনো করছিস? অসুবিধে হয় না?'

'ওই জন্যেই তো এলাম। ওখানে থাকলে আমার পড়াশুনো হবে না।'

'কেন? কি অসুবিধে হচ্ছে?'

'কলেজ করতে পারছিনে। এ-বছরটা নষ্ট হলো। ওখানকার বাবুরা ডিউটির ব্যাপারে কোনো কথা শুনতে চান না। খুব কড়াকড়ি করছেন।'

'হুঁ, তাহলে তো খুব মুশকিল।' ভবতোষবাবু ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোকে যাতে সাদিনপুর থেকে বদলি না করা হয়, সেজন্যে দরখাস্ত করিসনি?'

সিতাব মাথা নেড়ে বলল, 'না। রজতবাবু বলেছিলেন দরখাস্ত করতে।'

'বোকামি করেছিস। দরখাস্ত করা উচিত ছিল। বলতে পারতিস, তুই পড়াশুনো করছিস, বদলি করলে অসুবিধে হবে।'

'আমাকে অন্য কোথাও বদলির ব্যবস্থা করে দিন কাকাবাবু। ওখানে আমার একদম ভালো লাগছে না। আমাকে এখানে নিয়ে আসুন।'

ভবতোষবাবু হাসলেন। বললেন, 'আমার হাতে কি সেই ক্ষমতা আছে রে! সে ক্ষমতা থাকলে আমি কি তোকে রেখে আসি? স্টেশন মাস্টার কে আছেন ওখানে?'

'যোগেশবাবু।'

'যোগেশবাবু! চেনা-জানা নয় মনে হচ্ছে।' আবার ভবতোষবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভাবলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা বেশ জটিল মনে হচ্ছে। বাতাসপুরে সবে এসেছিস, এখনি বদলি করানোটা কঠিন হবে। আচ্ছা দাঁড়া, দেখি।' তারপর একজন খালাসীকে ডেকে বললেন, 'রামশরণ, নিমাইবাবুকে একটু ডেকে দে তো।'

কিছুক্ষণ পরে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আমাকে ডাকছিলেন ভবদা?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ নিমাই, বড্ড ঝামেলায় পড়েছি। দেখো তো কিছু একটা করতে পারো কি-না!'

নিমাই হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনি আবার কি ঝামেলায় পড়লেন?'

'এই যে এই ছেলেটা, আমি সাদিনপুরে থাকতে ওকে খালাসীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর নিজের চেষ্টায় প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে। সেকেণ্ড ডিভিসনে, বুঝলে! কলেজে পড়ছিল। তা এখন ওকে বাতাসপুরে বদলি করে দিয়েছে। পড়াশুনো সব বন্ধ।'

নিমাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিলেন। বাতাসপুরে কে কে আছে, খোঁজ নিলেন। তারপর বললেন, 'বদলি করাটা বেশ কঠিন ভবদা। হতে হতে অনেক সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে, ওখানে থেকেই যাতে ও পড়াশুনো করতে পারে, আমার মনে হয়, সেই চেষ্টা করলেই ভালো হয়।'

ভবতোষ বললেন, 'সেটা হলেও মন্দ হয় না। ও যদি ওখানে থেকে পড়াশুনো করতে পারে, তাহলে আপাতত সমস্যাটা মেটে। তাই দেখো নিমাই, যদি কিছু করা যায়!'

নিমাই বললেন, 'মনে হয়, হয়ে যাবে।' তারপর সিতাবকে বললেন, 'আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, বোলপুর গিয়ে আশিসবাবুকে দেবে। উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। দরকার হলে উনি নিজে গিয়ে, যাতে তুমি পড়াশুনো করতে পারো, সেজন্যে যোগেশবাবুকে বলে দেবেন।'

নিমাই এই আশ্বাসটুকু দিয়ে গেলেন, কিন্তু সিতাব মনের মধ্যে একটুও উৎসাহ বোধ করল না। বাতাসপুরে আর একদিনও থাকতে ইচ্ছে করে না তার!

ভবতোষ বললেন, 'তুই বলে এসেছিস তো?'

সিতাব জবাব দিলো, 'ছুটি নিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছিস। তাহলে আজ গিয়ে কাজ নেই। কাল যাবি। বাড়িতে চলে যা এখন। নিমাই চিঠি লিখলে আমি নিয়ে রাখব।'

হতাশ মনে ভবতোষের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল সিতাব।

লখী বাবলু বুধি কেউ বাড়িতে নেই। বুধি কলেজ গেছে। লখী বাবলু স্কুলে। তারকেশ্বরী একগাল হেসে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন কতকাল পরে একান্ত আপনজন বাড়ি ফিরেছে। বললেন, 'বাব্বাঃ, কতদিন পরে দেখলাম! খবর-টবরও তো আর দাও না। পড়াশুনো করছ তো?'

সিতাব বলল, 'না কাকীমা, পড়াশুনো বন্ধ এখন।'

'বন্ধ! কেন?'

'সাদিনপুর থেকে বদলি হয়ে এসেছি। বাতাসপুরে। নতুন জায়গা। পড়াশুনোর সুবিধে হচ্ছে না।'

'দেখো কাণ্ড! তাই বলে পড়াশুনো ছেড়ে দেবে?'

'সেজন্যেই কাকাবাবুর কাছে এসেছি। যদি কিছু ব্যবস্থা হয়!'

'কিন্তু তোমার এ-কি চেহারার ছিরি হয়েছে সিতু! দেখে যেন চেনাই যায় না।'

সিতাবের মুখে ম্লান হাসি। কতদিন হলো সে নিজের চেহারাটা ভালো করে আয়নায় দেখেনি, কি করে বুঝবে তার চেহারা কেমন হয়েছে! তবে আগেকার মতো তার গায়ে যে এখন আর শক্তি নেই, সেটা বোঝে। যে-সিতাব লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দু'জনের কাজ একাই করত, দু'মণ আড়াই মণের পাট্টা অক্লেশে নিজেই তুলত, একটুও বিশ্রাম না নিয়ে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারত দু'মাইল আড়াই মাইল রাস্তা, সে অন্য সিতাব।

তারকেশ্বরী বললেন, 'তোমার কাকাবাবুর আসতে দেরি হবে। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও, কেমন!'

কাছে বসিয়ে তেমনি আদর করে খাওয়ালেন তারকেশ্বরী। খেতে বসে সিতাবের সবকিছুই মনে হচ্ছিল অমৃত। আঃ, কতদিন এই স্নেহ-শীতল স্পর্শ পায়নি সিতাব! একদিকে পরম তৃপ্তিতে যেমন তার মনটা ভরে যাচ্ছিল, তেমনি আর একদিকে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছিল।

দুপুরবেলা ভবতোষ ফিরে এসে নিমাইয়ের চিঠি দিলেন। বললেন, 'এতেই কাজ হবে। বোলপুরে গিয়ে আশিসবাবুকে দেবে। ওখানকার বড় নেতা। খুব ভালো লোক। সবাই ভালোবাসে ওঁকে। উনি বলে দিলেই কাজ হবে। তারপর তোমার বদলির কি ব্যবস্থা করা যায়, দেখি। রামপুরহাট কিংবা ওইরকম কাছাকাছি যদি কোথাও হয়, চেষ্টা করব।'

খেয়ে উঠে কিছুক্ষণ সিতাবের সঙ্গে গল্প করলেন তিনি। তারপর আবার ডিউটিতে চলে গেলেন।

এখন তারকেশ্বরী ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। খাঁ খাঁ করছে বাড়ি। সিতাবের ভালো লাগছিল না। বেরিয়ে পড়ল সে। হাঁটতে হাঁটতে কোর্টের পাশের রাস্তাটা ধরে গঙ্গার ধারে গেলো। দুপুরবেলা। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে বসল সিতাব। রোদ্দুরে গঙ্গার জল ঝিকমিক করছে। খড়-বোঝাই দু'তিনখানা নৌকো যাচ্ছে মাঝ নদীতে।

কিছুক্ষণ বসে থাকতেই গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেলো সিতাবের। প্রচণ্ড দাবদাহে তার মন যে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল, তা-ও খানিকটা প্রশমিত হলো। গঙ্গার উদ্দেশে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করল সিতাব। মনে মনে বলল, 'মা, তোমার এই সন্তানকে মনে রেখো।'

একটু বেলা পড়তেই উঠে পড়ল সিতাব। হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই বুধির সঙ্গে দেখা। পরনে নীল সিন্থেটিক শাড়ি। চোখে সান-গ্লাস। এক হাতে কয়েকখানা বই। বুধিকে যেন চেনাই যায় না। আরও সুন্দর হয়েছে. লাবণ্যে ঝলমল করছে। গটগট করে হেঁটে আসছিল। সিতাবকে দেখে থমকে দাঁড়াল, 'সিতুদা না ?'

হায় রে, সিতাবকে দেখেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় বুধির! সিতাব হেসে বলল, 'হ্যাঁ দিদিমণি।'

'কখন এলে ?'

'রামপুহাট লোকালে।'

'তা এদিকে যাচ্ছ কোথায় ?'

'এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কি করব, বাড়িতে তোমরা কেউ নেই, তাই বেড়াতে বেরিয়েছি।'

'আচ্ছা, তুমি এসো তাহলে, কেমন!'

কেমন যেন নিরুত্তাপ গলায় বলল বুধি। তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

কই, সিতাবকে দেখে তো বুধি প্রগলভ হয়ে উঠল না! খুশিতে তার চোখ দু'টো নেচে উঠল না তো! যার কথা সিতাব দিনরাত্রি এক মুহূর্ত ভুলে থাকতে পারে না, কতকাল পরে তার সঙ্গে দেখা, অথচ কি নিরুত্তাপ সম্ভাষণ! দায়সারা গোছের দু'চারটে কথাবার্তা, সামনা-সামনি হলে যা না বললেই নয়। বুধি কি একদম ভুলে গেছে সিতাবকে? তবু সিতাব মনে মনে আশা করেছিল, এটাই শেষ নয়, বুধির সঙ্গে তার কথা হবে, নিশ্চয়ই নিভৃতে আলাপ করবে বুধি।

কিন্তু, হায় রে, দুরাশা—দুরাশা! নিদাঘতপ্ত মরুভূমিতে শেষ জলবিন্দুটুকুও শুকিয়ে গেলো। কথা বলার সময় হলো না বুধির। একান্তে সিতাবকে বলার মতো বুঝি আর কোনো কথাই নেই তার। সিতাবকে পেয়ে লখী বাবলু উল্লসিত হলো, আনন্দে মুখরিত হলো। খুশি তারকেশ্বরী ভবতোষবাবুও। কিন্তু বুধির মনে কোনো উত্তাপ সঞ্চারিত হলো না। সিতাবের সঙ্গে তার দু'চারটে কথা যে হয়নি, তা নয়, কিন্তু নিতান্তই সৌজন্যতার খাতিরে। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদে বুধির মনে কোনো দুঃখ নেই, জ্বালা-যন্ত্রণা নেই। সে ভালো আছে, খুব ভালো আছে।

এখন বাকি জীবনের জন্যে কি আর সম্বল রইল সিতাবের? জন-মজুর খেটে বেড়ানো সিতাব কি এর চেয়েও নিঃস্ব ছিল? কিছু না থাকলেও অগাধ প্রাণ-সম্পদে তার মনটা কি ভরপুর ছিল না তখন? এত পরিশ্রমের পর তার চোখের সামনে এ-কি সীমাহীন উষর প্রান্তর—জল নেই, গাছপালা নেই, একটি সবুজ তৃণের চিহ্ন নেই কোথাও!

পরদিন বুধি যখন কলেজ যাওয়ার জন্যে বেরোলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো সিতাব। দ্রুতপায়ে হেঁটে একটু কাছাকাছি এসেই পেছন থেকে ডাকল, 'দিদিমণি!'

বুধি দাঁড়াল। একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'ওমা, তুমি আবার কোথায় চললে?'

'না, কোথাও না। এই তোমার সঙ্গে দু'টো কথা বলার জন্যে এলাম।'

বুধি আবার হাঁটতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সিতাবও হাঁটছিল। কিন্তু কি কথা বলবে সিতাব, নিজেই খুঁজে পেলো না। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে বুধিই আবার জিজ্ঞেস করল, 'আজ থাকছ তো সিতুদা?'

সিতাব জবাব দিলো, 'তুমি যদি থাকতে বলো।'

বুধি সহসা কোনো উত্তর দিলো না। তার মুখ-চোখ থমথম করছিল। সিতাব দু'একবার তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'কই, কিছু বললে না তো?'

'কি বলব!' বুধির সংক্ষিপ্ত জবাব।

সিতাব বুঝতে পারল, বুধি ক্ষুব্ধ। সিতাবের সান্নিধ্য তার ভালো লাগছে না। কিন্তু সিতাব তো তার শেষ কথা শোনার জন্যেই এসেছে। অথচ সিতাবের মুখে

কথা যোগাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত যেন জোর করেই কথাটা বলে ফেলল সে, 'আমি যে তোমায় ভুলতে পারিনে দিদিমণি। তুমি জানো না, কি কষ্টে আমার—'

সিতাব হয়তো আশা করেছিল, বুধি বলবে, 'আমারও তো কম কষ্ট হয় না সিতুদা।' কিন্তু না, বুধি হঠাৎ থমকে মুখোমুখি দাঁড়াল সিতাবের। বলল, 'তুমি ভুল করছ সিতুদা। পাগলামি কোরো না।'

আচমকা যেন এক প্রচণ্ড চড় খেলো সিতাব। বাকি কথাটুকু আর সে উচ্চারণ করতে পারল না। মুহূর্তে ভুল বুঝতে পারল সে। মনের মধ্যে নিজের প্রতি এক প্রচণ্ড ধিক্কার জন্মাল তার। ছি ছি, এতদিন ধরে বুধির সঙ্গে তার পরিচয়, কখনো তো নিজেকে সে এমন অনাবৃত করে ফেলেনি, নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেনি। আজ মুহূর্তের ভুলে সে বুধির কাছে নিজেকে এতখানি ছোট করে ফেলল, হেয় করে তুলল!

বুধিরও হয়তো মনে হচ্ছিল, এমন নিষ্ঠুর জবাব দেওয়াটা উচিত হয়নি তার। কণ্ঠস্বর একটু কোমল করে বলল, 'হঠাৎ ওইভাবে কথাটা বললাম বলে কিছু মনে কোরো না সিতুদা। তোমারও তো ভেবে দেখা উচিত, তোমার ঘর-সংসার আছে, দায়-দায়িত্ব আছে!'

সিতাবের মুখ দিয়ে আর একটিও কথা বেরোলো না। চোখ তুলে বুধির দিকে তাকাতেও পারল না সে।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বুধি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'এই রে, এগারোটা বাজে। ফার্স্ট পিরিয়ড্‌টা আর ধরতে পারব না হয়তো। আমি এখন আসি, কেমন!' তারপর পা বাড়াতে গিয়ে একটু থেমে বুধি বলল, 'আমি থাকতে বললে থাকবে বলছিলে, তা আমি তোমায় থাকতে বলছি সিতুদা। শুধু আজ কেন, সব সময়েই বলব। কলেজ থেকে ফিরে আসি, আবার কথা হবে।'

সিতাব হাসবার চেষ্টা করল। ম্লান হাসি। বলল, 'জোর করে কেমন নেমন্তন্ন আদায় করে নিলাম দিদিমণি!'

বুধি হাসতে হাসতে সামনে পা বাড়াল। সিতাবের মুখের ম্লান হাসিটুকু সে কি ভালো করে লক্ষ্য করেছিল! সে কি ভাবতে পেরেছিল, তার কলেজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সিতাব আর অপেক্ষা করবে না!

সাত

একটি প্রাণহীন যন্ত্র—ঘুরছে, ফিরছে, কাজ করছে। কাজ করছে এক যান্ত্রিক মানুষ। কোথাও কোনো খুঁত নেই, স্টেশন মাস্টার কিংবা টিকিটবাবুদের কোনো অভিযোগ নেই। সিতাব এখন প্রিয়পাত্র সকলের—খুব ভালো ছেলে, মুখে কথা নেই, অথচ যখন যা করার, ঠিক করে যাচ্ছে। তাই তো হয়। ছোট্ট

শিশু এই বিশাল বিশ্বটাকে তার ছোট্ট হাতের মুঠোয় চেপে ধরার স্বপ্ন দেখে, যেন কোনো বাধা নেই, বিপত্তি নেই, ভয় নেই, যেন সবই অনায়াসলভ্য। কিন্তু যখন তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, চলার পথে বহু বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়, প্রতি মুহূর্তে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়, লড়াই করতে করতে জীবনের জটিল ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খেতে থাকে, থই পায় না, তখন বিশাল বিশ্বের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলে মনে হয়, যেন বাতাসে উড়ে বেড়ানো খড়কুটো। আর একবার সেই বোধ মানুষের মনে সৃষ্টি হলে সে হাতের মুঠো আলগা করে দেয়, প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাই সিতাব শ্রীরামপুর থেকে ফিরে আসার সময়, ট্রেনের কামরায়, পকেট থেকে নিমাইবাবুর চিঠিখানা বের করেছিল, পড়েও দেখেনি, হাতের মুঠোয় সেটাকে দলা পাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কি হবে আর চেষ্টা-চরিত্র করে, কিসের জন্যে চেষ্ট-চরিত্র করবে সে?

সব শেষ। এতদিন মনের মধ্যে মরুস্থানের মতো যে একটুখানি মধুর স্মৃতি ছিল, সামান্য ভুলের জন্যে সিতাব নিজেই তাকে বিষাদময় করে তুলেছে। নিজের পায়ে লাথি মেরে তার মঙ্গলঘট ভেঙে দিয়েছে। অন্যায়—অন্যায়। ভীষণ অন্যায় করেছে সে। বাসায় ফিরে এসেই বই থেকে বুধির উপহার দেওয়া ছবিখানা বের করেছিল। ইচ্ছে করছিল, ছবিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। বুধির স্মৃতির সামান্যতম চিহ্নও আর অবশিষ্ট রাখতে চায় না সে। কিন্তু পারেনি। ছবিখানার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অনুতাপে অনুশোচনায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বুক পকেটে ছবিটা রেখে দিয়ে চিঠি লিখতে বসেছিল বুধিকে। চিঠি লিখেছিল, কিন্তু সে-চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল পরদিনই।

ছবিটা সেই যে জামার বুক পকেটে রেখে দিয়েছিল, তেমনিই রয়ে গেলো ওটা। কখনো-সখনো পকেট থেকে বের করে, ছবিটার দিকে চাইলেই দুঃখ-বেদনায় অনুশোচনায় মনটা ভরে ওঠে। সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড অপমানের গ্লানি বোধ করে। কখনো ক্রোধ জাগে মনে, কখনো হাহাকার। বুধিকে চিঠি লেখে। মনের সমস্ত কথা উজাড় করে দিয়ে দীর্ঘ চিঠি লেখে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ছিঁড়ে ফেলে সে-চিঠি। না, বুধির কাছে আর অপরাধের বোঝা বাড়াতে চায় না সে।

ডিউটির সময় প্রায়ই স্টেশনের বারান্দায় বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে থাকে সিতাব। চুপচাপ। জাবেদ আলি মাঝে মাঝে বলে, 'তুই সব সময় এত মনমরা হয়ে থাকিস কেন রে? ক'দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি যা। বাড়ি থেকে ঘুরে আয়।'

বাড়ি মানে তো সেই সাদিনপুর, সেই ফুলঝরা! না, সিতাব আর কোথাও যাবে না। কোথাও কারোর কাছে যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই তার।

ইতিমধ্যে একদিন ভৈরব এসেছিল। সেই একই বেশ। পরনে প্যান্ট-জামা, কাঁধে কাপড়ের সাইড্ ব্যাগ। বোলপুরে না-কি মিটিঙ ছিল, ফেরার পথে

সিতাবের সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার ইচ্ছে। সিতাবের তা মোটেই বিশ্বাস হয়নি। সে বুঝতে পেরেছিল, তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়েই ভৈরব এসেছে। কথায় কথায় সেটা বেরিয়ে পড়তে দেরি হলো না। বাড়ি যাওয়ার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করল সিতাবকে। বলল, 'চল, আমার সঙ্গেই চল।' সিতাব অজুহাত দেখাল, এখন সে ছুটি পাবে না। এই তো ক'দিন আগে ছুটি নিয়ে সে শ্রীরামপুর গিয়েছিল, ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ভৈরব বলল, 'আমি স্টেশন মাস্টারকে বলে তোর ছুটি করিয়ে নিচ্ছি।'

সিতাব রাজি হয়নি।

ভৈরব বলেছিল, 'তোদের কি হয়েছে আমি জানিনে। তবে সংসারে খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে মতভেদ হতেই পারে। অ্যাড্‌জাস্ট করে চলতে হয়।'

কিন্তু সিতাবকে কিছুতেই বোঝানো সম্ভব হয়নি। অবশেষে ভৈরব বলেছিল, 'বৌ-মা তো দিনরাত কান্নাকাটি করছে। আমার কাছে কতবার এসে অনুনয়-বিনয় করেছে তোর সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার জন্যে। তা সময় হয়ে উঠছিল না। ওদিকে ওর কি করে চলে বল্। এতদিন হয়ে গেলো, টাকা-পয়সাও তো পাঠাসনে। নিজের কর্তব্যকে তুই কি করে অবহেলা করতে পারিস সিতাব? অন্তত তোর কাছে এটা আশা করা যায় না।'

ভৈরবের কথাটা গিয়ে সিতাবের মনে সরাসরি আঘাত করে। এদিকটা তো সে কখনও ভেবে দেখেনি! কোয়ার্টারের বারান্দায় দু'জনে কাছাকাছি বসে কথা বলছিল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো সিতাব উঠে দাঁড়াল। ভৈরব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো? বস্!'

'আসছি।' বলে সিতাব ঘরে ঢুকল। তোরঙ্গ খুলে টাকার গোছাটা বের করল। নিজের খরচ বাদে মাইনের সমস্ত টাকাই রয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভৈরবের সামনে টাকাগুলো রেখে দিয়ে বলল, 'আমার অন্যায় হয়েছে ভৈরবদা। এদিকটা আমি একবারও ভাবিনি। টাকাটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে দিও। এর পর থেকে আমি প্রত্যেক মাসেই টাকা পাঠিয়ে দেবো। তোমার নামেই পাঠাব।'

ভৈরব বলল, 'তবু যাবিনে?'

সিতাব চুপচাপ বসে রইল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভৈরব টাকাটার দিকে হাত বাড়াল, 'কত আছে?'

সিতাব জবাব দিলো, 'গুনে দেখিনি। যা আছে নিয়ে যাও।'

'সে-কি! তোর মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে সিতু? যা ছিল সবই দিয়ে দিচ্ছিস না-কি?'

সিতাব সংক্ষেপে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

ভৈরব বলল, 'এখানে তোর চলবে কি করে?'

'চলে যাবে ভৈরবদা।'

'না সিতু, পাগলামি করিসনে। মাথা ঠাণ্ডা কর।'

টাকাটা গুনে দেখল ভৈরব। তারপর কিছু টাকা রেখে দিয়ে বলল, 'এই থাক। এতেই হবে। এতটা হয়তো দরকারও হবে না ওর, একা মানুষ। তবু নিয়ে যাচ্ছি। এ ক'দিনে বেশ কিছু ধারকর্জ করে ফেলেছে, বলে তো সব কথা। যাক গে, আমি আবার আসব সিতু। আর, আমি আসার আগেই তুই যদি যাস, বৌ-মার চেয়েও বেশি খুশি হবো আমি। সিতু, তুই আমার মনের অনেকখানি জুড়ে আছিস রে।'

কি মারাত্মক কথা বলেছিল ভৈরব! তাহলে কারোর কারোর মনে এখনও সিতাবের জন্যে জায়গা আছে ?

আছেই তো। মা ভালোবাসত, সে নেই। কিন্তু এখনও ভবতোষবাবু তারকেশ্বরী আছেন, সিতাবকে স্নেহ করেন। ভৈরব আছে, সিতাবের কথা ভাবে। আর ওই জন্যেই তো এখনও মাঝে মাঝে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে সিতাবের।

আট

ভৈরবের যাওয়ার পর আরও দু'তিন মাস কেটেছে। মাইনে পাওয়ার পরদিনই সে মনি-অর্ডার পাঠিয়েছে ভৈরবের নামে। একবারও ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু শুধু ওই মনি-অর্ডার। এক ছত্র লেখা নয়, একটু সম্ভাষণ নয়। ইতিমধ্যে দু'খানা চিঠি এসেছে ফুল্লরার। ভৈরবের হাতের লেখা। অন্তত একবারটি যাওয়ার জন্যে অনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়েছে। সিতাব একটি চিঠিরও জবাব দেয়নি। বিশ্বে আর কারোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না সিতাব। মানুষের ভালোবাসায় ঘেন্না ধরে গেছে তার।

যুগল বলে, 'তুমি যেন কিরকম সিতুদা। শুধু দিনরাত চাকরি আর চাকরি, ব্যস্। আমি শালা ওতে নেই। চাকরি আছে, করতে হয়, করছি। কাউকে পরোয়া করি না।'

এখন দিনের বেলা ডিউটি যুগলের। ওর সঙ্গে সিতাবের ডিউটি নয়, খুবলালের ডিউটি। কিন্তু সিতাব প্রায় সারাদিনই স্টেশনে কাটায়। কাটায় মানে চুপচাপ বসে থাকে। কখনো একা একা, কখনো যুগলের কাছে। দিনমানই তো ছুটি তার। একবার রান্না করে, দু'বার খায়। সবদিন রান্না করতেও ইচ্ছে করে না। মুড়ি কিংবা চিঁড়ে খেয়ে কাটিয়ে দেয়। এখন সিতাবের কাছে শরীরটাই বোঝা। দেহ-ধারণের অনেক ঝক্কি।

সেদিন যুগলের কাছে বসে ছিল সিতাব। বলল, 'এবার রামপুরহাটে একখানা যা বই এসেছে না, দারুণ সিতুদা। উঃ শালা, বই বটে। আমি দু'বার দেখেছি। আদিলের গায়ে হাতির মতো জোর, বুঝলে সিতুদা। বড় বড় থাম দু'হাতে ঠেলে

ভেঙে ফেলে। কিন্তু তার সব শক্তি থাকে চুলে। সেই আদিলকে জব্দ করার জন্যে কত রকম চেষ্টা, কিন্তু পারবে কেন? শেষে যখন ভেদ জানাজানি হলো, তখন একটা মেয়েকে দিয়ে ফাঁদে ফেলল আদিলকে। ঘুমিয়ে ছিল সে, এমন সময় মেয়েটা তার চুল কেটে নিলে। ব্যস্, তখন আর হাতির মতো গায়ের জোর কোথায়! শেকলে বেঁধে বন্দী করে রাখল তাকে। কিন্তু আস্তে আস্তে চুল বাড়ছে তো। ওদিকে শালা —ইস্, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না, সিতুদা। মাইরি, তুমি চলো সিতুদা, আজই চলো, এমন বই না দেখলে শালা জীবনটাই বৃথা!'

যুগল সিতাবকে ছবিটা দেখাবেই। ডিউটি শেষ করে গিয়ে নাইট শো দেখবে। সিতাব বলল, 'অত রাতে আমি ফিরব কি করে! ট্রেন নেই তো!'

'ধুত্তেরি, ট্রেনের কিছু বলেছে। চলো, আমাদের ওখানে থাকবে।'

'আমার নাইট ডিউটি যে?'

'দাঁড়াও, আমি খুবলালকে বলে ব্যবস্থা করছি।'

যুগলের খুব উৎসাহ। এমন একটা ছবি সিতাবকে দেখাতে পারলে সে যেন নিজেই কৃতার্থ হয়ে যায়। সিতাবের বদলে রাত্রে ডিউটি করার জন্যে খুবলালকে রাজি করালো সে। তবু সিতাবকে গড়িমসি করতে দেখে যুগল বলল, 'তুমি খুব হাড়কিপ্টে আছ মাইরি। খরচের ভয়ে সিনেমা দেখতে চাও না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে দেখাব, চলো।'

সিতাবকে না নিয়ে গিয়ে সে কিছুতেই ছাড়ল না।

কিন্তু সিনেমা দেখতে বসেও সিতাবের কোনো উচ্ছ্বাস নেই। যুগল মাঝে মাঝে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ছবির শেষ দিকটায় যখন আদিল মত্ত হাতির মতো রাজপ্রাসাদের বিশাল বিশাল থাম দু'হাতে ঠেলে ভেঙে ফেলতে শুরু করল, তখন যেন যুগল একেবারে বেসামাল। উল্লাসে ফেটে পড়ছে সে। কিন্তু সিতাব নির্বিকার। তার গায়েও কি আদিলের মতো শক্তি ছিল না? সে-ও কি আদিলের মতো সমস্ত প্রতিকূলতাকে একটির পর একটি ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিল না? কোথায় ছিল তার শক্তি? ফুল্লরার কাছে, বুধির কাছে? কে তাকে সেই শক্তি যোগাত?

সিনেমা হল্ থেকে বেরিয়ে যুগলের সঙ্গে তার বাড়িতে যাচ্ছিল সিতাব। স্টেশনের ভেতর দিয়ে পথ। কিন্তু স্টেশনে এসেই থমকে দাঁড়াল সে। বলল, 'যুগল, তুই যা। আমি আর যাচ্ছিনে।'

যুগল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন তো ট্রেন নেই সিতুদা! কোথায় যাবে তুমি? ট্রেন তো অনেক দেরিতে।'

'তা হোক। তুই যা।'

যুগল চলে গেলে সেই নিশুতি রাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবার পথে পা বাড়াল

সিতাব। রামপুরহাটের পথ-ঘাটের সঙ্গে যে তার নাড়ীর সম্পর্ক! ছন্নছাড়ার মতো পথে পথে হাঁটতে লাগল সে। এই পথে হাঁটতে হাঁটতে বুধি একদিন তার চোখে চোখ রেখে ফিক করে হেসেছিল। বলেছিল, 'তুমি একটা বুদ্ধু। কিচ্ছু বোঝো না।

সত্যিই তো, সে নিজে একটা বুদ্ধু। কিছুই বুঝতে পারে না সে। নইলে সেই বুধিই তাকে রূঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, 'তুমি ভুল করছ সিতুদা। পাগলামি কোরো না।'

হাঁটতে হাঁটতে শুঁড়িখানায় এসে হাজির হয় সিতাব। তরল আগুন নেমে যাচ্ছে কণ্ঠ বেয়ে। আঃ, শান্তি —শান্তি! ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে মা, ফুল্লরা, বুধি, ভবতোষ, তারকেশ্বরী —সবাই একাকার হয়ে যায়। একজনের সঙ্গে আর একজনের কোনো পার্থক্য থাকে না। সবাই মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে একটা অবয়ব হয়ে ওঠে। টলতে টলতে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসে সিতাব। বিড়বিড় করে বলে, 'ওই চামচিকের বাচ্চা যোগেশ সনাতন, আমাকে চোখ রাঙায়! হুঁঃ, আমি শালা সিতাব মণ্ডল। আমাকে চেনে না। একদিন ঠ্যাঙ ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো শালাদের।'

কোন পথে হাঁটছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই মালুম নেই সিতাবের। মন ও মস্তিষ্ক ভীষণ উত্তেজিত, পরস্পর সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করছে না, কিন্তু পা দু'টো তো চিরপরিচিত পথ-ঘাট চেনে। তারা তাকে ঠিক টেনে নিয়ে চলল গন্তব্যস্থলের দিকে।

নিস্তব্ধ নিশুতি গ্রাম। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সিতাব টলতে টলতে তার বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। ফুল্লরা এখন সন্ধ্যে হতে না-হতেই সদর দরজা বন্ধ করে দেয়। ভয়ে ভয়ে রাত কাটায়। সিতাব দরজায় লাথি মারল, 'বুধি, দরজা খোল্।'

তারপর আবার লাথি মারল সে। তারপর আবার।

ফুল্লরা দরজা খুলে সিতাবকে দেখে অবাক। স্থির থাকতে পারছে না সিতাব। মাথা টলছে। কিছুক্ষণ অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ফুল্লরার মুখের দিকে। তারপর পাগলের মতো হাসি হেসে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল।

দরজা বন্ধ করল ফুল্লরা। ঘরে ফিরে এসে দেখল, সিতাব দাঁড়িয়ে আছে। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। পা দু'টো টলছে তার। ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণ।

ফুল্লরা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। এ-সিতাবকে সে কখনও দেখেনি। আগেও সে এক-আধবার মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত। বাড়িতে এসে মাতলামি করত। কিন্তু মাতাল হয়ে এমন বোবা হয়ে যায়নি কখনো।

সিতাব চোখ তুলে তাকাল ফুল্লরার দিকে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে আবার সে পাগলের মতো হাসি হাসল। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি বুধি। খুব ভালোবাসি।'

সিতাব কয়েক পা এগিয়ে এলো তার দিকে। ফুল্লরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো একেবারে। পেছনে সরে এলো কয়েক পা। বলল, 'ওগো, ছ্যাখো, আমি ফুলি। একটুকুন বোসো তুমি। উখ্যানেই বোসো।'

সিতাবের কানে কথা গেলো না। সে ফুল্লরার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। কিন্তু ফুল্লরা শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারল না। এক সময় সিতাব জাপটে ধরে তাকে। ফুল্লরা প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার—'ছাড়ো। ছাড়ো বুলছি। ছাড়ো।'

কিন্তু সিতাব তখন মানুষ নয়, পশু। তার চোখ জ্বলছে ধকধক করে। ফুল্লরাকে সে ছুঁড়ে দিলো মেঝেয়। তারপর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। বাঘ বুঝি শিকার ধরার সময় এমনি হিংস্র হয়ে ওঠে!

ফুল্লরা সিতাবের গলার কাছে নখ বসিয়ে দিলো। সিতাব তখন তার বুকের মাংস খাবলে তুলে নিচ্ছে যেন। সিতাবের হাতে দাঁত বসিয়ে দিলো ফুল্লরা। কিন্তু সিতাবের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন এক হিংস্র পশু। ফুল্লরার দু'বাহু ধরে এক নির্মম ঝাঁকানি দিলো সিতাব। ফুল্লরার দেহের অস্থিসন্ধিগুলো যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। আর তারপর, নিষ্ঠুরের মতো শক্ত হাতে সে তার হাত-পা-কে দেহের সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধরল, তার দেহটাকে নরম মাটির ডেলার মতো দুমড়ে-মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে দিতে থাকল। ফুল্লরার মাথাটা ঝুলে রইল পেছন দিকে। এক অসহ্য যন্ত্রণায় ফুল্লরার গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরোতে লাগল শুধু।

সিতাব তখন হিংস্র পশু। পারলে ফুল্লরার দেহটাকে যেন সে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দেয়। এমন অপমান জীবনে কখনও অনুভব করেনি ফুল্লরা।

কতক্ষণ তার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল সিতাব, ফুল্লরা জানে না। তার শুধু মনে হচ্ছিল, রাত্রিটা বড় দীর্ঘ। এক সময় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হলে সিতাবের নির্জীব দেহ পড়ে রইল ফুল্লরার দেহের ওপর। মাথাটা ফুল্লরার দেহের পাশেই ঝুলে রইল। অতিকষ্টে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল ফুল্লরা। উঠে বসল সে। সারা দেহের পেশীতে অসহ্য যন্ত্রণা। ঠোঁট কামড়ে সিতাবের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। এই মুহূর্তে সিতাবের প্রতি ঘৃণা হচ্ছিল তার। দারুণ ঘৃণা।

নিজের দেহটাকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে বিছানায় গেলো ফুল্লরা। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল।

সকালে ঘুম ভাঙতেই ফুল্লরার মনে হলো, রাত্রিটা যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেটেছে। দুঃস্বপ্ন। কিন্তু পাশে চোখ পড়তেই নির্মম সত্য বুঝতে পারল সে। সিতাব তখনও মেঝেয় পড়ে রয়েছে একইভাবে। দুঃস্বপ্ন হলেই বুঝি ভালো হতো।

ফুল্লরার মনটা আবার বিরক্তিতে ভরে গেলো। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। সিতাবের দিকে আবার চেয়ে দেখল। তার বুকের কাছে পকেট থেকে একটা ছবি উঁকি মারছে। ফুল্লরা গিয়ে হাতে তুলে নিলো ছবিখানা। একটি চেনা মুখ —খুব চেনা —বহুদিন আগে দেখা —বুধি। থরথর করে ফুল্লরার সারা শরীর কেঁপে উঠল।···

ঘুম থেকে উঠে সিতাব অবাক হয়ে গেলো। যে-সাদিনপুরে আর কখনও পা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এখন সিতাব সেই সাদিনপুরেই তার নিজের বাড়িতে। একটু একটু করে গতকালের কথা তার মনে পড়তে লাগল। রামপুরহাটে সিনেমা দেখতে আসা, যুগলকে বাড়ি চলে যেতে বলে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, শুঁড়িখানায় যাওয়া, তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু এদিক-ওদিক চেয়ে ফুল্লরাকে দেখতে পেলো না সিতাব। হয়তো বাইরে কোথাও রয়েছে। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর হাঁক দিলো —'ফুলি —ও ফুলি—'

কোনো সাড়া পেলো না সিতাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়ির এদিক-ওদিক খুঁজল। কোথাও নেই ফুল্লরা।

ঘরে আবার ফিরে আসতেই লক্ষ্য করল, বুধির ছবিখানা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেয়। ছবির টুকরোগুলোর দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'শালী —হারামজাদী—'

একটু বেলা পর্যন্ত বাড়িতে অপেক্ষা করল সিতাব, কিন্তু ফুল্লরা ফিরল না। অবশেষে মনে এক নিদারুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে ঘরের দরজায় শেকলটা তুলে দিলো। তারপর বাতাসপুর যাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

পঞ্চম অধ্যায়

সারা গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেলো। সিতাব রাতে মদ খেয়ে এসে বউটাকে খুব মারধোর করেছে, সকাল হতে না-হতেই ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে —কি করে যে সে-খবর সারা গাঁয়ে চাউর হলো, ভাবতে অবাক লাগে। কে দেখেছে, কে কার কাছ থেকে শুনেছে, মালুম নেই, অথচ লোকের মুখে মুখে ঘুরছে কথাটা। সাদিনপুরে মদ খাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না, দু'পয়সা হাতে এলেই গরিব মজুরশ্রেণীর লোকেরা ফুর্তি করে, মদ খায়, শখ-তামাশা ওড়ায়, তারা তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিরবচ্ছিন্ন ঘাটতি ক্ষণিকের আনন্দ-উল্লাসের মাধ্যমেই উসুল করার চেষ্টা করে। আসলে লোকের আপত্তির কারণ অন্য জায়গায়। পাঁচ-ছ'মাস ধরে যে লোকটা বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি, বাড়ি থেকে চিঠি লিখলেও একটা চিঠির জবাব দেয়নি, এতদিন পরে বাড়ি এসে এ রকম একটা কেলেঙ্কারি করা কি তার উচিত হয়েছে? বউটার কষ্ট তো দেখেছে সবাই। লেখাপড়া শিখে বাবু হলে কি ওইরকম হয়!

গৌরসুন্দরের বাড়িতেও খবরটা এসে পৌঁছতে দেরি হলো না। প্রথমে খবরটা এসে পৌঁছল বাসন্তী আর নির্মলার কাছে,তারপর ভৈরবের কানে উঠল। খানিকটা বিরক্তি বোধ করল ভৈরব, সেই সঙ্গে খানিকটা দুঃখও। সাদিনপুরে এসেছিল সিতাব, অথচ সে ভৈরবের সঙ্গে দেখা করেনি, কথাটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না তার। অথচ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গ্রাম থেকে যাওয়ার সময় সিতাবেরসঙ্গে দু'চার জনের দেখা হয়েছে। দু'চারটে কথাবার্তা যে হয়নি, তা নয়, কিন্তু সিতাবকে দেখাচ্ছিল ঠিক পাগলের মতো। ভৈরব বুঝতে পারল, সিতাব মানসিকভাবে অসুস্থ। এই অবস্থায় সে কতটুকু কি করতে পারে? তার পক্ষে সিতাবকে বোঝানো অসম্ভব। যখন-তখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, সে-সময়ও নেই তার। ফুল্লরা বাপের বাড়ি পালিয়েছে, ফিরে আসুক, তারপর দেখা যাবে। ভৈরব গিয়ে সিতাবের বাড়ির ঘরগুলোর দরজায় একটা করে তালা ঝুলিয়ে দিলো।

ঘর-সংসার নিয়ে ভৈরব খুব একটা ভাবে না, সেজন্য দাদা আছে। বলতে গেলে গৌরসুন্দর একাই সংসার সামলাচ্ছে এখনও। ভৈরব আগে টিউশনি করত, কয়েক মাস হলো তা-ও ছেড়ে দিয়েছে, সংগঠনের হোল্ টাইম ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করছে। সেজন্য অল্প কিছু মাসহারা পায়, অবশ্য সংসার-খরচের তুলনায় তা যৎসামান্য। একটা চাকরি-বাকরি না হলে আর চলে না। চাকরি বলতে শিক্ষকতা, অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরির বয়স আর নেই। দু'চারটে স্কুলে ইণ্টারভিউ

দিয়েছিল, হয়নি। শুধু যোগ্যতা নয়, স্কুলে ডোনেশন দেওয়ার সামর্থ্য থাকাটাও দরকার, অনেকটা নিলামের মতো, যে যত বেশি ডোনেট করতে পারে, চাকরির সম্ভাবনা তার তত বেশি। ভৈরবের সে-সামর্থ্য নেই। সঙ্গত কারণে তার কাজও হয়নি। সে-সব ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নেওয়া হয়েছে।

হোল্ টাইম ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে করতে দু'চারটে টিউশনিও যদি করতে পারত, তাহলে অনেকটা সুরাহা হতো। কিন্তু সময় কোথায়? নিত্যদিন মিটিঙ তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে গ্রামে-গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াতে হয়। এতদিন এখানে কৃষকসভার সংগঠন বিশেষ ছিল না। আয়াশের বশীর একক প্রচেষ্টায় খুব একটা কিছু করে উঠতে পারেনি। ভৈরব আসাতে তার সুবিধে হয়েছে। দু'জনে মিলে সংগঠনটাকে মোটামুটি দাঁড় করিয়েছে। তার ফলে দিনের পর দিন কাজও বাড়ছে। ইতিমধ্যে ভাগচাষীদের ক্ষেতমজুরদের নিয়ে দু'চারটি গাঁয়ে আন্দোলনও হয়ে গেছে। জোতদারদের টনক নড়েছে তাতে। ইদানীং আর একটা কাজে হাত দিয়েছে ভৈরব। গ্রামে নাইট-স্কুল খুলেছে। সেখানেও সন্ধ্যেবেলা একটু করে সময় দিতে হয়। কিন্তু তবু এ-কাজটাকে ভৈরব সাংগঠনিক কাজ হিসেবেই গ্রহণ করেছে।

ছকু মোড়লের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে ভৈরব। এখন তার প্রধান শত্রু সাম নয়, সামের সামনে তাকে খানিকটা পিছু হটতে হয়েছে, কারণ সাম এখন সতীদীঘির অর্ধেকের মালিক। সতীদীঘির মামলায় ছকু মোড়লের জিতবার আশা খুব কম। মামলা তুলে নেবে কি-না তাই ভাবছে। সে-তো মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার! হার-জিত আছে। কিন্তু এখন সামনে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে ভৈরব। চাকরি-বাকরি নিয়ে কলকাতায় ছিল, বেশ ছিল। গ্রামে এসে উৎপাত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তার কাছে যেভাবে অপদস্থ হতে হয়েছে, তা সহজে ভুলতে পারবে না ছকু মোড়ল।

ভৈরব যখন প্রথম কলকাতা থেকে ফিরে আসে, তখনই সে ছকু মোড়লকে শাসিয়ে রেখেছিল। বলেছিল, 'দাদার গায়ে হাত তোলে, এত বড় স্পর্ধা! কড়ায়-গণ্ডায় আমি এর শোধ নেবো। ভৈরবকে চেনে না তো। ছকুর নাক দিয়ে ওই রকম রক্ত বার করে ছাড়ব আমি।' তখন অতটা গায়ে মাখেনি ছকু মোড়ল। কিন্তু ক্রমেই ভৈরব একটা ভীতির কারণ হয়ে উঠছিল। গাঁয়ে লাল ঝাণ্ডা ছিল না, ভৈরবই তার বীজ বুনল গাঁয়ে। দু'চারটে চ্যাঙড়াও জুটল তার পেছনে। গাঁয়ের লোকগুলোকে খেপাচ্ছিল। জমির ফসলের ভাগাভাগি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল, মুনিষের মজুরি বাড়াবার কথা বলছিল। প্রথম প্রথম সাম ব্যাটাও ভৈরবের পক্ষে ছিল। বোঝেনি, কিসে কি হয়! আয়াশের বশীর আসত মাঝে মাঝে ভৈরবের কাছে। দু'জনে সলা-পরামর্শ করত। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত দু'জনে। কৃষকসভা না কি, তার মেম্বার করে বেড়াত মানুষকে।

এমনি সময় একদিন আমিন নিয়ে এসে হাজির হলো ভৈরব। ছকু মোড়লেরও

ডাক পড়ল। গোঁসাইডাঙার মাঠের জরিপ হবে। ছকু মোড়ল না গিয়ে পারল না। গিয়ে দেখল, লোকজন কম নেই। গাঁয়ের অনেকেই হাজির সেখানে। অধিকাংশই ভৈরবের পক্ষের লোক। সামও এসেছে। ছকুর পক্ষেরও দু'একজন এসেছে ভৈরবের হয়ে। তাদের মধ্যে শীতল একজন। রামপুরহাট থেকে এসেছেন পরিমল দত্ত, আনন্দ রায়। আয়াশের বশীর এসেছে। সবাই লাল ঝাণ্ডার লোক। আমিন শেকল টেনে জরিপ করে গৌরসুন্দরের অর্ধেক জমি বার করে দিলো ছকুর জমি থেকে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে সীমারেখা চিহ্নিত হলো। দু'টো ছোট ছোট লাল নিশানও গুঁজে দেওয়া হলো জমির দুই মাথায়। ছকু মোড়ল বলল, 'জরিপ ঠিক হয়নি মনে হছে হে। মাপে গোলমাল আছে। ই-জরিপ আমি মানব না।'

গৌরসুন্দর বলল, 'তুমার যদি সন্দ হয় মোড়ল, তুমার যেঞে, নিজের পছন্দ মতুন আমিন এনে মেপে লাও। তুমার ল্যায্য পাওনা হলে জমি বার করে লিও তুমি। মাটি তো আমি তুলে নি যেছি না, কি বোলো!'

'তাহলে আখুন যেমন আছে অমনিই থাকুক। আমি আমিন নি আসি। তারপর ফায়সালা হবে।'

ভৈরব বলল, 'তুমি আমিন নিয়ে এসে মেপে দেখে নিও। গায়ের জোরে জমি চুরি করেছ, তুমার পুরনো আল উড়িয়ে দিয়ে নতুন আল দিচ্ছি, পারলে লেঠেল নিয়ে এসে আল ভেঙে দাও।'

শীতল, জগতকারু, ধনা, চিপতি, হারু, কালীপদ এবং গাঁয়ের আরও কয়েকজন ফুঁসে উঠল, 'চুরি লয়, দিনে ডাকাতি। টাকার গরমে মাটিতে পা পড়ে না, দিনে তারা দেখছে। দে ওর ঠ্যাঙ দু'ট্যাকে ভেঙে।'

আনন্দ রায় দু'হাত তুলে বললেন, 'না না, ঝগড়া করে লাভ নেই। তোমরা থামো।' তারপর শান্ত কণ্ঠে ছকু মোড়লকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখুন, আমরা আপনার ওপর অন্যায় করতে আসিনি। আমাদের মাপে তো এই হলো। আপনার সন্দেহ হলে আপনি অন্য আমিন এনেও জরিপ করে দেখতে পারেন। তাতে ভুল ধরা পড়লে আপনার জমি আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করে দেবো।'

পরিমল দত্ত আমিনকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন গোলাম কাদের, বীরভূমের সবচেয়ে পাকা আমিন। এঁর নাম শুনলে কোনো আমিন আর এখানে আসতে চাইবে না। এঁর জরিপের ওপরে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না।'

ছকু মোড়ল উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আপনার পাকা আমিন থোন্ উথ্যানে। চোখের সামনে দেখছি ভুল জরিপ কোচ্ছে—'

ভৈরব বলল, 'পরিমলদা, ওর সঙ্গে কথা বলবেন না। ও হলো কাল-কেউটের বাচ্ছা। ওর বিষদাঁত কি করে ভাঙতে হয়, আমি জানি।'

তারপরই চার-পাঁচজন লোক কোদাল নিয়ে নেমে পড়ল জমিতে। পুরনো আল

কেটে সমান করে দেবে, নতুন আল উঠবে চিহ্ন বরাবর। ছকু মোড়ল আর দাঁড়াল না। বলল, 'যা খুশি করো তুমরা। মগের মুলুক পেয়্যাছো, অ্যা! গা-র জোর! দিনকে রাত বুঝ্যাছো, বটে! দেখে লিবো, দেখে লিবো কত গা-র জোর—'

রাগে গজগজ করতে করতে ছকু মোড়ল গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। তখন থেকেই তার মনের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রোশ। যেন পারলে ভৈরবটার মুণ্ড কেটে নেয়। কিন্তু উপায় নেই। ভৈরবের মন-ভুলানো কথায় ভুলে গেছে গাঁয়ের অধিকাংশ লোক। সে বুঝতে পারে, সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

দুই

ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু তার ফলাফল মারাত্মক। সাদিনপুরের মানুষের জীবনে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিলো। এক নতুন জীবনের হাতছানি অনুভব করল তারা। ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেই যে শেষ কথা নয়, এটা তারা উপলব্ধি করছে। গৌরসুন্দরের যে-জমি গ্রাস করেছিল ছকু মোড়ল, দিন-দুপুরে সমস্ত লোকের চোখের সামনে, বাধা দিতে যাওয়ার জন্যে গৌরসুন্দরকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল, সেই জমি জোর করে আবার উদ্ধার করে নিলো ভৈরব। ছকু মোড়ল অনেক তর্জন-গর্জন করেছিল, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারল না। বাইরে প্রকাশ না করলেও গাঁয়ের লোক মনে মনে খুব খুশি। এতদিনে ছকু মোড়ল উচিত মতো জবাব পেয়েছে একখানা।

শিবু ক'দিন ভৈরবের পেছনে পেছনে ঘুরল। বলল, 'আমার জমিটুকু উদ্ধার করে দাও ভৈরব। গরিব মানুষ। ছেলেপিলে নি না খেঞে মৈরছি।'

ভৈরব বলল, 'তোমরা বোকামি করবে, না বুঝে-সুজে যেখানে-সেখানে টিপ দেবে, সই-সাবুদ করবে, তার ফল ভোগ করো!'

'কুনু উপায় ছিল না যে বাবা!'

'খুব ছিল। না-হয় না খেয়ে মরতে! এখনি কি এমন দুধে-ভাতে আছ?'

শিবু জবাব দিতে পারে না। মাথা হেঁট করে ভাবে।

ভৈরব বলে, 'আমি দেখব শিবুকাকা। অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নেবো। যদি দেখি, এখনো উপায় আছে, তবে তোমার জমি ঠিক ফিরে পাবে।'

ভৈরবের কাছ থেকে ক্ষীণ আশা নিয়ে যায় শিবু। এক টুকরো জমি নিয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সে। মাথায় ঝাঁকা নিয়ে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে জিনিস ফেরি করতে করতে স্বপ্ন দেখে। কতকাল আগের শুকিয়ে-যাওয়া মরে-যাওয়া স্মৃতি সজীব সতেজ হয়ে ফিরে আসে তার মনে: চন্দনের মতো রেণু রেণু মাটির বুকে গমের বীজ ছড়াচ্ছে সে, ঢলঢল সবুজ পাতা নিয়ে বড় হয়ে উঠছে গাছগুলো,

মুক্তোর মালার মতো সুবিন্যস্ত সবুজ শিষগুলো একসঙ্গে মাথা দোলায়—যেন সাঁওতাল মেয়েরা মাদলের তালে তালে নাচে, কিন্তু শিষগুলোতে আর সোনার রঙ ধরে না, মুহূর্তে সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, শিবু সভয়ে দেখে, সবুজ গমগাছ-গুলো কাস্তে দিয়ে কচকচ করে কাটছে কয়েকজন, ছকু মোড়ল আলের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করছে, তাড়াতাড়ি হাত চালাতে বলছে তাদের।

একদিন ভৈরব শিবুর বাড়িতে এসে খারাপ খবরটা শোনাল। বলল, 'অফিসে গিয়েছিলাম শিবুকাকা। কিচ্ছু করার নেই। তোমার সবটুকু জমিই রেজেস্ট্রী করে নিয়েছে ছকু।'

সে-কথা কি শিবু ভাবেনি? ভেবেছিল। জমি রেজেস্ট্রী করে না নিলে ছকু অত জোর দেখাতে পারে!

ভৈরব বলল, 'দোষ তোমাদের নয়, তোমাদের অবস্থারও নয় শিবুকাকা। দোষ হলো তোমাদের অশিক্ষার। আমি গাঁয়ে স্কুল খুলব, নাইট-স্কুল, বড়রা পড়বে সেখানে। লেখাপড়া শিখবে। কাজকর্মের কোনো অসুবিধে হবে না তোমাদের, রাত্রে স্কুল হবে। পড়ার জন্যে মাস্টারকে পয়সাও দিতে হবে না। আমি নিজেই পড়াব। দেবুও কথা দিয়েছে, এক-আধটু সাহায্য করবে ও।'

শিবু হতাশ কণ্ঠে বলে, 'লেখাপড়া শিখলে আমি কি আমার জমি আর ফেরত পাবো ভৈরব?'

'না, জমি আর ফেরত পাবে না শিবুকাকা। কিন্তু এটাই তো শেষ নয়। ছকু মোড়ল সাম মোড়ল ওৎ পেতে আছে। যতক্ষণ তুমি চিতেয় না উঠবে, ততক্ষণ তারা ছাড়বে না তোমায়। লেখাপড়া না শিখলে ওদের ফন্দি-ফিকিরগুলো বুঝতে পারবে না। তাছাড়া, তুমি ব্যবসা করছ, একটু লিখতে পড়তে শিখলে সেটা তোমার কাজে লাগবে।'

সেই নাইট-স্কুল খোলা হয়েছিল গাঁয়ে। প্রাইমারি স্কুলের বারান্দাটাকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ছাত্রও জুটেছে কিছু। বুড়ো ছাত্র সব। স্কুল কে স্কুল, আড্ডাখানা কে আড্ডাখানা। বই আর হুঁকো নিয়ে স্কুলে যায় ছাত্ররা। জমি-জেরাত চাষবাসের গল্প চলে, আবার পড়াশোনাও হয়। ভৈরবের সিগারেট খাওয়া দেখে কেউ বলে, 'তুমার সাদা বিড়ি একটান দাও হে মাস্টার। টেনে দেখি।' ভৈরব একটা আস্ত সিগারেট বার করে দেয় প্যাকেট থেকে। একটান দু'টান করে ছাত্ররা পালা করে খায়। যাদের আগে থেকে একটু অক্ষর পরিচয় ছিল, তারা উঁচু মানের বই পড়ে। শীতল জগতকাকুর বয়স সবচেয়ে কম, কিন্তু ওরা পড়ে সবচেয়ে ওপরে। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে ওরা পড়েছিল কিছুদিন।

দেবু উৎসাহী ছেলে। কলেজে পড়ে। নিজের পড়াশুনো আছে, তবু মাঝে মাঝে আসে। ভৈরবকে সাহায্য করে। কখনো কখনো নিজের বইপত্রও নিয়ে আসে

হাতে করে। ভৈরবের কাছে এক-আধটু দেখিয়ে নেয়। মোট কথা, আনন্দ-হাসি-গল্পগুজবে বেশ লেখাপড়া চলে তাদের।

হঠাৎ এই সময়েই দেখা দিলো দেশের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। বাঙলার আকাশে-বাতাসে যখন শুরু হয়েছে আগমনী সুরের মূর্ছনা, নীল আকাশের বুকে দেখা দিয়েছে তুষার-শুভ্র মেঘের আনাগোনা, শিউলি ফুলের সুমধুর গন্ধে বাতাস ম ম করছে, শস্য-শ্যামল প্রান্তরে শুভ্র কাশগুচ্ছ মাথা দোলাচ্ছে, আসন্ন উৎসবের আমেজ বাঙলার ঘরে ঘরে, ঠিক তখনই পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে বসল। জম্মুতে ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানী সৈন্য। এই তো কিছুদিন আগে চীনের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় নামতে হয়েছিল ভারতকে, তার ক্ষত শুকোতে না-শুকোতেই আবার একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলো তার ওপর। এর পেছনে চীনের যে প্ররোচনা আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে চীন হয়তো এই যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতেও কসুর করবে না। ভুট্টোর সঙ্গে চীনের কর্তাদের খুব দহরম মহরম। যুদ্ধে পাকিস্তানকে প্ররোচিত করতে বৃহৎ শক্তিগুলিরও প্রশ্রয় আছে। গিলগিটে সামরিক ঘাঁটি গড়তে দেওয়ার টোপ দিয়ে পাকিস্তান আমেরিকাকে নাচাচ্ছে, সেই লোভে আমেরিকা অঢেল অস্ত্র সরবরাহ করছে পাকিস্তানকে। গিলগিটে একবার ঘাঁটি গেড়ে বসতে পারলে প্রাচ্যের দেশগুলোকে সে হাতের মুঠোয় পাবে, বিশেষ করে কামানের নাগালের মধ্যে পাবে কমিউনিস্ট দেশ রাশিয়া ও চীন উভয়কেই। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে তার। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছে, ফলে দু'হাতে সাহায্য করতে হচ্ছে তাকে, যাতে সে গিলগিটে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়তে না দেয়। পাকিস্তান আধুনিক রণসম্ভারে ফুলে ফেঁপে উঠছে, আর ততই তার অহমিকা বাড়ছে, সীমাহীন হয়ে উঠছে তার স্পর্ধা। কিন্তু ভারত এখন আর বাষট্টি সালের ভারত নয়, এখন সে যথেষ্ট শক্তিশালী, তার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা অনেক সুসংহত। দেশের দরিদ্র মানুষ দেশকে রক্ষা করার জন্যে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্যে এগিয়ে এসেছে, বাষট্টি সালে যেখানে প্রতিরক্ষা-খাতে ব্যয় ছিল তিনশো কোটি টাকা, বর্তমানে সেখানে আটশো কোটি টাকা। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে যে ভুল করেছে, সেটা খুব শীগ্‌গীরই টের পাবে সে।

এখন নাইট-স্কুলে পড়াশোনার চেয়ে এই সব আলোচনাই হয় বেশি। একখানা বাঙলা খবরের কাগজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোজ বিকেলবেলা কাগজ এসে পৌঁছয়। সন্ধ্যে হতে না-হতেই ভিড় জমে যায় স্কুলের বারান্দায়। যারা ছাত্র নয়, তারাও অনেকে আসে খবর শোনার জন্যে। দেবু কাগজ পড়ে শোনায় সবাইকে। খবর পড়ার পর আলোচনা শুরু হয়। হুঁকো আর বিড়ির ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে মজলিস।

কেউ বলে 'এই সময় নেহেরু থাকলে—'

দেবু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, 'শাস্ত্রিজী কম কিসে? দেখতে বেঁটে, ছোট-খাটো মানুষ, কিন্তু খুব কড়া ধাতের লোক। আজ আমাদের প্রফেসর বলছিলেন —পাকিস্তানকে এবার ভালোরকম শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে দেখো। লালবাহাদুর শাস্ত্রী নেহেরুর মতো অতটা নরম মনের মানুষ নন।'

দিন চার-পাঁচেক পরেই দেবুর কথার সত্যতা আংশিক প্রমাণিত হলো। ভারত পালটা আঘাত হানল লাহোরে, শিয়ালকোটে। আর তারপরই কচ্ছের রান অঞ্চলে। লাহোর তো এখন প্রায় ভারতের সৈন্যবাহিনীর হাতের মুঠোয়। ইছোগিল ক্যানেল পেরিয়ে ভারতীয় সৈন্য লাহোরের একেবারে দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই লাহোর দখল করে নেবে।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোনো আপোস নয়, পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

চীন-ভারত যুদ্ধে সাদিনপুরের লোকেরা মুষড়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন তাদের মন উদ্দীপনায় ভরপুর। খবর শুনতে শুনতে তাদের শরীরের রক্ত চনমন করে ওঠে।

সেদিন রাত্রে খবর পড়া শেষ করে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে রইল দেবু। যুদ্ধের খবরে এখন তার আর আগেকার মতো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় না। খবর পড়ে, কিন্তু নিতান্তই প্রাণহীন কণ্ঠস্বরে। একে একে প্রায় সবাই চলে গেলে দেবু জিজ্ঞেস করল, 'এ-খবর কি সবই মিথ্যে ছোড়দা?'

ভৈরব বিস্মিত চোখে দেবুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'গতকাল স্টেট্‌স্‌ম্যানে লিখেছে, এ পর্যন্ত ভারত আর পাকিস্তান পরস্পরের ক্ষয়ক্ষতির যা হিসেব দিয়েছে, তা যোগ করলে না-কি দু'দেশের মোট ট্যাঙ্ক আর বিমানবাহিনীর দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়!'

ভৈরব হাসল। বলল, 'যুদ্ধের সময় সঠিক খবর কি পাওয়া যায়? দেশের মানুষের মনোবল অটুট রাখারও তো দরকার আছে!'

'তাহলে এসব খবর পড়ে কি লাভ?'

'ওরই ভেতর দিয়ে কিছুটা জানা যায়।'

জানা গেলো। কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, যা-ই ঘটুক না কেন, আমরা আর অস্ত্র-সংবরণ করছিনে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার বাইশ দিনের মাথায় ভারত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। যে দাবি-দাওয়া নিয়ে যুদ্ধ, পরে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সে-সবের মীমাংসা হবে। উভয় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে রাশিয়া।

যুদ্ধ-বিরতিতে স্বস্তি বোধ করেছে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই। কিন্তু একটা মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেলো দেবুর —সকলে সর্বদা সত্য কথা বলে না। হিসেব-নিকেশে দেখা গেলো, কচ্ছের রান অঞ্চলের অনেকখানি জায়গা পাকিস্তান জবরদখল করে নিয়ে বসে আছে।

তিন

সাদিনপুর ছাড়া ফুল্লরার আর কোথাও ঠাঁই নেই। তাই মাস দু'য়েক পরে তাকে আবার ফিরে আসতে হলো সাদিনপুরেই। বাপ-মায়ের স্নেহটুকু ছাড়া মেয়েদের যে আর কিছুই দাবি করার থাকে না, সমস্ত দাবি ছেলেদের। এনন কি মেয়েরা অসহায় হয়ে পড়লেও শৈশবের মধুর স্মৃতি-বিজড়িত পিতৃগৃহে বাকি জীবনটুকুর জন্যে আশ্রয় পাওয়াও দুর্লভ হয়ে ওঠে তাদের কাছে, যদিও-বা আশ্রয় জোটে, উপেক্ষার অন্ন তাদের দিনের পর দিন গলাধঃকরণ করতে হয়। ফুল্লরা তা দু'মাসেই টের পেয়েছিল। তাই মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে যে-ঘর ছেড়ে সে পালিয়েছিল, সেই ঘরেই আবার ফিরে আসতে হলো তাকে। এসে দেখল, দরজায় তালা ঝুলছে। প্রথমে ভেবেছিল, সিতাবই বুঝি ঘরে তালা দিয়ে গেছে। কিন্তু পাড়া-পড়শীর কাছে জানতে পারল, তালা দিয়েছে ভৈরব।

অগত্যা গৌরসুন্দরের বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল ফুল্লরা। কিন্তু সেখানে গিয়ে দুর্ভাবনা বেড়ে গেলো আরও। ভৈরব বলল, 'পাগলাটা সেদিন সেই সকালেই চলে গেছে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি। যদি একটু খবর পেতাম, গিয়ে ধরতাম ওকে। তুমিও যদি আমায় একটু খবর দিতে!'

ফুল্লরা বলল, 'কি বুল্‌বো বট্‌ঠাকুর, বুলতেও নজ্জা লাগে। গতরে মানুষের চামড়া, কিন্তু জন্তু-জানোয়ারও ওর থেকে ভালো।'

'তোমরা কেউ নেই, ঘরদোর ফাঁকা পড়ে আছে, তাই দেখে আমি আবার গিয়ে দরজায় তালা দিয়ে এলাম। এই নাও, চাবি নিয়ে যাও।'

ফুল্লরা চাবি দু'টো হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল। ভৈরব বুঝতে পারল ফুল্লরা কি জানতে চায়। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। তাই নিজে থেকেই বলল ভৈরব, 'এ দু'মাস টাকাকড়ি কিছু পাঠায়নি সিতু। চিঠিও দেয়নি।'

চমকে মুখ তুলে তাকাল ফুল্লরা। মুখখানি বিবর্ণ, ফ্যাকাশে।

নির্মলা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল,'সিতু ঠাকুরপো দিন-দিন যে কি হচ্ছে, বুঝতে পারিনে। অত ভালো ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি-বাকরি করছে, অথচ এ রকম ব্যবহার! তুমি একদিন যাও তো, গিয়ে বেশ করে কথা শুনিয়ে দিয়ে এসো।'

ভৈরব বলল, 'যাবো। বৌ-মা তো এখানে ছিল না, নইলে আগেই যেতাম।'

ফুল্লরার চোখ দু'টো অশ্রুসজল হয়ে উঠল। ধরা গলায় বলল, 'আমি সাধে পালাইনি বট্‌ঠাকুর। অমন হেনস্তা সইহ্য কৈর্‌তে পারে মানুষ? কিন্তু কি কৈর্‌বো, উথ্যানেও জায়গা নাই আমার কপালে। জান দিয়্যা ছাড়া আমার আর কুনু গতি নাই।'

ভৈরব হাসল। বেশ জোরেই হেসে উঠল। বলল, 'ওটা তো সোজা রাস্তা, যে কেউ পারে। ওতে আর বাহাদুরি কি আছে?'

'তুমিই বোলো, আমার আর কি চারা আছে ?'

'ভয় নেই বৌ-মা, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। আমি আছি, এতগুলো মানুষ আছে, তোমার ভয় কিসের ? তাছাড়া, আমি যাচ্ছি, দু'চারদিনের মধ্যেই যাবো। গাধাটা ভেবেছে কি ? যা খুশি তাই করবে ?'

গৌরসুন্দরের বাড়ি থেকে আসার সময় বাসন্তী বলল, 'আজ এথ্যানেই খাবা বৌ-মা। ই-বেলা রাঁধাবাড়া করে কাজ নাই। আথুন যাও, ঘরদোর সামলাও, একটুকুন পরে সুধা ডেকে নি আসবে।'

তা যাচ্ছি যাচ্ছি করেও আরও দশ-বারোদিন দেরি হলো ভৈরবের। এদিকে ফুল্লরার দিন গুজরান করার সম্বল ফুরিয়ে আসছে। একটা মাটির ভাঁড়ে ক'টা টাকা অবশিষ্ট ছিল, ফিরে এসে দেখে, টাকাগুলো তেমনিই রয়েছে, সিতাব হাত দেয়নি। কিন্তু ওই ক'টাকায় আর ক'দিনই বা চলবে! দিন-দিন টাকাগুলো শেষ হয়ে আসে, আর ফুল্লরা দু'চোখে অন্ধকার দেখে। ইতিমধ্যে দু'তিনবার ভৈরবকে তাগাদা দিয়েছে বাতাসপুর যাওয়ার জন্যে।

অবশেষে ভৈরব একদিন গেলো সিতাবের খোঁজ নিতে। কিন্তু ফিরে এলো দুঃসংবাদ নিয়ে। ফুল্লরার কাছে তা ভীষণ মর্মান্তিক। কি করে কথাটা ফুল্লরার কাছে পাড়বে, ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিল ভৈরব। অথচ না বলেও উপায় ছিল না।

সিতাব বাতাসপুরে নেই। কয়েকদিন আগে চাকরি গেছে তার। যুদ্ধকালীন সঙ্কটে সরকার যে প্রশাসনিক ব্যয়ভার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার বলি হয়েছে হাজার হাজার কর্মচারী, অস্থায়ী কর্মচারী। দেশের সঙ্কটাপন্ন অর্থনৈতিক অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্যে মাথাভারী প্রশাসনকে হালকা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু পকেটভারী আমলারা ঠিকই আছেন, কোটিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থেও হস্তক্ষেপ করা হয়নি, বাজারের কোটি কোটি কালো টাকার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। সরকারের নজর পড়েছে ছিটে-ফোঁটা বেতন পায় যেসব শ্রমিক কর্মচারী, তাদের ওপর। সিতাব তাদেরই একজন।

বাতাসপুর গিয়ে জাবেদ আলির কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল ভৈরব। চাকরি যাওয়ার পর মাত্র দিন দু'য়েক বাতাসপুরে ছিল সিতাব। ঘর থেকে বেরোতো না। তারপর শ্রীরামপুর গিয়েছিল তার কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। আর ফেরেনি। ওর ঘরে জিনিসপত্র যেমন ছিল, তেমনিই পড়ে আছে।

ভৈরব জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি আছে ঘরে ?'

জাবেদ আলি জবাব দিয়েছিল, 'কি আর থাকবে! বিছানাপত্তর, থালা-বাসন, একটা কুকার আর টিনের বাক্স। ক'খানা বইপত্রও আছে। টাকা-পয়সা আছে কি-না জানি না। গত মাসের ক'টা দিনের মাইনে পাবে ও। তা-ও নিতে আসেনি, টাকাটা অমনিই রয়েছে।'

ভৈরব বাতাসপুর থেকেই পরের ট্রেনে শ্রীরামপুর গিয়েছিল। ব্যাপারটার

একেবারে হেস্তনেস্ত করে ফিরতে চায় সে, বারবার আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভবতোষবাবুকে খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। বললেন, 'হুঁ, সিতু এসেছিল। চাকরির ব্যাপারে কিছু করা যায় কি-না, তাই জানতে। কিন্তু একা তো সিতুর নয়, শত শত লোকের চাকরি গেছে, এটা এখন আমাদের কাছে ভীষণ সমস্যা। ইউনিয়ন চেষ্টা-চরিত্র করছে। কিন্তু কতটুকু কি করতে পারবে, বলা মুশকিল। বুঝতেই পারছেন, যুদ্ধ-কালীন অবস্থা—'

ভৈরবকে যথেষ্ট খাতির করে বসিয়ে চা খাইয়েছিলেন ভবতোষবাবু। সিতাব বাড়ি যায়নি শুনে তিনি অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ছেলেটা খুব ভালো। পড়াশুনোও করছিল। এতটা বয়সে নতুন করে পড়াশুনো শুরু করে অমন ভালো রেজাল্ট করাটা সোজা নয়। সুযোগ-সুবিধে পেলে উন্নতি করত ছেলেটা।'

ভৈরব জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় যাচ্ছে, কিছু বলে গেছে?'

'না না, কিচ্ছু বলেনি। আমি তো ওকে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। বললাম— তোমার কাকীমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। কিন্তু বাসায় ফিরে শুনি, সিতু যায়নি।'

সিতাব হারিয়ে গেছে। পৃথিবীর জনাকীর্ণ ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে সিতাব, খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা কি করে ফুল্লরাকে জানাবে, ভৈরব সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছিল। কিন্তু না বলেও উপায় ছিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল সে। পরদিন সকালবেলা গেলো ফুল্লরাকে খবর দিতে। ফুল্লরা তখন উঠোনে ছড়া দিচ্ছিল। ভৈরব যেতেই হাত দু'খানা ধুয়ে মাথায় আঁচল টেনে দিলো সে। তারপর একটা মোড়া পেতে দিলো বসতে।

ভৈরব বসল। কিন্তু সহসা কথা বলতে পারল না। ফুল্লরা বারবার ভৈরবের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। অবশেষে দাওয়ার একপাশে পা ঝুলিয়ে বসল সে। জিজ্ঞেস করল, 'দেখা হৈল্‌ছিলো বট্‌ঠাকুর?'

ভৈরব বলল, 'হুঁ। না, ঠিক দেখা হয়নি। তবে খবর পেয়েছি।' কথাটা বলে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে। কিভাবে কথাটা পাড়বে, ঠিক করতে পারছিল না। ফুল্লরা দুঃসংবাদ শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইল।

একটু থেমে ভৈরব বলল,'তাইতো ভাবছিলাম, সিতু তো এ রকম করতে পারে না, কথার খেলাপ করার মতো ছেলে ও নয়। যে যাই বলুক, আমি তো চিনি ওকে। আসলে, গত মাসেই ওর চাকরিটা চলে গেছে। ছাঁটাই হয়ে গেছে। কি করে টাকা পাঠাবে!'

ফুল্লরা বিস্ময়-বিমূঢ়। অস্ফুটস্বরে বলল, 'চাকরি নাই?'

'হুঁ, শুধু ওর নয়। হাজার হাজার লোকের।'

ফুল্লরা হতবাক। সিতাব যে বলত, 'ই-চাকরি হলো গবৃমেণ্টের চাকরি। জলেও ডুবে না, আগুনেও পুড়ে না। তুমার জান জুড়্যাবে কি করে?' তা সিতাবের সেই অমন চাকরিও চলে গেলো! ফুল্লরার জান জুড়ানোর বদলে সারা

মন হাহাকার করে উঠছে কেন? চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠছে কেন? গলার কাছে কান্না যেন দলা পাকিয়ে আটকে আছে ফুল্লরার।

ভৈরব মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করল, 'চাকরি নাই, তাহলে ঘর এলো না ক্যানে বট্‌ঠাকুর? কি কোচ্ছে?'

ভৈরব বলল, 'কাজের জন্যেই চেষ্টা করছে। ওর সঙ্গে তো দেখা হয়নি। ভবতোষবাবু, মানে সাদিনপুরে যিনি টিকিটবাবু ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সিতাব ওখানে গিয়েছিল। তিনিও ওকে বাড়ি আসতে বলেছিলেন। কিন্তু একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় না করে ও না-কি বাড়ি আসবে না।'

ভৈরবের পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল ফুল্লরা। ভৈরব বলেছিল, 'কিচ্ছু ভেবো না তুমি। সিতু যদ্দিন না আসে, আমরা রয়েছি। কোনো কিছু অসুবিধে হলেই জানাবে। আমিও আসব মাঝে মাঝে, খবর নেবো।'

ভৈরব চলে গেলে সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিলো ফুল্লরা। তারপর নিজেকে সংবরণ করে দাওয়া পর্যন্ত সে আর আসতে পারল না, ডুকরে কেঁদে উঠল। এতদিনে ফুল্লরা নিজেকে পৃথিবীতে একেবারে নিরাশ্রয় বোধ করল। সেদিন উনুনে হাঁড়ি চড়ল না, সারাদিন জলটুকুও স্পর্শ করল না সে।

চার

ভৈরবের স্কুলে এখন ছাত্রসংখ্যা চোদ্দ-পনেরোজন। অধিকাংশই ক্ষেতমজুর। কারোর কারোর দু'এক বিঘে জমি আছে। ছাত্ররা ছাড়াও আরও দু'চারজন আসে আড্ডা দিতে। আগে প্রাইমারি স্কুলের বারান্দাটায় স্কুল বসত। গাঁয়ের এক টেরে স্কুল বলে সেখানে ছাত্ররা ছাড়া অন্যরা বিশেষ কেউ যেত না। কিন্তু এখন স্কুল উঠে এসেছে সিতাবের বাড়িতে। একদিন প্রচণ্ড ঝড়ে স্কুলের খড়ের চাল উড়ে গিয়েছিল, জলে-কাদায় একাকার হয়ে গিয়েছিল স্কুলের ঘরের মেঝে বারান্দা। কয়েকদিন সেখানে স্কুল বসা সম্ভব ছিল না। তাই ভৈরব তার নাইট-স্কুল সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করেছিল সিতাবের বাড়িতে। অবশ্য ফুল্লরার অনুমতি নিয়েই। তারপর স্থায়ী স্কুল হয়ে গেছে ওটাই।

সিতাবের বাড়িতে স্কুল স্থানান্তরিত করার পেছনে ভৈরবের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ফুল্লরা অন্তঃসত্ত্বা। অথচ বড় নিঃসঙ্গ। বাড়িতে স্কুল বসলে সন্ধ্যেবেলাটা তবু কিছুক্ষণ পাঁচজনের গল্প-গুজবে আনন্দ-হাসিতে বাড়িটা মুখর হয়ে থাকবে। ফুল্লরার নিঃসঙ্গতা কাটবে খানিকটা। দিনের বেলা তবু সে বেশ থাকে। এর-ওর বাড়িতে কাজ করে। মুড়ি ভাজা, ধান সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে ধান-ভানা —গেরস্থবাড়ির এইসব কাজ। সবই মেহনতের কাজ। কিন্তু না করেও তো

উপায় নেই। ভৈরব কখনো কখনো দু'পাঁচ টাকা দেয়। ধার বলেই দেয়। সিতাব এলে হিসেব-নিকেশ হবে। প্রকারান্তরে সেটা সাহায্যই। বেশি সাহায্য করা তো তার পক্ষেও সম্ভব নয়। ফুল্লরার আত্মমর্যাদা বড় প্রখর। সহজে নিতে চায় না। ভৈরব জোর-জবরদস্তি দেয়, কিন্তু সেটুকু হাত পেতে নিতে তার যে বড় সঙ্কোচ হয়, সেটা বুঝতে পারে ভৈরব।

স্কুল চালানোর ব্যাপারে দেবুকে পেয়ে খানিকটা সুবিধে হয়েছে ভৈরবের। ছাত্র পরিষদের সদস্য সে। এখনও ছাত্রপরিষদ করে। লাল ঝাণ্ডার লোকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট বিরোধ। তবু ছেলেটা বেশ আদর্শবাদী। গ্রামের নিরক্ষর লোকগুলোকে সাক্ষর করে তোলার যে পরিকল্পনা, তাতে এক-আধটু সাহায্য করার জন্যে দেবুকে অনুরোধ করেছিল ভৈরব। দেবু সাগ্রহে রাজি হয়েছিল। তারপর সাদিনপুরে এবং আশপাশের গ্রামগুলোতে কৃষকসভার সংগঠন মজবুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লোকের অসন্তোষ বেড়েছে। ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। ভৈরবের প্রতি তাদের আক্রোশ বাড়ছে ক্রমাগত। গঙ্গাচরণ ঘোষ নিতান্তই ভালোমানুষ, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না। তিনি ভাইপোকে ভৈরবের সঙ্গে খুব বেশি মেলা-মেশা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু দেবু শোনেনি। বলেছিল, 'লোকগুলো যদি এক-আধটু লেখাপড়া শেখে, সেটা তো ভালোই। এর সঙ্গে লাল ঝাণ্ডার সম্পর্ক কি?' এ-অঞ্চলের এম. এল. এ. রামলাল ভকত, প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী কমল হাজরার কানেও কথা উঠেছে। তাঁরাও দেবুকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেবুর ভাবনা-চিন্তা খুব পরিষ্কার। লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের কার্যকলাপের সঙ্গে নিরক্ষর লোকগুলোকে লেখাপড়া শেখানোটাকে সে এক করে দেখতে রাজি নয়। তাই এখনও সে নিয়মিত স্কুলে আসে। বুড়ো বুড়ো ছাত্রদের স্লেটের ওপর অ-আ-ক-খ লেখানোর চেষ্টা করে।

ভৈরব সবই জানে। দেবুর মুখ থেকেই শুনেছে কিছু কিছু। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবুর যে এই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, তাতে তার মনখানা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

এখন ছাত্ররা আর বইপত্র বাড়ি নিয়ে যায় না। সিতাবের বাড়িতেই রেখে যায়। দিনমান তো আর পড়াশোনার সময় হয় না। কাজকর্ম আছে। ক্ষেত খামারের কাজ না থাকলে অন্য ধান্দায় ব্যস্ত থাকতে হয়। পড়াশোনার সময় বলতে ওই সন্ধেবেলাটুকুই। হাতে হুঁকো আর লণ্ঠন নিয়ে পড়তে আসে ওরা। যারা বিড়ি খায়, তারা পকেটে করে বিড়ি নিয়ে আসে। ধূমপান চলে, চাষ-বাস ঘর-সংসার নিয়ে গল্প-গুজব হয়, আর সেই সঙ্গে পড়াশোনাও চলে। ফুল্লরা একপাশে বসে বসে ওদের পড়াশোনা দেখে, গল্প জমে উঠলে শ্রোতাদের দলে ভিড়ে যায়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ছাত্রদের মুখের হাসি ম্লান হয়ে আসে। মুখে হাসি থাকে কি করে? ধান রোয়ার কাজ শেষ হলে তাদের তো আর কাজ জোটে না। এক-আধটু নিড়ানির কাজ, তারও নামমাত্র মজুরি। নিড়ানির কাজ শেষ হলে একেবারেই

কর্মহীন হয়ে পড়ে তারা। তখন ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাড়ুজ্যেরা কবে মরাই খুলে দেবে, দাতাকর্ণের মতো গরিব লোকদের ধান বিলোবে, সেই আশায় দিন গোনে। মুনিষ খেটে সংসার চালাতে হয় যাদের, দিন-মজুরিই যাদের একমাত্র ভরসা, তাদের কাছে এই দিনগুলি বড় নিষ্ঠুর। পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণা থাকলে মুখে হাসি ফোটে না। তাদের অনাহারক্লিষ্ট শুকনো মুখের দিকে চেয়ে ভৈরবের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অভাবের জ্বালা সে বোঝে। কর্মহীন জীবনের বিড়ম্বনার এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে। জানে, খিদে কিরকম কষ্ট দেয়, টাকা-পয়সা না থাকলে নিজের কিংবা আপনজনের অসুখে-বিসুখে মানুষ কিরকম অসহায় হয়ে পড়ে।

এবার গ্রামের মোড়লেরা ভৈরবের পক্ষের লোকজনকে ধান দেয়নি। দিয়েছে দু'একজনকে, সেটা তাদের ভেদ-নীতি, পক্ষে টানার চেষ্টা। ঘটনাটি ঘটেছে সামান্য একটি কারণে। মোংলা কামারের বউ শয্যাশায়ী। দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিল। ভালো ডাক্তার দেখানোর সাধ্যি নেই মোংলার। এক গাদা তাবিজ মাদুলি পরিয়েও কোনো ফল হয়নি। এখন বিছানা নিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা স্কুলে পড়াতে যাওয়ার সময় ভৈরব তার খোঁজ নিচ্ছিল। ভালো নেই। বাঁচবার আশা খুব ক্ষীণ। ভৈরব বলেছিল, 'তা একটা ভালো ডাক্তার দেখাও না মামা!'

মোংলা তার কামারশালে লোহার টুকরোগুলো একপাশে গোছগাছ করে সরিয়ে রাখছিল। কাপড়ের খুঁটে হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'পেটের ভাতই জুটে না ছোটবাবু, ভালো ডাক্তোর দেখাব কোত্থেকে! সারাদিন হাতুড়ি পিটাই, সব মুফতের কাজ।'

ভিনগাঁয়ের কাজ হলে তবু দু'চার পয়সা পায় মোংলা, কিন্তু গাঁয়ের কাজ বিনা পয়সায় করতে হয় তাকে। মাঠের ধান উঠলে তোলা পায় গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে। এক আড়ি আধ আড়ি করে ধান দেয় সবাই। কিন্তু তা আর কতটা! তার বিনিময়ে গাঁয়ের সকলে সারা বৎসর খাটিয়ে নেয় তাকে। গরুর গাড়ির চাকায় হাল লাগানো, লাঙলে ফাল লাগানো, বঁটি-দা-কাটারি শানানো, কাস্তে কোটানো, সবই করতে হয় তাকে।

ভৈরব বলে, 'তুমি বিনি পয়সায় কাজ করো কেন মামা?'

'না কৈরলে লোকে শুনবে ক্যানে! তুলা ছ্যায়, কাজ করিয়ে লিবে না?'

'তোলা নেওয়া বন্ধ করে দাও তুমি। নগদ পয়সায় কারবার করো।'

'ইটা যে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আস্ছে ছোটবাবু!'

'বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসছে বলে তোমাকেও করে যেতে হবে? সে-সব একদিন ছিল, মানুষ এত স্বার্থপর ছিল না। তাদের দায়িত্ববোধও ছিল। কামার কামারের কাজ করত, ছুতোর ছুতোরের কাজ করত, ঘরামি ঘরামির কাজ করত, গাঁয়ের পাঁচজনে তাদের ভরণ-পোষণের খরচ যোগাত। তাদের আপদ-

বিপদে সাহয্যে করত। তা তোমার বাড়িতে অসুখ, মোড়লদের কাছে গিয়ে বলো। ওষুধ-পথ্যের খরচ দিক তারা। দেবে? দেবে না কেন, দেবে সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে। তোমার ভিটেটুকু গ্রাস করার জন্যে। অথচ কোন কালে এক আড়ি ধান দিয়েছে, সেজন্যে তোমার ছেলেপিলে না খেয়ে মরলেও তোমায় বিনি পয়সায় কাজ করে যেতে হবে সারা বছর?'

'তাই তো ভাবি ছোটবাবু। যার পাঁচ বিঘ্যা জমি, সে আধ আড়ি ধান দ্যায়, যার একশো বিঘ্যা জমি, সে দ্যায় দু'আড়ি। ইটা কিরকম বিচ্যার বোলো?'

'না, তুমি তোলা নিও না আর। কাল থেকেই নগদে কাজ শুরু করো। কাজ করে দেবে, পয়সা নেবে, ব্যস্।'

মোংলার মনে কথাগুলো ধরে। পরদিন থেকেই তার মেজাজ চড়ে যায় সপ্তমে। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। নগদ পয়সা নিয়ে এসো, তবেই হাপরের দড়ি টানবে সে, হাতুড়ির বাঁট ধরবে। ক'দিন একটু চেঁচামেচি হলো। ভৈরব গাঁয়ের অনেককেই বোঝাল। যাদের অল্প-স্বল্প জমিজমা, কালে-কস্মিনে কাজ পড়ে কামারের কাছে, তারা বিশেষ আপত্তি করল না। কিন্তু এই নিয়ে একদিন ভীষণ হৈ-হট্টগোল হয়ে গেলো মোংলার কামারশালে। ছকু মোড়লের মাহিন্দার সিধু এসেছিল গরুর গাড়ির চাকায় হাল লাগাতে। মোংলা সাফ জানিয়ে দিলো, 'পয়সা নি আয় সিধ্যা। চাকা পিছু আট আনা।'

সিধু গাড়ির চাকা রেখেই মোড়লকে খবর দিতে গেলো। ছকু মোড়ল কথাটা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। ছোটলোকের এত বড় স্পর্ধা! তোলা খাবে, আবার এদিকে নগদ পয়সা চায়? ছকু মোড়ল তক্ষুনি মোংলার কাছে এলো। বলল, 'পয়সা চাইছিস কিরকম?'

মোংলা কামার তেমনি মেজাজ নিয়েই বলল, 'বিনি পয়সায় আর কাজ কৈর্‌বো না মোড়ল।'

'বিনি পয়সায়? আর তুলা খায় কুন হারামজাদা?'

'গাল দিও না মোড়ল, বুলে দিল্যাম। কত তুলা দাও তুমি? ওই পাল মশাই সাত বিঘ্যাতে এক আড়ি দ্যায়, তুমি একশো বিঘ্যাতে দাও দু'আড়ি। সুমান হলো? দু'আড়ি ধানে তুমার একশো বিঘ্যা জোতের সব কাজ সারা বছর কৈর্‌তে হবে, ইটা ল্যায্য বিচ্যার?'

'সাপের পাঁচ পা দেখ্যাছিস, অ্যাঁ? তোর বাপ-দাদা করে এলো চিরকাল, তু কৈর্‌বি না? হারামজাদার ভিট্যায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।'

'ভিট্যা তুমার বাপের?'

'কি বুল্‌লি? কি বুল্‌লি হারামজাদা? ছোটলোক!'

'তুমার তুলা খাবো না, বিনি পয়সায় তুমার কাজও কৈর্‌বো না, হুঁ বুলে দিল্যাম। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। কাজ করাতে চাও তো পয়সা ফ্যালো।'

রাগের মাথায় ছকু মোড়ল হয়তো মেরেই বসত মোংলাকে, কিন্তু পাঁচজন জড়ো হয়েছিল, ছকু মোড়লকে নিরস্ত করল তারা। রাগে গজগজ করতে করতে ফিরে গেলো ছকু মোড়ল —'দেখে লিবো। দেখে লিবো তোকে হারামজাদা। এত বুকের পাটা তোর? সাপের পাঁচ পা দেখ্যাছিস?'

ছকু মোড়লের সব রাগ গিয়ে পড়ে ভৈরবের ওপর। আপনার মনেই গালাগাল দেয় ভৈরবকে। গাঁয়ের লোকগুলোকে খেপাচ্ছে। লেখাপড়া শেখাচ্ছে শেখাক, কিন্তু তাই বলে ছোটলোকগুলো এমনি করে মাথায় চড়ে বসবে? মনে মনে শিহরিত হয় সাম মোড়লও। অবশেষে পঞ্চায়েত ডাকে। গাঁয়ের পাঁচজনকে নিয়ে মিটিঙ হয়। সাম মোড়ল ছকু মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেরা সবাই একজোট হয়। কিন্তু তবু পঞ্চায়েতে কিছুই ফয়সালা হয় না। পরিষ্কার দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় গাঁয়ের লোকেরা। ভৈরবের পক্ষের লোক যারা, তারা সবাই মোংলার পক্ষে দাঁড়ায়। হট্টগোল চেঁচামেচিতে রাত গভীর হয়। মোড়লদের রায় অমান্য করে মিটিঙ থেকে উঠে যায় ভৈরব, শিবু, শীতল, জগতকারু, চিপতি এবং অন্যান্যরা। 'পঞ্চায়েতের অপমান, পঞ্চায়েতের অপমান' বলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে যায় সাম মোড়ল ছকু মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যে।

এর ক'দিন পরেই ধানের মরাই খুলে দিলো ছকু মোড়ল। ধান দিলো গাঁয়ের লোকজনকে। কিন্তু ভৈরবের যারা ঘনিষ্ঠ, বেছে বেছে তাদের বাদ দিলো। সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেও তাদের ধান দিলো না। সবাই বিষণ্ণ। ভৈরবও হতভম্ব। আঘাতটা যে এইভাবে আসবে, ইতিপূর্বে সে তা ভেবে দেখেনি। বিষণ্ণ মুখগুলোর দিকে চেয়ে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আপাতত এর কি প্রতিকার করা যায়, তারও কোনো দিশা পায় না। খবর পেয়ে আয়াশের বশীর এলো। বলল, ধান আছে অনেকের, দেবে না। ভেতরে ভেতরে সম্পন্ন গেরস্থেরা একজোট হচ্ছে। ব্যাপারটা সত্যিই। দু'জনে মিলে লক্ষ্মীবাটি, শ্রীকৃষ্ণপুর, লম্বোদরপুর, আয়াশ চষে বেড়ালো। কেউ ধান দিতে চায় না। নগদ টাকায় বিক্রি করতে রাজি অনেকে। কিন্তু টাকা কোথায়? যাদের দু'এক বিঘে জমি আছে, তারা জমি বন্ধক দিয়ে সুদের ওপর টাকা ধার করল। আপাতত এই ক'টা দিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করল তারা।

কিন্তু যাদের কিছুই নেই, তারা? তাদের জন্যে কি করবে ভৈরব? গরিবের মা-বাপ তো ওই জোতদার জমিদারেরাই। এককাট্টা হয়ে তারা আকাট মূর্খগুলোকে সেটা বেশ ভালো করে সমঝিয়ে দিতে চায়।

পাঁচ

সাদিনপুরের মানুষের সামনে এখন নৈরাশ্যের অন্ধকার। কাজকর্ম নেই। তারা খাটতে চায়, কাজ পায় না। অনাহারে ধুঁকছে ছেলেমেয়েগুলো। বাকিতে ধান

পেলে অন্তত কয়েকটি দিনের জন্যে তাদের মুখে আবার হাসি ফুটত, সন্ধ্যেবেলা গানের আসর বসত। মোড়লদের ঘরে ঘরে মরাই-ভরা ধান। অথচ লোকগুলোকে না খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এদিকে সামনে পুজো। এক-আধখানা করে নতুন কাপড় তারা রামপুরহাটের কোনো দোকান থেকে ধার-বাকিতে নিতে পারে। বরাবরই নেয়। কিন্তু উৎসবের খরচপত্র যোগাড় হবে কোত্থেকে? পুজোর দিন ক'টাও কি না খেয়ে থাকবে ছেলেমেয়েরা? সাদিনপুরের মানুষের মনে প্রচণ্ড আক্রোশ দানা বাঁধে। এবার তারা মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন করবে। মাস দেড়েক পরেই ধান কাটার মরশুম আসছে। দু'টাকা মজুরিতে খাটবে না তারা। সারাদিন খেটে দেড় সের চাল। অথচ অসময়ে কেউ তো দেখবে না তাদের? বশীর ভৈরব উৎসাহিত হয়। ভাবে, ক্ষেতমজুর আন্দোলন যদি করতে হয়, তাহলে শুধু সাদিনপুরে নয়, একই সঙ্গে আশপাশের গ্রামগুলোতেও আন্দোলন শুরু করবে। প্রস্তুতি চলছে তাদের। মোটামুটি দাবি, দু'সের চাল, নগদ একটি টাকা। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মজুরিই সমান দিতে হবে। মেয়েদের জন্যে কম মজুরি দেওয়া চলবে না।

স্কুলে এখন পড়াশোনা কম, উত্তপ্ত আলোচনা বেশি। রাগে গজরাচ্ছে লোকগুলো। ধান রোয়া ধান কাটায় তারা গাঁয়েই খাটে, বেশি মজুরির লোভে ভিনগাঁয়ে খাটতে যায় না, মোড়লদের আপদে-বিপদে কাজকর্মে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়, অথচ মরাই-ভরা ধান থাকা সত্ত্বেও মোড়লরা তাদের অসময়ে ধান দেবে না, এটা কিরকম বিচার! বিনালাভে তো ধান দেয় না, এক মণের জায়গায় দেড় মণ ধান নেয়, মুনিষের ওপর ধান নিলে দু'টাকা মজুরি হলেও তাদের দেড় টাকা মজুরিতে খাটতে হয়। তবু ধান না দিয়ে জব্দ করতে চায় তাদের। তাহলে তারাই বা সহজে ছেড়ে দেবে কেন?

দেবু রোজ আসে। এই একটি ঘটনায় সে-ও বিমর্ষ। ছাত্রদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, এটা তার বুকেও কম বাজেনি। আগে ওদের পড়াশোনা শ্লথগতিতে এগোনোর জন্যে মাঝে মাঝে রেগে যেত। বয়সে তরুণ। উদ্দীপনা বেশি। মৃদু-মন্দ গতি তার পছন্দ নয়। সে চায় দ্রুত সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে। বাধা-বিপত্তি কিংবা অসুবিধের কথাকে সে আমল দিতেই চায় না। ছাত্রদের নিষ্ঠার ব্যাপারে তার সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-হারে পড়াশোনা এগোচ্ছে, তাতে সে মনে মনে হতাশ হয়। রোজকার পড়াটুকুও তারা রোজ করে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে ভৈরবকে বলত, 'ছেড়ে দাও ছোড়্দা। কি হবে এসব করে? ওরা নিজেদের ভালোমন্দ নিজেরাই বোঝে না!'

ভৈরব বলত, 'ওদের অবস্থাটাও তো ভেবে দেখবি একটু। সারাদিন গায়ে-গতরে খেটে সন্ধ্যেবেলা যে এখানে এসে বই নিয়ে বসে, সেটাই কি কম?'

'কিন্তু এভাবে এগোলে মরার আগে তো ওরা নিজেদের নাম সই করতেই শিখবে না!'

ভৈরব হাসত। বলত, 'শিখবে। আর যেদিন নাম সই করতে শিখবে, সেদিন আমার চেয়ে তোর চেয়েও অনেক বেশি এগিয়ে যাবে ওরা।'

দেবুও হাসত, 'তুমি এমন সব আজগুবি কথা বলো না!'

কিন্তু এখন আর দেবু কিছু বলে না। কেউ বই খুললে পড়া বলে দেয়, লিখতে চাইলে দেখিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারছে, আসল সমস্যাটা কোথায়। ইতিমধ্যে একদিন সে আর ভৈরব মোংলা কামারের বউকে নিয়ে হাসপাতাল গিয়েছিল। ডাক্তার দেখে বলেছিলেন, অ্যাকিউট্ অ্যানিমিয়া। প্রপার ট্রিটমেণ্ট না হলে কোনো আশা নেই। ট্রিটমেণ্ট বলতে ভালো খাওয়া-দাওয়া। ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে কিছু ভিটামিন বড়িও দেওয়া হয়েছিল। ভৈরব মোংলার বউকে কিছুদিন হাসপাতালে রাখার চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার রাজি হননি। হাসপাতালে বেড তো খুব কম। এ রকম রোগী ভর্তি করে রাখা সম্ভব নয়। ডাক্তার বলেছিলেন, 'সারা দেশটাই তো অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। ক'জনকে ভর্তি করে রাখব বলুন।'

মোংলার বউকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে দেবু বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু দামী কথা বলেছেন ছোড়্দা, সারা দেশটাই অ্যানিমিয়ায় ভুগছে।'

ভৈরব জবাব দিয়েছিল, 'আমাদের স্বাধীনতার বিশ বছরে এটুকুই লাভ হয়েছে দেবু। অথচ একটি দেশের মূল শক্তি এই মেহনতী মানুষগুলোই। জাতির মেরুদণ্ড ওরা। সেই মেরুদণ্ডই যে দিন দিন ভেঙে পড়ছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারোর। দেশে যারা এক বিন্দুও উৎপাদন করে না, তারাই লুটেপুটে খাচ্ছে সবকিছু, ঘাড়ে-গর্দানে শুয়োর হচ্ছে।'

ভৈরবের কথা শুনতে শুনতে দেবুর মনে ক্ষোভ জমে উঠছিল।

ফুল্লরার শরীর দিন দিন ভারি হয়ে উঠছে। তার দেহের অভ্যন্তরে সিতাবের রক্ত মাংস তিল তিল করে আকার নিচ্ছে। এখন হাত-পা ভারি বোধ হয় তার। সব সময় অলস ঘুম-ঘুম ভাব। অথচ এই শরীর নিয়েই তাকে এর-ওর বাড়িতে কাজ করতে হয়। সন্ধ্যেবেলা আর বসে থাকার ক্ষমতা থাকে না। দাওয়ার একপাশে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে বুড়ো ছাত্রদের পড়াশোনা দেখে, গল্প-গুজব শোনে।

স্কুলে ছাত্রসংখ্যা দু'চারজন কমেছে। দিনরাত অভাব-অনটনে মানুষের মনের শক্তি আর কতদিন বজায় থাকবে! সেদিন সন্ধ্যেবেলা ভৈরব স্কুলে এসে দেখল, হ্যারিকেনের সামনে একা বসে আছে শীতল। পাশে শুয়ে ফুল্লরা, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে শীতলের সঙ্গে। ভৈরব জিজ্ঞেস করল, 'আর সব কোথায় রে?'

শীতল জবাব দিলো, 'আসবে হয়তো দু'একজন।'

ভৈরব একপাশে একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। ফুল্লরাকে বলল, 'এবার তুমিও পড়াশুনো শুরু করে দাও বৌ-মা।'

ফুল্লরা সলজ্জ হেসে জবাব দিলো 'আমি !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। চেষ্টা করলে সব হয়। এক-আধটু করে শিখবে।'

শীতল বলল, 'খুব ভালো হয় মাস্টারদা। এ্যাদ্দিন লেগে যেলে অনেক শিখে ফেলত।'

ফুল্লরা বলল, 'ধ্যেৎ, আমি উসব পারব না।'

ভৈরব বলল, 'পারবে না কেন, খুব পারবে। তবে, আর ক'টা দিন যাক, তারপর।'

ফুল্লরা ভৈরবের ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল।

শীতল হ্যারিকেনের সামনে বই খুলে বসেছে। ভৈরব চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাকে। খুব কষ্ট ওর। মা ভাই বোন আর পঙ্গু বাবাকে নিয়ে বাড়িতে ছ'সাতজন লোক। রোজগেরে বলতে সে একা। কাজ জুটলেও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। কাজ না জুটলে খাওয়ার কথা তো ওঠেই না। উঠতি বয়েস, খিদেটা বেশি। দু'দিন উপোসে কাটালেই চোখ দু'টো গর্তে বসে যায়, মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে যায়। গানের দলের ছোকরা শীতলের সুরেলা কণ্ঠে আর সে-গান নেই। গান শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে। ভৈরব বুঝতে পারল, আজ সারাদিন ওর পেটে দানাপানি কিছু পড়েনি। জিজ্ঞেস করল, 'আজ কি করছিলিস্ ?'

শীতল বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলো, 'ঘরেই ছিল্যাম।'

'মুনিষ-টুনিষ যাসনি ?'

'কাজ কুথা ?'

ভৈরব চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এভাবে চলবে না শীতল। মুনিষ খেটে কি অতগুলো লোকের খাবার জোটে ! অন্য কিছু কর।'

শীতল চোখ তুলে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কি কৈর্‌বো ?'

'হুঁ, ভাবতে হবে। কিছু একটা করা দরকার। দাঁড়া, দেখি।'

ইতিমধ্যে ফুল্লরা উঠে গিয়ে একটা টুকিতে করে চারটি মুড়ি এনে রাখল শীতলের সামনে। বলল, 'খা শেত্‌লা।'

শীতল প্রবল আপত্তি জানাল, 'না না, আমি খাবো না। তুমি নি যাও।'

ভৈরবের মনে হলো, হয়তো ফুল্লরার রাতের খাবার বলতে ওই মুড়িগুলোই, সবটাই ধরে দিয়েছে শীতলের সামনে, আজ রাতে না খেয়ে থাকতে হবে বেচারীকে। তবু সে শীতলকে বলল মুড়ি চারটি খেয়ে নিতে। শীতল আর আপত্তি করল না। দু'মুঠো মুড়ি খেয়ে বলল, 'নিতাই রঘু প্যালা আর আসবে না।'

ভৈরব জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

'ছকু মোড়লের ধান লিয়্যাছে।'

'তাতে কি হলো ? ধান নিয়েছে তো স্কুলে আসবে না কেন ?'

'মোড়লরা বারণ কর্যাছে।'

আবার দু'মুঠো মুড়ি চিবোলো শীতল। তারপর বলল, 'আমাকেও বুলছিল ধান নিতে!'

'তা তুই নিলি নে?'

'না। অমন ধানের দরকার নাই আমার।'

ভৈরব বুঝতে পারল, অবস্থাটা ক্রমশই সঙিন হয়ে উঠছে। ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র আছে, তার হাতে কোনো হাতিয়ার নেই। এই অসম লড়াইয়ে জেতা সহজ নয়।

দেখতে দেখতে আরও দু'চারজন এলো। শিবু, চিপতি, জগতকারু। দেবু এলো একটু পরে। ধপ্ করে বসে পড়ে বলল, 'শুনেছ ছোড়্দা?'

ভৈরব জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল দেবুর দিকে। দেবু বলল, 'যারা আমাদের স্কুলে আর আসবে না বলে কথা দিয়েছে, মোড়লরা কেবল তাদের ধান দিচ্ছে।'

ভৈরব শুধু সংক্ষেপে জবাব দিলো, 'হুঁ।'

'সাদা কাগজে সই নিয়ে ধান দিচ্ছে। অনেকে নিয়েছে।'

'তুই কার কাছে শুনলি?'

'বাবা বলছিলেন। গতকাল মিটিঙ হয়েছে তো ওদের। বাবাকেও ডেকেছিল মিটিঙে। আমার স্কুলে আসা নিষেধ করতে।'

'হুঁ। তা তোর বাবা নিষেধ করেছেন তোকে?'

'না। বাবা ওদের সাফ বলে দিয়েছেন, আমি ওসবে নেই। ছেলে পড়াচ্ছে, খারাপ কাজ তো করছে না! জ্যাঠামশাইও মোড়লদের কথায় খুব রেগে গেছেন। বলছিলেন, ছকুরা খুব বাড়াবাড়ি করছে।'

ভৈরবের চোখ দু'টো ক্ষীণ আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। না, একেবারে ব্যর্থ হয়নি সে। কারোর কারোর মনে চেতনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে।

দেবু জিজ্ঞেস করল, 'স্কুলের ওপর ওদের এত রাগ কেন?'

ভৈরব বলল, 'ওরা সাক্ষরতাকে ভয় পায়। লেখাপড়া শিখে ছোটলোকগুলো চালাক-চতুর হয়ে গেলে মোড়লদের ভারি অসুবিধে যে!'

দেবু চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'এতদিন আমার মনে দ্বিধা ছিল ছোড়্দা। এখন আর নেই। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবো আমরা।'

ভৈরব সস্নেহে দেবুর পিঠে হাত রাখল।

ছয়

ভৈরবের স্কুল প্রায় উঠে গেছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসের ভয়ঙ্কর দিনগুলির জ্বালাযন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অধিকাংশ মানুষই ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেদের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। মোড়লদের মধ্যে

এখন আর কোনো বাদ-বিসংবাদ নেই। সবাই একজোট। সতীদীঘির মামলা তুলে নিয়েছে ছকু মোড়ল। জিতবার সম্ভাবনাও ছিল না। তাছাড়া এখন তো মামলা তুলে নিতে হবেই। সামনে যখন ভয়ঙ্কর শত্রু মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, তখন নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া চলে না। জোট বাঁধতে হবে তাদের।

ভৈরব একদিন শীতলকে সঙ্গে নিয়ে রামপুরহাট গেলো। ফটো তুলিয়ে লাইসেন্স করিয়ে দিলো তার। বলল, 'এখন ভাড়াতেই রিকশা নিয়ে চালাবি। যদি পারি, পরে কিস্তিতে রিকশা কেনার ব্যবস্থা করে দেবো। আস্তে আস্তে টাকা শোধ করে দিবি, নিজের রিকশা হয়ে যাবে।'

শীতল এখন দিনমান রিকশা চালায়। সন্ধ্যের পর ভৈরবের স্কুলে যথারীতি হাজিরা দেয়। জগতকাকু বলে, 'আমাকেও একটা লাইসেন করে দাও না মাস্টারদা। আমিও রিস্কা চালাব।'

ভৈরব ধমক দেয়। বলে, 'তুই আবার রিকশা চালাবি কি ? মেয়েদের মতো রোগা-প্যাংলা শরীর। রিকশা টানতে পারবি তুই ?'

'হুঁ, দাও না। ঠিক পারব।'

'ঠিক আছে। দেবো করে। তবে দু'চারদিন দাঁড়াতে হবে এখন।'

ঠিক এমন সময়, কালীপুজোর কয়েকদিন আগে মোংলা কামারের বউ মারা গেলো। ভৈরব দেবু জগতকাকু এবং আরও কয়েকজন শ্মশানে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরল তারা। সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল ভৈরবের, ঘুম ভাঙল গৌরসুন্দরের চেঁচামেচিতে। দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভৈরব। উঠোনে বাসন্তী আর নির্মলারও ভীত-চকিত চেহারা। গৌরসুন্দর খুব উত্তেজিত। ভৈরব জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে দাদা ?'

গৌরসুন্দর বলল, 'ছকু যে সিতুর ঘর ভেঙে দিলে রে !'

কথাটা শুনেই চমকে উঠল ভৈরব। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল বাড়ি থেকে। গৌরসুন্দর বলল, 'খালি হাতে যাস না ভৈরব। অনেক লোক আছে উখ্যানে।'

ভৈরব শুনল না। পথে বেরিয়েই শিবুকে হাঁক দিলো সে। জগতকাকু শীতল চিপতিকেও ডাকল। দেবু খবর পেয়ে ছুটে এলো বাড়ি থেকে। সিতাবের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই ওরা বাড়ির একপাশের দেয়াল ভেঙে ফেলেছে। ওদের মধ্যে ভৈরবের স্কুলের ছাত্রও আছে দু'চারজন। নিতাই রঘু প্যালাকে চোখে পড়ল ভৈরবের। ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যে দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ফুল্লরা হাউমাউ করে কাঁদছে, 'আমি তুমাদের কাছে কুনু দোষ করিনি গো, আমার সব্বোনাশ করিও না।'

ভৈরবরা গিয়ে হাজির হতেই লোকগুলোর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিলো।

ভৈরব জোরে হাঁক দিলো একটা, 'নিতাই! রঘু! তোদের লজ্জা করছে না একটু? প্যালা! চলে আয় ওখান থেকে।'

মুহূর্তে সবারই হাত থেমে গেলো। সাম মোড়ল এগিয়ে এলো ভৈরবের কাছে। বলল, 'তুমি মাথা খারাপ করিও না ভৈরব। সিতু বাড়ি লিখে দিঞে যেল্ছে মোড়লকে। এ্যাদ্দিন তো অম্নি-অম্নি পড়ে ছিল। মোড়ল কিছু বোলেনি।'

ভৈরব বলল, 'ঠিক আছে। দলিল আনতে বলো। দেখি।'

ছকু মোড়ল তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, 'দলিল কোটে দেখাব, হুঁ, বুঝলি! কোটে তোর বাপকে দেখাব।'

শিবু এগিয়ে গেলো। বলল, 'একটুকুন বুঝে-সুজে কথা বোলো মোড়ল।'

মুখ বেঁকিয়ে ছকু মোড়ল জবাব দিলো, 'ভারি বুঝুনদার এস্যাছে! ছুঁচ্যার কেরদানি —হুঁঃ, ছুঁচ্যার কেরদানি! কত দেখল্যাম।'

রাগে দেবু দাঁতে দাঁত ঘষছে।

ইতিমধ্যে গৌরসুন্দর এলো। দেবুর বাবা দুর্গাচরণ ঘোষ এলেন। এসে হাজির হলেন গঙ্গাচরণ ঘোষও। তিনি বললেন, 'এটা খুব অন্যায় বাবা ছকু। অনাথা মেয়েটা তোমাদেরই আশ্রয়ে আছে। এ রকম অত্যাচার কোরো না।'

ছকু মোড়ল তেরিয়া মেজাজে বলল, 'আমি অন্যায় কৈর্ছি, কি বুললেন, আমি অন্যায় কৈর্ছি! আর আমি যে অতগুলিন টাকা দিল্যাম সিতুকে, তার দাম নাই? হুঁ, সব দোষ আমারই ছাখেন!'

'তোমার অনেক আছে ছকু।'

'উসব অন্য লোককে বুঝ্যান গা। হুঁঃ, যত্তোসব —এই, তুরা কাজ কর্। হাঁ করে শুনছিস কি? হাত চালা —হাত চালা। ভেঙে ফ্যাল্ সব।'

ছকু মোড়লের তাড়া খেয়ে লোকগুলো আবার একটু সক্রিয় হলো। হারু বংশী সিধু চালে উঠে পড়ে চাল ছাড়াতে শুরু করল। ছকু মোড়লের ছেলে তিনকড়ি একাখানা লাঠি হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

ভৈরব এগিয়ে গেলো লোকগুলোর দিকে। হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'থাম তোরা। বাড়ির যদি আর একটুও ক্ষতি হয়, আমি সহ্য করব না বলে দিচ্ছি।'

ভৈরবের কণ্ঠে এ রকম আওয়াজ কেউ কোনোদিন শোনেনি। লোকগুলো কিছুক্ষণের জন্যে থমকে গেলো। ছকু মোড়ল তেড়ে গেলো ভৈরবের দিকে, 'তু সাপের পাঁচ পা দেখ্যাছিস হারামজাদা? বোলি, সাপের পাঁচ পা দেখ্যাছিস? তিনু, দে তো হারামজাদাকে দু'ঘা।'

'হারামজাদা তোর বাপ।' বলেই শিবু একটা প্রচণ্ড চড় কষালো ছকু মোড়লের মুখে। চড় খেয়ে 'আঁক্' করে ছিটকে পড়ল ছকু মোড়ল। তিনকড়ি ছুটে এসে শিবুর মাথা লক্ষ্য করে লাঠি ঝাড়ল। কিন্তু শিবু একটু সরে যেতেই আঘাতটা লাগল না তাকে। তারপর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেলো। যারা ঘর ভাঙছিল,

তারাও ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে দেবু শীতল জগতকারু ভৈরব কোথা থেকে একটা করে লাঠি যোগাড় করে ফেলেছে। কিন্তু ছকু মোড়লের লোকজন অনেক বেশি। ভৈরব আর দেবু মাটিতে পড়ে গেছে, দমাদম লাঠির বাড়ি পড়ছে তাদের ওপর। দুর্গাচরণ আকুলি-বিকুলি করেছেন। গঙ্গাচরণ ঝগড়া থামাতে গিয়ে লাঠির ঘা খেয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন। চিপতি লাঠি যোগাড় করতে পারেনি, সে একটা দেয়াল-ভাঙা মোটা চাঙড় তুলে নিয়ে তিনকড়ির মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। কিন্তু সেটা তিনকড়িকে না লেগে লাগল বংশীকে। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেলো সে। মারদাঙ্গা শুরু হতেই সাম মোড়ল তার বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল, বন্দুক নিয়ে এসে দু'টো ফাঁকা আওয়াজ করল। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো সবাই। ছকু মোড়লের পক্ষের কয়েকজন ছাড়া আর কেউ রইল না সেখানে। মাটিতে পড়ে রইল আহত ভৈরব, দেবু আর বংশী। আর রইল ফুল্লরা —হতভম্ব, দিশেহারা।

ছকু মোড়লের বাড়ি দখল করা আটকানো গেলো না কিছুতেই। মন্দের ভালো, সিতাবের সব জায়গাটুকুই দখল করে নেয়নি ছকু মোড়ল। তার মনে কি দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই ? আছে বৈ-কি ! আর আছে বলেই সমস্ত বাড়িটা ভেঙে ফেললেও একপাশে একখানা ঘর রেখে দিয়েছে। বাড়ি ভাঙার ফলে ঘরখানার ওপরের চাল ধসে গিয়েছিল। গৌরসুন্দর আর শিবু দু'একদিনের মধ্যেই চালটাকে মেরামত করে ঘরখানাকে বাসোপযোগী করে দিয়েছে। সেখানেই মাথা গুঁজে থাকে ফুল্লরা। ভৈরবকে আর দেবুকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল সেই দিনই। ছকু মোড়লের পক্ষের লোকজনের মধ্যে বংশীকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল।

পুলিশ এলো পরদিন বিকেলবেলা। প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী কমল হাজরা এবং স্থানীয় এম. এল. এ. রামলাল ভকত সঙ্গে করেই পুলিশ নিয়ে এলেন। শিবুর প্রচণ্ড চড়ে ছকু মোড়লের সামনের দু'টি দাঁত পড়ে গেছে, এ রকম নৃশংস আচরণের জন্যে পুলিশ-ইনস্পেক্টর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আস্তে আস্তে মানুষের হিংসা বর্বরতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, গ্রামের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও শান্তির পরিবেশ কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন কমল হাজরা। রামলাল ভকত বললেন, 'তবু এই সব গুণ্ডা-বদমাস-লোচ্চাদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসছে গ্রামের সাধারণ মানুষেরাই, এটা খুব আশার কথা, আনন্দের কথা।' পুলিশ-ইনস্পেক্টর সমর্থন জানালেন রামলাল ভকতকে। ছকু মোড়লের বৈঠকখানায় চা-পর্ব ইত্যাদি শেষ করে পুলিশ গেলো জায়গাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে।

ইতিমধ্যেই জায়গাটা সাফ-সুতরো করা হয়েছে। চারদিকে কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘিরে তাতে কাদামাটির ছিটে দেওয়া হয়েছে। কিছু খড় এনে সেখানে একটা ছোটখাটো খড়ের গাদা তৈরী করা হয়েছে। বেড়ার গায়ে কাঁচা কাদামাটি এবং কাঁচা কঞ্চির ডগার এক-আধটুই যা চোখে পড়ে, নইলে বোঝার উপায়

নেই, গতকালও এখানে সিতাবের বাড়ি ছিল। ছকু মোড়ল পুলিশকে জানাল, সেটা তার খামারবাড়ি, অনেক আগে থেকেই আছে। অবশ্য জায়গাটা এক সময় সিতাবেরই ছিল, তার কাছ থেকেই কিনেছে সে। ভৈরব তার লোকজন নিয়ে জায়গাটা জবরদখল করতে চেয়েছিল। ছকু মোড়ল কাগজপত্র দেখাল পুলিশকে। রেজেস্ট্রী দলিল।

পুলিশ-কেস হলো ভৈরবের বিরুদ্ধেই। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপরের জায়গা জবরদখল করতে যাওয়ার অভিযোগে ভৈরব, দেবু, শীতল, জগতকারু, শিবু এবং ভৈরবের পক্ষের আরও কয়েকজনকে আসামী করা হয়েছে। পুলিশ হাতের কাছে পেয়ে দু'একজনকে গ্রেপ্তারও করেছিল। কৃষকসভার পক্ষ থেকে তাদের জামিনের ব্যবস্থা করা হয়। ভৈরব দেবু হাসপাতালে ভর্তি থাকতেই জামিন পায়।

কালীপুজোর পরদিন ভৈরব আর দেবু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলো। সকালবেলা বশীর ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গাঁয়ে ফিরল। মোংলার কামারশালার পাশ দিয়ে আসার সময় থমকে দাঁড়াল ভৈরব। রাস্তা থেকেই চোখে পড়ল, মাথার ওপর হাতুড়ি তুলে পাগলের মতো তাণ্ডব নৃত্য করছে মোংলা। চোখ দু'টো টকটকে লাল। নিশ্চয়ই গতকাল নবগ্রামে বলি দিতে গিয়েছিল, সারারাত সিদ্ধি গিলেছে খুব। প্রতিবারই কালীপুজোয় নবগ্রামে বলি দিতে যায় সে। অভাব-অনটনে দুঃখ-জ্বালায় এমনিতেই তার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ইদানীং খুব গাঁজা টানছিল। সারারাত সিদ্ধি গিলে এসে তার ওপর হয়তো আজ আবার এই সকালবেলাতেই গাঁজা টেনেছে। তান্ত্রিকের মতো দেখাচ্ছিল মোংলাকে।

ছেলে হাপরের দড়ি টানছে। মোংলা তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে চোখ পাকালো ছেলের ওপর, 'অ্যাই পঞ্চা, জোরে জোরে টান।'

তারপর আগুনে একখানা লোহা গুঁজে দিতে দিতে গলা ছেড়ে গান ধরল—

কিরিস্‌নো বরুণা নরমুণ্ডুমালিনী
লোলজিভ্য, মা, করালোবদুনী
শঙ্খামিয়ী তুমি শঙ্খানাশিনী
তুমি শত্তুকুম্ব বরদায়িনী···

রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ভৈরব, দেবু আর বশীর। গনগনে লাল লোহা নেহাইয়ের ওপর রেখে দমাদম হাতুড়ি পেটায় মোংলা। চারদিকে আগুনের ফুলকি ছড়ায়। সেই সঙ্গে গলা ছেড়ে গান গায়—

ড্যাম্‌-কুড়-কুড় ড্যাম্‌-কুড়-কুড় বাদ্যি বাজে
শ্মশানে ঘাটে তুমি নাচো মা
তাতা-থৈ তাতা-থৈ রণসাজে
নাচো মা নাচো মা
দিগম্বরী সাজে নাচো মা···

পঞ্চা হাপরের দড়ি টানে আর চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে তার পাগল বাবাটাকে। মোংলা আবার লোহাখানা গুঁজে দেয় আগুনে। তারপর মাথার ওপর হাতুড়ি তুলে ধেই ধেই করে নাচে—

তব রক্ত-চরণে ছাগ-মুণ্ডু দিতে
মোংলা কামার খাঁড়া-হাতে নাচে
ড্যাম্-কুড়-কুড় ড্যাম্-কুড়-কুড় বাদ্যি বাজে
শ্মশানে ঘাটে তুমি নাচো মা
তাতা-থৈ তাতা-থৈ রণসাজে
নাচো মা নাচো মা···

আগুন থেকে গনগনে লাল লোহাটাকে নিয়ে নেহাইয়ের ওপর রাখে মোংলা। তারপর লোহার ওপর হাতুড়ি পিটতে থাকে ঠাঁই ঠাঁই করে।

ঠিক এমন সময় ভৈরব, দেবু আর বশীর রাস্তা থেকে তার কামারশালার দরজার কাছে এগিয়ে গেলো। ভৈরব জিজ্ঞেস করল, 'কি গো মামা, কাল নবগ্রামে খুব বলি দিয়ে এলে না-কি ?'

'হাসপাতাল থেকে এল্যা ছোটবাবু!' বলেই মোংলা ছুটে এসে গড় করে প্রণাম করল ভৈরবকে। তারপর বলল, 'তুমি ঠাকুর-দেব্‌তা ছোটবাবু। মা তুমার ভালো কৈর্‌বে।'

ভৈরব হেসে বলল, 'ভালো করছে কই! বরং উলটোটাই তো দেখছি। ভালো করছে ছকু মোড়লের সাম মোড়লের।'

মোংলা হাসল হা-হা করে। বলল, 'কাল পাঁচটা ছকু বলি দিয়্যাছি, তিনট্যা সাম। এবার মা-র তেষ্টা মিট্যাছে ছোটবাবু। তুমার ভালো হবে।'

এ-অবস্থায় ভৈরব মোংলার সঙ্গে আর কথা বলতে চাইল না। বলল, 'কাজ করো মামা। এখন বাড়িতে গিয়ে একবার সবাইকে দেখা দিই।'

দেবুকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিলো ভৈরব। তারপর বশীরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলো। খবর পেয়ে ভৈরবকে দেখতে এলো অনেকে। ফুল্লরাও এলো। এই ক'দিনে ওর চেহারাটা আরও খারাপ হয়েছে বলে মনে হলো ভৈরবের।

ফুল্লরা বলল, 'আমার লেগেই তুমাকে ভুগতে হলো বট্‌ঠাকুর। আমারই কপালের দোষ।'

হা-হা করে হাসল ভৈরব। বলল, 'হুঁ, এখন তাই মনে হচ্ছে। তবে তোমার কপালটা যে ভালো, সেটা আমি একদিন প্রমাণ করে ছাড়ব, দেখে নিও। তোমার যে এক চিলতে ঘর আছে, ওখানেই আমার স্কুল থাকবে। আজ থেকেই স্কুল বসবে আবার।'

গৌরসুন্দর বলল, 'ইস্কুল করে কি কৈর্‌বি? সুযোগ পেলে তোর ছাত্ররাই তো তোর ওপর লাঠি ধৈর্‌বে।'

'লাঠি যাতে না ধরে, সেজন্যেই তো ওদের লেখাপড়া শেখানো দরকার। ওরা ওদের শত্রুকে ঠিক চিনতে পারছে না দাদা।'

বাসন্তী বলল, 'উসব লোককে বিশ্বেস নাই বাপু। আমি আর তুমাকে উসব কৈর্‌তে দিবো না। লোকের ভালো করে কাজ নাই তুমার।'

ভৈরব হেসে বলল, 'কে বললে ওদের বিশ্বাস নাই বৌদি! জানো, ওরাই আবার হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিল আমাকে। মনের মধ্যে অনুতাপ হয়েছে ওদের। আমাকে দেখতে দেখতে ওদের চোখ জলে টলটল করে উঠেছে, মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোয়নি।'

সাত

অঘ্রাণ মাস। মাঠে পাকা ধান —যেন সোনা ছড়িয়ে আছে মাঠ জুড়ে। ঝকঝক করছে সোনা। ধান কাটা শুরু হয়েছে। এখন আর কাজের অভাব নেই। সবাই খুশি, সবার মুখেই হাসি। দিনমান কাজ করছে তারা। পেট ভরে দু'বেলা খেতে পাচ্ছে। কথায় বলে —অঘ্রাণ-পৌষে ইঁদুরেও সাতটা করে বউ পোষে। আর মানুষ, যতই গরিব হোক, রোগ-বালাই যদি না থাকে, গায়ে ক্ষমতা থাকে, তাহলে সাতটি বউ পুষতে না পারুক সে, অন্তত একটি বউয়ের মুখে হাসি এনে দিতে পারে। শরীরের ক্ষমতার যে বড় দাম!

ভৈরব এখন ব্যস্ত। সাদিনপুরে সে গরিব মেহনতী মানুষগুলোকে জোটবদ্ধ করতে পারেনি, ছকু মোড়ল সাম মোড়ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যেদের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে তারা। সেই দাসখত যতদিন না তারা আবার নিজেদের হাতে ফিরে পায়, যতদিন না সেগুলোকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, ততদিন তারা মাড়নের ওপর দড়ির ছাঁদে বাঁধা বলদগুলোর মতো পাকে পাকে ঘুরবে, দড়ি ছিঁড়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই তাদের। কিন্তু ভৈরবের কাছে সবটাই হতাশাজনক নয়। আশপাশের কয়েকটি গাঁয়ে ক্ষেতমজুরেরা আন্দোলন চালাচ্ছে। দু'তিনটি গাঁয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন সফল হয়েছে, ধর্মঘটের দিকে এগোতে হয়নি, জোতদারেরা ক্ষেতমজুরদের কিছু কিছু দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছে। এ-বছরই প্রথম আন্দোলন, তাই তাদের দাবি-দাওয়াও খুব একটা বেশি নয়। সারা বছর কর্মসংস্থান, কাজ না হলে ভাতা, প্রয়োজনে বিনা সুদে ঋণ, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, অসুখে-বিসুখে চিকিৎসা-ব্যবস্থা —এসব কিছুই না। শুধু তাদের দাবি, মেহনতের একটা ন্যায়সঙ্গত মজুরি, এবং সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সমান মজুরির হার। পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে নারী শ্রমিকের কম মজুরি দেওয়াটা অন্যায়, অথচ সেই রেওয়াজই চলে আসছে বরাবর। দু'তিনটি গ্রামে তাদের এই ন্যূনতম দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দু'টি গ্রামে কিছুতেই ধর্মঘট এড়ানো গেলো না। গ্রামের

মোড়লেরা একরোখা, দাবি মেনে নেওয়া না-নেওয়ার প্রশ্ন নয়, আর্থিক ক্ষতির কথাও তারা হিসেবের মধ্যে ধরছে না, প্রশ্ন একটাই, ছোটলোকদের এই আস্পর্ধা তারা মেনে নিতে রাজি নয়। সাম মোড়ল ছকু মোড়লের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছিল, তাদের ক্ষেত-খামারে কাজ করার জন্যে সাদিনপুর থেকে মুনিষ পাঠাতে বলেছিল, কিন্তু এখন এই ভরপুর কাজের সময় কে মুনিষ ছাড়তে পারে? তাছাড়া সাদিনপুরের লোকেরা সাম মোড়ল ছকু মোড়লের ক্ষেত-খামারে কম মজুরিতে খাটতে পারে, অন্য গাঁয়ে কম মজুরিতে খাটতে যাবে কেন?

দু'তিনটি গ্রামে ক্ষেতমজুর ধর্মঘট চলছে, তাই ভৈরবকে সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হয়। মিটিঙ আছে, গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে আলোচনা আছে। বশীর আর ভৈরব এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে ছুটে বেড়ায় সারাদিন। তাই এখন স্কুল প্রায় বন্ধ। ফুল্লরার এক চিলতে ঘরের ভেতরেই স্কুল বসে। শীতকাল, সেদিক থেকে বরং সুবিধেই। ছাত্র তো নেই মোটেই, প্রথমত প্রকাশ্যে কেউ ভৈরবের সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক রাখতে চায় না, তার ওপর এখন কাজের সময়, সকাল থেকে এক প্রহর রাত অব্দি তারা কাজে ব্যস্ত থাকে। তবু শিবু, শীতল আর জগতকারু, এই তিনটি বাঁধা ছাত্র রয়েছেই। মাঠের কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তাদের। কয়েকদিন হলো, জগতকারুও রিকশা নিয়েছে, সে-ও এখন রিকশা চালায়। তা এই তিনটি ছাত্র নিয়েই ভৈরব আর দেবু তাদের স্কুলটাকে টিমটিম করে বজায় রেখেছে, বলতে গেলে নিতান্তই জিদের বশে। এখন তা-ও প্রায় বন্ধ, কেবল দেবু মাঝে মাঝে এক-আধদিন ছাত্রদের নিয়ে বসে।

সেদিন সকালবেলা, তখনও সূর্য ওঠেনি, ভৈরব বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, হঠাৎ কানে গাবগুবোর ঝঙ্কার এলো। এই ভোরবেলাতেই ভোলাদাস গাঁয়ে এসে হাজির। মাঝেমাঝে আসে, গান শুনিয়ে যায়। বেশ দরাজ গলা। কিন্তু গান শোনার অবকাশ নেই ভৈরবের। আয়াশের বশীরকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মঘটী ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, মোড়লদের সঙ্গে আলোচনাও রয়েছে, বিকেলবেলা কৃষকসভার আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আসার কথা। ছকু মোড়লের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ভৈরবের চোখে পড়ল, তার বৈঠকখানার সামনে লোক জড়ো হয়েছে অনেক। তাদের হাতে কাস্তে, মাঠে কাজে যাওয়ার জন্যে তারা বেরিয়েছিল, গাবগুবোর আওয়াজ শুনে এখানে এসে হাজির হয়েছে। মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। ছেলেপিলের দঙ্গল ভোলাদাসকে প্রায় ঘিরে ধরেছে। জগতকারু রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, ভিড় ঠেলে আর যেতে পারেনি। সাদিনপুর থেকে পাকা সড়ক পর্যন্ত রাস্তাটুকু খুব খারাপ, সাইকেল-রিকশায় চড়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না, রিকশা টানতে টানতে হেঁটে যেতে হয়। রিকশাটাকে রেখে সে এগিয়ে এসেছে ভিড়ের মধ্যে। দেবু এসেছে, ভৈরবকে দেখে সে তার পাশে এসে দাঁড়াল। ছকু মোড়ল বৈঠকখানার দাওয়ায় মোড়া পেতে বসে আছে।

ভোলাদাস চোখ বুজে গাবগুবোর তারে হাত বোলাচ্ছে —গুব্-গুব্ —গুব্-গুব্ —গাব্-গুবা-গুব্ —গাব্-গুবা-গুব্—

মেয়েরা একদিকে দাঁড়িয়ে আছে জটলা করে। ফুল্লরা এসেছে। শরীর আরও ভারি হয়েছে, চোখ দু'টোয় যেন ক্লান্তি ঝরে পডছে। রাধা এসে একপাশে দাঁড়াল, কোলে কয়েক মাসের একটি ছেলে। অঘ্রাণ মাসে বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে সে। বিয়ের পর এই প্রথম তার সাদিনপুরে আসা। কি করে আসবে? আসার সাধ যায়, কিন্তু মায়ের সংসারের অবস্থা তো সে বোঝে। রাধার মা নিজেই দু'একবার গিয়ে দেখে এসেছে মেয়েকে।

এক সময় ভোলাদাস চোখ মেলে তাকাল। তাকাল সুদূর আকাশের দিকে। তারপর গাবগুবোর ঝঙ্কারের সঙ্গে গুনগুন করে সুর ফুটে উঠল তার গলায়—

ও তুই খবর রাখিস না,
আর ঘুমিয়ে থাকিস না।

নতুন গান বেঁধেছে ভোলাদাস। উৎসুক হয়ে উঠল সবাই। চাঞ্চল্য দেখা দিলো লোকগুলোর মধ্যে। জগতকারু আড়চোখে রাধাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। রাধা তেমনি নির্বিকার। অপলক চোখে সে চেয়ে চেয়ে দেখছে ভোলাদাসকে। কতদিন পরে ভোলাদাসের গান শুনছে সে।

ভোলাদাসের কণ্ঠে এখন গান নেই, শুধু গাবগুবোর ঝঙ্কার —গাব্-গুবা-গুব্ —গাব্-গুবা-গুব্—। তারপর তার ভরাট কণ্ঠস্বরে ডুবে যায় গাবগুবোর আওয়াজ—

তোর ভাঁড়ার ঘরে করছে চুরি খবর রাখিস না,
ও তুই গেরস্থালি বেবাক ভুলি ঘুমিয়ে থাকিস না।
ও আমার ভাইটি রে—
সোনার বোনটি রে—

ভৈরব আর পা বাড়াতে পারল না। এ কার কণ্ঠস্বর শুনছে ভৈরব? কাদের সাবধান করে দিচ্ছে ভোলাদাস? তার কণ্ঠে আর সেই প্রেমের গান নেই —রাধা কৃষ্ণ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া শুধু এক অপার্থিব অতীন্দ্রিয় ভালোবাসার আরাধনা নেই —এখন যে বড় সঙ্কট —বড় দুঃসময় —গভীর সতর্কতার প্রয়োজন।

ভোলাদাস গাইছে—

চৈত্-বোশেখের আগুনে তোর চামড়া পুড়ে কালো,
আষাঢ়-শাওন মাসের ভাসান (প্লাবন)
তোর মাথায় বয়ে গেলো,
তবু তুই খালি পেটে
দিনরাত্রি খেটে

মাঠে মাঠে ফসল ফলাস গায়ের রক্ত ঢেলে ;
হোথা ওই মরছে খিদেয় ঘরে যে তোর
দুঃখী কাঙাল ছেলে—
ফসল তুললে অন্যজনা—
তুই খবর রাখিস না
আর ঘুমিয়ে থাকিস না।
ও আমার ভাইটি রে—
সোনার বোনটি রে—

গান শেষ করে গাবগুবো-সহ দু'হাত জোড় করে সকলের উদ্দেশে প্রণাম জানাল ভোলাদাস। ছকু মোড়ল তার বৈঠকখানার দাওয়া থেকে বলল, 'ইটা কিরকম গান বেঁধ্যাছো গোঁসাই —বোলি, ইটা কি তুমার গান হলো ? তুমার ওই যে সেই গানখান —পীরিতের কি উল্ট্যা রীতি —খুব ভালো গান বাপু —উটা একবার গাও।'

বুড়ো বয়সে ছকু মোড়লের রস দেখে মেয়েরা খুক্‌খুক্ করে হাসে। ভোলাদাস এক মুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে যায় ছকু মোড়লের কাছে। বলে, 'সে-ভোলাদাস আর নাই মোড়ল, মরে যেল্‌ছে। ও-গান আর গলা দিঞে বেরাবে কি করে !'

'উ কি কথা গোঁসাই ! তুমার গান কি আমি আজ পর্‌থম্ শুন্‌ছি, বোলি, এই পর্‌থম্ শুনল্যাম তুমার গান ! তুমার গান শুনতে শুনতে আমার চুল-দাড়ি পাকল —কিন্তু আজ যে গানখান গাইল্যা, কুন্থু মাথাছাতা নাই, হুঁ, বুঝল্যা গোঁসাই, উ-গানের কুন্থু মাথাছাতা নাই।'

হা-হা করে হাসে ভোলাদাস। বলে, 'আগের ভোলাদাস যে মরে যেল্‌ছে মোড়ল ! এক জীবনে মানুষ কতবার মরে, কতবার জন্মায়। আগের ভোলাদাসকে আর খুঁজলে পাবা কুথা ?'

ভৈরব দাঁড়িয়ে ছিল ভোলাদাসের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। ভোলাদাস ফিরে দাঁড়াতেই তার সামনে এগিয়ে গেলো ভৈরব। বলল, 'তোমার গান খুব ভালো লাগল গোঁসাইবাবা। এ-গান তুমি নিজে বেঁধেছ ?'

ভোলাদাস দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। বলল, 'হ্যাঁ গো বাবাজী।'

'কিন্তু আগে তোমার এ রকম গান তো শুনিনি !'

'এখন শুনতে পাবা। মানুষের বুকের মধ্যে যে-কথা লুকিয়ে থাকে, সেই সব কথাই তো সুর হঞে বেরিয়ে আসে আমার গানে। এখন অন্যরকম গান হবে কি করে !'

'আমার তো তোমার শিষ্য হতে ইচ্ছে করছে গোঁসাইবাবা।'

আবার হা-হা করে হাসল ভোলাদাস। ভৈরবকে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করে বলল, 'মনের মধ্যে যাকে গুরু বুলে জৈপ্‌ছি, সে-ই এসে বোলে কি-না শিষ্য

হবে! ইটাও যে উল্‌ট্যা রীতি বাবাজী! তুমি মানুষের মনে আগুন জ্বালাল্‌ছো, সেই আগুনের ছুঁয়া লেগ্যাছে আমার গানে, আমার সুরে। তুমিই যে আমার গুরু বাবাজী, আমার প্রাণের ঠাকুর।'

দেবু অবাক-বিস্ময়ে কথা শুনছিল ভোলাদাসের।

গ্রামের মানুষগুলো গানের অর্থ বুঝেছে কি বোঝেনি, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে তাদের। একে একে মাথা নিচু করে মাঠের দিকে পা বাড়ায় তারা। ভৈরবও পা বাড়াল। ভিড় একটু হালকা হতেই জগতকারু তার রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রাধা অসঙ্কোচে ডাকল তাকে, 'কারুদা!'

জগতকারু থমকে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন। কোনো কথা বলতে পারল না, বোবা চোখ তুলে তাকাল রাধার দিকে। রাধা হাসল, 'কাল আমি ঘর যাবো। আমাকে একটুকুন থুঞে আসব্যা কারুদা? তুমার রিক্সায়?'

'কখুন?'

'বিক্যালে।'

'যাবো।' বলে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় রিকশা টেনে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলল জগতকারু। পাকা রাস্তায় উঠে সীটে চড়বে।

পরদিন বিকেলবেলা রাধা সাদিনপুর থেকে পাকা রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে এসে রিকশায় উঠল। রাধার মায়ের কোলে তার শিশুটি। রাধার কোলে তাকে তুলে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছল রাধার মা। আবার কতদিন পর মেয়ের মুখ দেখতে পাবে, ঠিক নেই।

রাধা চোখের জল লুকোতে গিয়ে ছেলের মুখে চুমু খেলো।

জগতকারু রিকশায় উঠে রিকশা চালাতে শুরু করল। কিছুদূর যেতেই রাধা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আর গান করো না কারুদা?'

জগতকারু জবাব দিলো, 'না।'

'ক্যানে?'

'ভাল্লাগে না।'

জগতকারু কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল, একদিন সে নিজেই রিকশা চালিয়ে রাধাকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসবে, এ রকম তার সৌভাগ্য হবে কোনোদিন? কিন্তু সেই উপলব্ধির কথা রাধার কাছে প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই তার। বড়ই বেদনাদায়ক সে-উপলব্ধি। গান গাইতে ভালো লাগে না বললেও এই মুহূর্তে তার মনের ভেতর ভোলাদাস কি গুনগুন করে উঠছিল না?—

আমার মন হারাল মনের মধ্যে
খুঁজে পেল্যাম না,
আমার মনের সোনা আপনজনার
নাগাল পেল্যাম না।

রাধা বসে ছিল রিকশার সীটে হেলান দিয়ে। চোখ বুজে। মনে পড়ছিল সাদিনপুরে কাটানো তার শৈশবের কৈশোরের দিনগুলি। বিশেষ করে খুব বেশি করে মনে পড়ছিল আলকাপের গানের ছোকরা সেই জগতকারুকে। পেছনে সাদিনপুর পড়ে রইল অফুরন্ত সুখ অফুরন্ত তৃপ্তি নিয়ে। এখন সেই সুখ আর তৃপ্তির রঙিন সুতো দিয়ে স্বপ্নজাল রচনা করতে করতে সারাটা জীবন কাটাবে রাধা। কারণ, ভালোবাসা যে সহজে মরে না। ফুলের মতো —বোঁটা থেকে ঝরে পড়লেও বাতাসে তার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। জগতকারু কি তাকে কম দিয়েছে ?

এক সময় রাধা আবার বলল, 'গান ক্যানে ছেড়ে দিল্যা কারুদা? তুমার গলাখান তো খুব মিষ্টি !'

জগতকারু কোনো জবাব দিলো না। জবাব না দিলেও সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই পরম পুরস্কার নীরবে গ্রহণ করল সে।

আট

হতাশায় হতাশায় দিন কাটছিল ফুল্লরার। আর একবার সিতাবের খোঁজ নিতে যাওয়ার জন্যে কিছুদিন থেকেই ভৈরবকে পীড়াপীড়ি করছিল ফুল্লরা। কিন্তু 'যাবো যাবো' করেও ভৈরবের সময় হয়ে উঠছিল না। ক্ষেতমজুর আন্দোলনের ঝামেলা শেষ হলে একদিন শ্রীরামপুর গেলো সে। কিন্তু সেই একই দুঃসংবাদ, সিতাবের কোনো খোঁজ নেই, যেন ভু-ভারতে কোথাও নেই সিতাব।

তাহলে এখন আর কি নিয়ে বেঁচে থাকবে ফুল্লরা ? বহু প্রত্যাশার ফল তার দেহে লালিত-পালিত হচ্ছে —বহু আকাঙ্ক্ষার ধন। অনেক দেরি করে আসছে সে। আহা, আর কিছুদিন আগে যদি সে আসত, তাহলে নিশ্চয়ই সিতাব তাকে এভাবে ত্যাগ করে থাকতে পারত না। শিশুর একটি ছোট্ট মুঠির ক্ষমতা মত্ত হাতির উন্মত্ততাকেও হার মানাতে পারে। সিতাবকেও ধরে রাখতে পারত সে।

সিতাব জানে না, সিতাবেরই রক্তমাংস তার দেহে তিলতিল করে পরিণত হচ্ছে। সিতাব জানে না, সমস্ত সারল্য ও ভালোবাসা নিয়ে সিতাবই ফিরে আসছে ছোট্ট শিশু হয়ে ফুল্লরার কোলে।

সেই দিনেরই প্রত্যাশায় ফুল্লরা বেঁচে থাকার তাগিদ পেয়েছে অন্তর থেকে। দুর্বল শরীর নিয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ি কাজ করেছে। প্রখর রোদ্রে ধান শুকিয়েছে, ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভেনেছে, আগুনের কাছে বসে বসে মুড়ি ভেজেছে। তারপর এক সময় দুর্বহ হয়ে উঠেছে তার শরীর। তখন তার এ-বাড়িতে সে বাড়িতে কাজ করাটা বন্ধ করে দিয়েছে ভৈরব। বলেছে, 'খুব হয়েছে বৌ-মা, এবার থামো দেখি। এ ক'টা দিন আর কাজকর্ম কোরো না। শেষে কি বিপদ ঘটিয়ে বসো, বলা যায় না। তোমার এ ক'দিনের ভাবনাটা আমাদের ভাবতে

দাও।' এর পর সাদিনপুরের নিষ্করুণ মানুষগুলোর অজস্র করুণা পেয়েছে সে। তারা যেন সমবেত কণ্ঠে বলতে চেয়েছে—আসতে দাও—এই পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় যে আসতে চাইছে, তাকে আসতে দাও। ওই শিশু শুধু তোমার নয়, আমাদের সকলের—সমগ্র পৃথিবীর।

আর ফুল্লরা প্রতিদিন প্রতীক্ষা করেছে, সিতাব আসবে—সিতাব আসবে—সিতাব না এসে পারবে না। কতদিন ঝড়ো হাওয়ায় দরজার কপাটের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে তার, ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখেছে—সিতাব নয়, নিঃসীম অন্ধকারে কেউ কোথাও নেই। কেউ আসেনি।

ধীরে ধীরে ফুল্লরার সমস্ত প্রত্যাশা শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন সিতাবের খোঁজ পাওয়া গেলো। সিতাব বেঁচে আছে, ফুল্লরাকেও মনে আছে তার। তিরিশ টাকার একটা মনি-অর্ডার এলো ভৈরবের নামে। কুপনে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কয়েক ছত্র লেখা :

ভৈরবদা,

সামান্য ক'টি টাকা পাঠালাম। আমার খোঁজ কোরো না, কারণ এখন আমার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। আমার চাকরি গেছে, সে-খবর নিশ্চয়ই পেয়েছ। বর্তমানে কাজ খুঁজছি। জীবনে ভুল করেছি প্রচুর, সেইসব ভুল কাটিয়ে উঠে লক্ষ্য স্থির রেখে এগোবার চেষ্টা করছি। জানি না কতটা সফল হবো। তোমার আশীর্বাদ কামনা করছি। ইতি—

সিতাব

মনি-অর্ডার এসেছে আসানসোল থেকে। খুঁজতে গিয়ে লাভ নেই। কারণ সে কথা স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছে সিতাব। তবু তো পরম সান্ত্বনা, সিতাব বেঁচে আছে, ফুল্লরাকে ভুলে যায়নি সে। একটুখানি আশার আলো ঝলমল করে উঠল ফুল্লরার চোখের সামনে। কুপনটুকু হাতে নিয়ে খুব কাঁদল ফুল্লরা।

তারপর সেদিন মহা দুর্যোগ। বিকেল থেকেই আকাশের কোণে একটু একটু করে মেঘ জমছিল। লাল মেঘ। সন্ধ্যে থেকে হাওয়া চলাচল একেবারে বন্ধ। চাপা গরম। মধ্যরাত্রে শুরু হলো ঝড়—প্রবল ঝড়। ঘরের চালটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভীষণ টানাটানি। যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেলো ফুল্লরার। তলপেট থেকে প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকায় ফুল্লরা। আলো জ্বালায় সে। কাউকে ডাকা দরকার। উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলতেই ঝড় তাকে এক ঝটকায় ঘরের মাঝখানে ঠেলে দিলো। লম্ফ নিভে গেলো মুহূর্তে। ঘর থেকে বেরোবার জন্যে চেষ্টা করল সে, কিন্তু পা বাড়াতে পারল না। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে একবার চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকার কারোর

কানে গিয়ে পৌঁছালো না, ঝড়ের ভয়ঙ্কর গর্জনে চাপা পড়ে গেলো তার কণ্ঠস্বর। পেটের ভেতর কে যেন তখন এক ধারালো ক্ষুর দিয়ে তার অন্ত্রগুলো কেটে ফেলছে। আর একবার চিৎকার করতে গিয়ে তার গলা থেকে শুধু গোঙানির শব্দ বেরোলো। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ফুল্লরা, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেলো সে।

গৌরসুন্দর সেই দুর্যোগে খোঁজ নিতে এসেছে লণ্ঠন হাতে। এসে দেখল, ঘরের দরজা হাট করে খোলা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, 'বৌ-মা! বৌ-মা!'

কোনো সাড়া পেলো না সে। সাড়া না পেয়ে ঘরের ভেতর পা দিতেই ফুল্লরার অজ্ঞান অচৈতন্য দেহটা তার চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠছে ফুল্লরার শরীর। মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারল গৌরসুন্দর। দ্রুতপায়ে সে বাড়ি ফিরে এসে ভৈরবকে আর বাসন্তীকে পাঠিয়ে দিলো। নিজে ছুটে গেলো মুচিপাড়া, দাই ডাকতে।

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে ঝড়ের দাপট কমল একটু। কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন ফুল্লরা ককিয়ে ককিয়ে উঠছে যন্ত্রণায়। সকাল হতে বেশি দেরি নেই, চারদিক ফরসা হয়ে এসেছে। বাসন্তীর কোলে ফুল্লরার মাথা। তার আলুলায়িত কেশরাজি ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেয়। কালু মুচির বউ নিপুণ হাতে শিশুটি ক নিয়ে আসছে অন্ধকার থেকে আলোয়।

ঘরের বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ভৈরব।

এক সময় ঝড় থেমে যায়। শান্ত হয়ে আসে চারদিক। অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে মোরগ ডাকে। আর ঠিক তখনই সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় এক নবজাত শিশুর কান্না —ওঁয়া —ওঁয়া —ওঁয়া—

আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে ফুল্লরা হাত বাড়ায় শিশুর দিকে।

গুরুগম্ভীর শঙ্খধ্বনিতে সাদিনপুরের মানুষেরা জেগে ওঠে। তখন নির্মল নীল আকাশ। পূব আকাশ রাঙা করে লাল সূর্য উঠছে দিগন্তে।

ভৈরব সূর্যের দিকে হাত বাড়ায়।